দয়াল বন্ধুর ই-বুক- ২০২৪

মূলত ২০২৪ সালে লেখা ৬৫ টি নিবন্ধ

দার্জিলিং, নৈনিতাল, কাশ্মির , আসাম- শিলং , রাঁচি ভ্রমন

ই বুক এর জন্য আমার কৈফিয়ৎ
আমার একটু বয়সে বড় গৌতমবাবু আমার এই সব ছোট ছোট নিবন্ধগুলির নিয়মিত পাঠক। শুধু পড়াই নয়, উনি মাঝে মাঝেই কিছু মন্তব্য করে আমাকে আরও লিখতে উৎসাহ দেন। উনি বেশ কিছুদিন ধরেই আমাকে বলছেন, এই ছোট ছোট লেখাগুলি একটি জায়গায় সংকলিত করে, একটি ই বুক তৈরী করতে। মূলত নিজের লেখাগুলি সম্বন্ধে একটু হেলাফেলার মনোভাবের জনই, ই বুক করার সামান্য পরিশ্রমেরও উৎসাহ পাইনি। এই গৌতমবাবুর উৎসাহেই, এর আগে একটি বই ছাপিয়ে , ভালোমত হতাশ হয়েছি। গৌতমবাবু ছাড়া আর কয়েকজনও আমাকে আবার বই ছাপানোর কথা বলেছেন। অন্য অনেক করণের মধ্যে, আমার নিজের পছন্দের কথাটাই সবথেকে বেশি জোরালো ভূমিকা নিয়েছে। আমি বছর দশেক হল , মোবাইলে PDF পড়া শুরু করেছি। অনেকের কাছে একটু বাড়াবাড়ি মনে হলেও, আমি প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার পৃষ্ঠা পড়েছি, এই পিডিএফ বা E-book। অনেক তাত্ত্বিক কারণ বলা যায়; আমি সেসব কারণে যাচ্ছি না। আমার বাড়ীতে বসে বই পড়ার সময় তেমন ছিল না। ট্রেনে, স্টেশনে, চেম্বারে বসে থাকতে থাকতে, মোবাইলেই কয়েক শ 'বই পড়ে নিয়েছি। পাঠ্য বইয়ের বিষয় ভালো লাগলো তো বনগাঁ লোকালে দমদম থেকে শিয়ালদা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়ও কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে নিয়েছি। ছাপানো বই আমার কম্পিউটার টেবিলে, বিছানার পাশে, আজও গোটা তিন চার আছে; সেগুলি এক একটি পড়তে তিন- চার, ছয় মাসও লেগে যায়। তাই, গৌতমবাবু বলবার পর থেকেই ভেবেছি, এই ছড়ানো ছিটানো লেখাগুলি একসাথে PDF করা যায়। যে ছয় সাতশ মানুষকে আমার লেখাগুলি এতদিন ধরে পাঠাচ্ছি, তাঁদেরই এই PDF ও পাঠাচ্ছি। তাঁদের কেউ কেউ আবার হয়তো কোন দুই একটা লেখা পড়বেন। বিশেষ করে ভ্রমণ কাহিনী পড়ে, আমার দেওয়া সুলুকসন্ধান কারো কারো কাজে লাগতে পারে। ভালো লাগলে কেউ কেউ হয়তো এই পিডিএফ সংকলন তাঁদের পরিচিতদের কাছে পাঠাতেও পারেন; এই আশা করে, গৌতম বাবুর পরামর্শ মেনে এই কাজটা করতে উৎসাহিত হলাম। মূলত ২০২৪ সালের ৩১শে মার্চ সরকারী চাকরীর থেকে অবসর নেওয়ার পর যে লেখাগুলি লিখেছি, সেগুলি এখানে সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি লেখার মধ্যে আমার দুটি ই মেল আই ডি দিয়েছি। পড়ার পর কেউ যদি মন্তব্য পাঠান, বুঝব ভালো লাগুক বা খারাপ লাগুক, কেউ কেউ আমার এই লেখার কয়েকটি অন্তত পড়েছেন।
ধন্যবাদান্তে, বিনীত ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার।
দমদম। ৬.১২.২০২৪.

আজন্ম শুনে এসেছি কুন্ডু স্পেশাল এর নাম। এই প্রায় বৃদ্ধ বয়সে এসে ওদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার যোগাযোগ হল। আসাম আর মেঘালয় ঘুরে এলাম। এপ্রিল মাসের ছয় তারিখ সকালে কোলকাতা বিমান বন্দর থেকে প্লেনে চড়লাম। এক ঘন্টার কম সময়ে গুয়াহাটি পৌছে গেলাম। গুয়াহাটি বিমান বন্দর এর বাইরে কুণ্ডু স্পেশাল এর লোকজন অপেক্ষা কগুয়াহাটি পল্টন বাজারের এই হোটেলটি ছোট হলেও বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। হোটেলের রিসেপশন এইরছিলেন। আমরা প্রায় তিরিশ জন এসে পৌঁছতে তিরিশ পয়টিরিশ মিনিট লাগল। ওদের লোকই আমাদের বড় ব্যাগ গুলি ওদের ভাড়া করা মিনি বাসে তুলল। তিনটি ট্রাভেলার মিনি বাস আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিল, ঘন্টা খানেক সময় লাগল। কুণ্ডুর লোক অমাদের সকলকে চা দিল। পরে জানলাম , ওদের চারজন রান্নার লোক আর একজন ম্যানেজার আগের দিন ট্রেনে পৌঁছে গেছেন। পৌঁছনোর এক ঘন্টা পর হোটেলের খাওয়ার জায়গায় আমরা সবাই খেতে নামলাম। কুণ্ডুর লোকই রান্না করেছিল। পরের সাতদিন চার বেলার খাওয়া ইত্যাদি সবই এরাই ব্যবস্থা করে।

দুপুরে খাওয়ার পর এক দেড় ঘন্টা বিশ্রাম এর পর আবার সবাই দল বেধে নিচে নামলাম। সেই তিনটি মিনি বসেই চললাম বশিষ্ঠ আশ্রম দেখতে।

গুয়াহাটি শহরের এক প্রান্তে বশিষ্ট আশ্রম। আমরা পৌঁছলাম সূর্য ডোবার পর, সন্ধ্যা হয়ে আসছে তখন। পাহাড়ের কুড়িটা মত সিড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠলাম। ছোট পুরাতন মন্দির, ভেতরে কোন বিগ্রহ নেই। একটা তেল সিঁদুর মাখিয়ে রাখা বড় পাথরের কাছে একজন পুরোহিত বসেছিলেন। মন্দিরের পিছন দিকে পাহাড় থেকে একটা ঝর্ণা ধারা পাথরের খাঁজে খাঁজে নেমে আসছে। পর্যটকেরা অনেকে সেখানে ছবি তুলছে দেখলাম। ঐ ঝর্ণার পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে এলাম। গাড়ী যেদিকে রাখা হয়েছিল সেদিকে কয়েকটা চায়ের দোকান দেখে এগিয়ে গেলাম। মাটির গ্লাসে চা খেলাম, কুড়ি টাকা দাম। পরে অবশ্য ওদিকে যেখানেই চা খেয়েছি, কাগজের কাপেও কুড়ি টাকা। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরেই কুণ্ডুর লোক তেলে ভাজা আর চা দিয়েছিল।

বিশিষ্ট আশ্রম থেকে গেলাম শহরের ভেতরে বালাজী মন্দিরে। অনেকখানি ছড়ানো ছিটানো জায়গা নিয়ে তিনটি দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির।

রাতের খাওয়া হল হোটেলের খাওয়ার ঘরে, রান্না আর পরিবেশন কুণ্ডুর লোকের। রাতের খাওয়া র সময়ই পরের দিনের ভ্রমণ সূচী জনিয়ে দেওয়া হল। ভোরে উঠে গরম জলে স্নান করে কামাখ্যা মন্দির দর্শনের জন্য রওয়ানা হলাম। ভোরে ফাঁকা রাস্তায় মন্দিরে পৌঁছতে আধ ঘন্টা মত লাগল। বাস থেকে নামার সাথে সাথেই কুণ্ডুর লোক সকলের হাতে হাতে একটা করে মজবুত ব্যাগে , সকালের প্রাতরাশের প্যাকেট দিয়ে দিল। ৭ই এপ্রিল সকালে গুয়াহাটি তে জল গরম করে স্নান করতে হয়েছে, ভাবা যায়।

সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কামাখ্যা মন্দির চত্তরে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখি একটা লম্বা লাইন। জানলাম , ওটাই ভি আই পি টিকিট কাটার লাইন। আন্দাজে মনে হল পাঁচ সাতশ লোকের পিছনে আমরা দাঁড়িয়েছি। সকালে টিকিট দেবে দুশো জনকে। কুণ্ডুর ট্যুর ম্যানেজার দুজন এদিক ওদিক ঘুরে, পান্ডা ধরে কিছু করা যায় কি না চেষ্টা করে গেল। ঘন্টা দেড়েক লাইনে দাঁড়ানোর পর জানা গেল, দুশো টিকিট শেষ। বহু লোক লাইন ছেড়ে চলে গেল। আমাদের ম্যানেজার বলল, লাইন ছাড়বেন না, বারোটার পর আবার টিকিট দেবে। আমি মিনিট পনের পরে ম্যানেজার কে জানিয়ে দিলাম, আমার ও ভাবে মন্দিরে ঢোকার দরকার নেই। আমার স্ত্রী আরও অনেকের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে রইল। এবার একে একে প্রায় সবাই পাশের পাথরের বসার জায়গায় বসে প্রাতরাশের প্যাকেট খুলে খেয়ে নিলাম। আমি এবার একা একাই মন্দির চত্বর ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম।এক সময় দেখলাম , পাশের একটা দরজা দিয়ে অনেকেই মন্দিরের ভেতরে যাচ্ছে, আমিও অনেক ভেতরে গিয়ে দেখে এলাম।পরে জানলাম , মন্দিরের গর্ভ গৃহ ছাড়া সবই দেখেছি। ক্রমে ক্রমে মন্দির চত্বর মেলার মত ভিড় হয়ে গেল। গেটের বাইরে বেরিয়ে একটা গলির ভেতর দোকানে চা খেলাম। ঐ গলি দিয়ে কিছুটা উপরে গিয়ে মন্দিরে ঢোকার সাধারণ লাইনটা ও দেখে এলাম। বেলা এগারোটা নাগাদ মনে পড়ল , একটা বইতে পড়েছিলাম, ভুবনেশ্বরী মন্দিরের কথা। দু চার জনকে জিজ্ঞেস করে রাস্তাটা জেনে নিলাম। দু একটা সাইন বোর্ড ও চোখে পড়ল। খাড়া পাহাড়ী গলি ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।প্রায় পাঁচশ সিঁড়ি ভেঙ্গে একটা পিচ ঢালা পাহাড়ী রাস্তা পেলাম। ডান দিকে একটা ভিউ পয়েন্ট তৈরী করা আছে। গোটা দশ বারো সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। নিচে অনেক দূরে গুয়াহাটি শহরের বাড়ী ঘর দেখতে পেলাম। ঐ পিচ ঢালা রাস্তার একটু উপরে ভিআইপি পার্কিং। কিন্তু কোন মন্দির দেখা যায় না। একজন লোক উপর থেকে নেমে আসছিল, তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, মন্দির আরও উপরে। চড়াই রাস্তায় আরও প্রায় একশ ফুট ওপরে উঠতে হল। এবার দেখলাম একটা সিমেন্টের নতুন তোরণ দ্বার। তার ভেতর দিয়ে আরও তিরিশটি মত সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দির চত্তরে পৌঁছলাম। ছোট্ট সুন্দর মন্দির। আমি ছাড়া আর দুজন মাত্র যাত্রী। খুবই নির্জন পরিবেশে একটু এদিক ওদিক ঘুরে এলাম। মন্দিরের পিছন দিকে গিয়ে দেখলাম, অনেক নিচে ব্রহ্মপুত্র নদী। মাঝে মাঝেই চড়া দেখা যাচ্ছে। দূরে গুয়াহাটি শহর ও দেখা যায়।

কয়েকটা ছবি তুলে নেমে এলাম কামাখ্যা মন্দির চত্তরে। ওখানে আমাদের দলের সবাই ভিআইপি টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রায় পৌনে একটার পর ওরা সকলে পূজার লাইনে ঢুকে গেলে আমি আবার নিজের মত ঘুরতে শুরু করলাম। ওদের পূজা দিয়ে বেরোতে চারটা পেরিয়ে যাবে শুনলাম। আমার স্ত্রী কে বললাম, আমি উমানন্দ দেখে হোটেলে চলে যাচ্ছি। মন্দির এলাকা থেকে বেরিয়ে একটু নিচে নেমে দেখি অনেক লোক লাইন দিয়ে ভান্ডারায় প্রসাদ খেতে ঢুকছে; আমিও ঢুকে পড়লাম। কয়েকশ লোক একসাথে স্টিলের থালায় খিঁচুড়ি নিয়ে খেলাম। ওখান থেকে বেরিয়ে বাস অটো যেখানে দাঁড়ায় সেদিকে চললাম। এমন সময় আমাদের এক ম্যানেজার মোবাইলে ফোন করে বলল, সকলে খেতে বেরোচ্ছে আমি ভান্ডারায় খেয়ে নিয়েছি জানলাম। আরও জানলাম আমি উমানন্দ দেখতে যাচ্ছি। পাশ থেকে এক অটো রিক্সা চালক শুনতে পেয়ে বলল, আমি অটো রিক্সা নিয়ে যাচ্ছি, চলুন। ওর আরও দুজন যাত্রী ছিল, তাদের সাথে আমাকেও উমানন্দের ঘাটে পৌঁছে দিল। সাথে সাথেই টিকিট কেটে লঞ্চে উঠলাম। মাত্র মিনিট দশেকেই উমানন্দ ঘাটে পৌঁছে দিল লঞ্চ। ঘাট থেকেই খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে মন্দির চত্তরে। অন্তত দুশো সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। পাহাড়ের মাথায় একটা ভলি বল খেলার মাঠের মত জায়গা। তাতেই তিনটি ছোট ছোট মন্দির। পূজা দেওয়ার জন্য জনা পঞ্চাশেক লোকের লাইন পড়েছে। আমি আর পূজার লাইনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম না। নিচে লঞ্চ ঘাটে নেমে এলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লঞ্চ ছেড়ে দিল। এপারে ফিরে এসে আবার সেই আগের অটো রিক্সা ই পেলাম। বিকেল পৌনে চারটার দিকে হোটেলে ফিরে এলাম। আমাদের দলের সবাই ফিরল প্রায় ছয় টা নাগাদ। স্ত্রীর কাছে জানলাম, ওদের আর উমানন্দে যাওয়া হয় নি। সারাদিনের ধকলের পর আমার স্ত্রী আর বেরোতে চাইল না। আমি একাই বেরিয়ে পল্টন বাজারে আধ ঘণ্টা মত ঘুরে এলাম।

নিয়ম মত রাত্রে খাওয়ার সময় ম্যানেজার জানিয়ে দিল পরের দিন কখন রওনা দিয়ে কোথায় যাওয়া হবে। সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা দিয়ে যাওয়া হবে কাজিরা ঙ্গা। আড়াইশো কিলোমিটার মত রাস্তা। আমরা যাবো সেই তিনটি ট্রাভেলার মিনি বাসে। পুরো লটবহর যাবে। তাই আমাদের বড় স্যুটকেসগুলি কুণ্ডুর লোক আর হোটেলের ছেলেরা মিলে এক ঘন্টা আগেই বাসে তুলল। আমরা প্রাতরাশ করে বাসে উঠলাম। বাস ছাড়ার সাথে সাথেই কুণ্ডুর একজন লোক আমাদের একটা করে লজেন্স চকলেট এর প্যাকেট দিল। মিনিট কুড়ি শহরের রাস্তায় চলার পর আমরা শহর ছাড়িয়ে হাই ওয়ে তে চলতে শুরু করলাম। রাস্তার পাশের বাড়ী ঘর, চাষের জমি আমাদের বাংলার মতোই।

একটানা ঘন্টা তিনেক চলার পর আমাদের গাড়িগুলি হাই ওয়ে ছেড়ে একটা সরু রাস্তায় ঢুকল। তিন কিলোমিটার মত চলে একটা মন্দিরের কাছে মাঠে গিয়ে দাঁড়ানো হল। মন্দিরটি ঠিক একটি শিব লিঙ্গের আকার। দোতলা মন্দিরটি চল্লিশ ফুট মত উচু হবে। বেশ রোদ ছিল, আমাদের ছাতা স্যুটকেসে, তাই রোদের মধ্যেই ধুধু প্রান্তরের মাঝে মন্দির দেখতে গেল সকলে। আমার আর মন্দিরে ঢোকার আগ্রহ ছিল না। দূর থেকেই দু একটা ছবি তুলে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। ভালো কথা, মন্দিরটির নাম শুনলাম মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দির। আবার সেই তিন কিলোমিটার ফিরে হাই ওয়ে ধরলাম।

ঘন্টা দেড়েক চলবার পর একটা জায়গায় থামা হল। এক ম্যানেজার আর একজনকে নিয়ে রাস্তার পাশের বড় ধাবায় ঢুকল। দু চার মিনিট পরই সকলকে নামতে বলল। হাই ওয়ে র পাশের ধাবা বললে আমরা যা বুঝি এটা সেরকম নয়। সামনে বিরাট রেস্টুরেন্ট। পিছনে বাগানের মধ্যে আবার খড়ে ছাওয়া বসার জায়গা। আমরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলাম। কুণ্ডুর লোক বাগানের পাশে একটা শেডের তলায় খাওয়ার গরম করে নিল। আধ ঘন্টার মধ্যেই আমাদের মাছের ঝোল ভাত দিয়ে দিল। সবার খাওয়া হলে ওরা নিজেরা খেয়ে, বাসন পত্র ধুয়ে বেঁধে বাসে তুলল। সব মিলে ঘন্টা দেড়েক। আবার বাস ছাড়লে সকলকে একটা করে ট্রপিকানা র প্যাকেট দিল। ঘন্টা দেড়েক চলার পর কাজীরাঙ্গা জঙ্গলের এলাকার মধ্যে দিয়ে বাস রাস্তা চলল। সে এক সুন্দর অভিজ্ঞতা; পরে লিখব।

হাইওয়ে ধরে চলতে চলতে মাঝে মাঝে বড় সাইন বোর্ড দেখতে পেলাম, লেখা, জঙ্গলের প্রাণীদের পারাপারের জায়গা, গাড়ী আস্তে চালান। ওসব জায়গায় রাস্তার পাশের জঙ্গল বেশ ঘন। এক জায়গায় আমাদের গাড়ী থেমে গেল, ড্রাইভার বাম দিকে মাঠের মধ্যে একটি গণ্ডার দেখাল। সবাই বেশ উত্তেজিত; সকলেই মোবাইলে ছবি তুলেছিলাম। আমাদের সামনের গাড়ীর কয়েকজন নেমে রাস্তার পাশে গিয়ে ছবি তুলল। ওখান থেকে কাজীরাঙ্গা জঙ্গলে ঢোকার মূল রাস্তাটি প্রায় দশ কিলোমিটার। আবার একটু এগোনোর পর বা দিকে মাঠের মধ্যে দুটি হাতি দেখতে পেলাম। তারপর আবার এক জায়গায় একটি বাচ্চা সহ মা গণ্ডার। এসবই বাস রাস্তা থেকে একশ মিটার মত দূরে। পরে পাঁচ শ মিটার মত দূরে আরও দু একটা গণ্ডার দেখলাম। এই ভাবে কখনও জোরে কখনও আস্তে চলে আমাদের গাড়ী রিসোর্ট এ পৌঁছাল প্রায় বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ। খুব ছড়ানো ছিটানো জায়গা নিয়ে রিসোর্ট এর কটেজ গুলি। আমাদের কটেজ এর চাবি দিয়ে দিল, নিজেরাই এক একটি কটেজ খুলে ঢুকলাম। মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের স্যুটকেস কটেজে পৌঁছে গেল। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই তেলেভাজা আর চা এসেগেল। সন্ধ্যার মুখে আমরা এক এক করে বেরিয়ে রিসর্টের বিরাট এলাকার মধ্যে ঘুরে দেখতে লাগলাম। একটা ফুটবল মাঠের মত জায়গার এক পাশে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে বিহু নাচ এর মহড়া দিচ্ছিল, আমরা দেখলাম। রাত নটার পরই কুণ্ডুর লোক খাওয়ার জায়গায় সকলকে ডেকে নিয়ে গেল। রাতের খাওয়ার সময় ই ম্যানেজার জানিয়ে দিল, পরদিন সকাল আটটায় জঙ্গল সাফারী করার জন্য রিসর্টের সামনে জীপ এ উঠতে হবে।
কাজিরঙ্গা তেও সকালে জল গরম করে স্নান করতে হল। সকালেই টি ভি র খবরে দেখলাম, কলকাতায় তাপপ্রবাহ চলছে। খোলা জিপে জঙ্গলে ঘুরতে হবে বলে কেউ কেউ ছাতা নিয়ে উঠলো, কোথাও ছাতা মাথায় দিতে হয়নি।

জীপে ওঠার আগে মাথাপিছু ছয়শ টাকা করে ম্যানেজারকে দিলাম। প্রতিটা জীপে ছয় জন করে বসার ব্যবস্থা। অন্যান্য জাতীয় অভয়ারণ্যে জীপে একজন করে গাইড থাকে, এখানে ড্রাইভারই গাইড। পরিচয় পত্র ও কেউ দেখতে চাইল না। রিসোর্ট থেকে মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের জীপগুলি চেক পোষ্ট এ পৌঁছে গেল। অন্তত পঁচিশ তিরিশটি জীপের লাইন পড়ল। রাস্তার ডানদিকে নিচে একটা মাঠের মধ্যে গোটা পনের গাড়ী পার্কিং করা আছে দেখলাম। পরে জানলাম যারা হাতীর পিঠে সাফারী করতে গিয়েছে, তাদের গাড়ী ওগুলি। মিনিট দশ পনের লাগল আমাদের দলের কাগপত্রগুলো ঠিক করতে। তার পর জীপ চলল। চেক পোষ্ট এ ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছিল, কারও কাছে কোন খাওয়ার আছে কি না। একশ গজ মত ঢুকেই দেখি বাম দিকের মাঠের থেকে দুটি হাতী আসছে, তাদের পিঠে দুজন যাত্রী আর মাহুত। ওদিকের মাঠেই, রাস্তা থেকে তিন চারশ মিটার দুরে দুটি গণ্ডার চরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ডান দিকে একটা বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম, ওখানে আরও চার পাঁচটি হাতী। লোকজন ঐ প্ল্যাটফর্ম এ সিঁড়ি বেয়ে উঠে, হাতীর পিঠে চাপছে।

আমাদের জিপগুলি মাঠের ভেতরের আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলল। রাস্তার পাশে দু দিকেই মাঠ, জলা জমি। বেশীর ভাগই আট দশ ফুট উঁচু ঘাসের জঙ্গল। বড় গাছের গভীর জঙ্গল খুবই কম। মাঝে মাঝেই জলার ধারে একটি দুটি করে গণ্ডার, হাতী, হরিণ দেখতে থাকলাম। সবাই মোবাইলে ছবি তুলতে থাকলাম। কোথাও কোথাও চার পাঁচটা হাতীর দল, বুনো মহিষের দলও দেখলাম। একটা কাঠের সাঁকো র নিচে একটা বড় শোল মাছ অনেকক্ষণ এক জায়গায় থেকে আমাদের দর্শন দিল। কয়েকটা বুনো শুয়োর, একটা কচ্ছপ আর একটা মাছরাঙা পাখি দেখলাম। এই জঙ্গলে পাখী বিশেষ দেখলাম না। একটা লম্বা জলার এক পাশে, ফাঁকা মাঠে চারটি বাচ্চা নিয়ে চারটি মা হাতী, তাদের কাছেই দুটি গণ্ডার চরতে দেখে প্রায় সবকটি জীপ দাড়িয়ে গেল। আমরা প্রচুর ছবি তুললাম। ঐ জলার উল্টো দিকে একটা ফাঁকা মাঠে একটি ওয়াচ টাওয়ার। অনেকে উঠে দেখছে। আমাদের গাড়ীর একজনও টাওয়ার ঘুরে এলেন। আমার আর নামার ইচ্ছা হল না। আসলে এর মধ্যেই এত বেশী বন্য প্রাণী দেখে নিয়েছি যে নতুন আর কিছু দেখার আগ্রহ ছিল না। জীপ গাড়ী ঘন্টা দুই সময় আমাদের প্রায় আট দশ কিলোমিটার ঘুরিয়ে এনেছে। সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ রিসোর্টে ফিরে এলাম। আমাদের দলের সবাই প্রচুর বন্য প্রাণী দেখে খুব খুশী।

বিকেলে তিনটে নাগাদ আবার মিনি বাসে করে সকলে চললাম, মাইল খানেক দূরের অর্কিড হাউস দেখতে। ওখানে গিয়েও দেখলাম গোটা তিরিশ গাড়ী করে অনেক পর্যটক পৌঁছে গেছেন। দেড়শ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। একটি সবুজ জালে ঘেরা অর্কিড হাউস অসংখ্য অর্কিড এ সাজানো। ওর উল্টো দিকে একটি ছোট মিউজিয়াম। আসামের , বিশেষ করে উপ জাতীয় লোকেদের তৈরী নানান রকমের জিনিষ দিয়ে সাজানো। পাশেই একটি বাড়িতে নানান রকমের বাদ্য যন্ত্র দিয়ে মিউজিয়াম করা হয়েছে। একজন শিল্পী প্রতিটা বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে, গান গেয়ে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একটা মুক্ত মঞ্চ মত চালায় বেশ কিছু শিল্পী বিহু নাচ গান করে দেখলেন। ঐ মঞ্চে সন্ধ্যে সাড়ে ছয় টা থেকে সাড়ে আটটা অনেক অনুষ্ঠান হয়। তার জন্য পরে আবার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়; আমাদের দেখা হয়নি। গেটের বাইরে বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানে নানান রকম স্থানীয় জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমরা কলকাতায় দুষ্প্রাপ্য কালো চাল কিনলাম এক কেজি। মাত্র একশ টাকা দিয়ে।

পরদিন সকালে আবার সবার স্যুটকেশ আগেই বাসে তুলল কুণ্ডুর লোক আর হোটেলের ছেলেরা। আটটা নাগাদ বাস তিনটি ছাড়ল। এবারে আমাদের গন্তব্য সোজা শিলং শহর। ফেরার পথেও রাস্তার পাশের মাঠে সাত আটটা গণ্ডার দেখলাম। আমরা গোটা ছয়েক জাতীয় অভয়ারণ্যে সাফারী করেছি, এত সংখ্যায় বন্য প্রাণী কোথাও দেখিনি। কোলকাতা থেকে প্লেনে বা ট্রেনে গুয়াহাটি পৌঁছে ঐ দিনই আড়াইশ কিমি দূরে কাজিরাংগা চলে যাওয়া যায়। ওখানে অনেক হোটেল। পরদিন সকালে সাফারী করে ঐ দিন ই গুয়াহাটি ফেরা যায়। গুয়াহাটি থেকে জোরহাট অনেক বাস চলে, তাতে করে ও কাজীরাঙ্গা যাওয়া যায়।

কাজীরাঙ্গা থেকে আমাদের তিনটি মিনি বাস সকাল আটটায় রওনা দিল শিলং শহর এর উদ্দেশ্যে। গুয়াহাটি থেকে যে রাস্তা দিয়ে গেছলাম, সেই রাস্তা ধরেই ফেরা। শুধু গুয়াহাটি শহরে না ঢুকে এক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া। ফেরার পথে বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটেনি। ঘন্টা দুই চলার পর বড় রাস্তার পাশে অনেক ডাব বিক্রী হচ্ছে দেখে নামা হল। এক বুড়িমা ডাব বিক্রী করছিলেন। আমার আগে মুখার্জীবাবু দাম জেনে ডাব কেটে দিতে বলেছেন; দাম জানলাম তিরিশ টাকা। আমিও একটা কেটে দিতে বললাম। মুখার্জী বাবু একটা একশ টাকার নোট দিলে বুড়িমা চল্লিশ টাকা ফেরৎ দিলেন। তাই নিয়ে অশান্তি। বুড়িমা বারবারই বলছেন দাম শাটি টাকা। আর মুখার্জী বাবু বুঝছেন থার্টি টাকা। আমি বুঝে গেলাম শাটি মানে উনি ষাট বলছেন। আবার একটা বড় ধাবায় দুপুরের খাওয়া হল। তারপর একটানা ঘন্টা চারেক চলে শিলং শহর। গুয়াহাটি থেকে এক ঘন্টা মত চলার পর পাহাড়ী রাস্তা শুরু হল। আকাবাঁকা রাস্তা ক্রমশ উপরে উঠতে থাকল। এক জায়গায় না থেমেই ডান দিকে দেখতে বলল ড্রাইভার। দেখলাম একটা নদীর মত; ড্রাইভার বলল, বড়া পানী লেক। পরে জেনেছি ওর নাম উমিয়াং লেক। অনেকে ওখানে বোটিং ও করে। শিলং শহর এর রাস্তা বেশ সরু, গাড়িও প্রচুর। শহরে ঢুকে আমাদের হোটেলে পৌঁছতে ঘন্টা খানেক লাগল। সন্ধ্যায় আর কোথাও বেরলাম না। পাহাড়ী শহর হিসেবে যেমন ঠান্ডা লাগবে ভেবেছিলাম তেমন ঠান্ডা ছিল না। রাত্রে ডিনার হলেও সোয়েটার লাগলো না। ভোরে উঠে রাস্তায় হাটতে বেরোনোর সময় সোয়েটার গায়ে বেরোলাম, কিন্তু আট টায় আর সোয়েটার গায়ে রাখা গেল না।

শিলং এর দ্বিতীয় দিনে আমরা চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত দেখে এলাম। সকাল আটটায় বাস ছাড়ল। শহরের রাস্তায় এই সকালেই গাড়ীর জ্যাম। আমরা সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শিলং এর ঠাকুর বাড়ী পৌঁছে গেলাম। একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়ীতে ছিলেন। এখন সেই বাড়ীতে একটি ছোট মিউজিয়াম হয়েছে। অত সকালে মিউজিয়াম খোলা ছিল না। বাড়ীর সামনে কবির পূর্নাবয়ব মূর্তি; সবাই সেখানে ছবি তুলেছিলাম। তারপর গাড়ী চলল চেরাপুঞ্জির পথে। গোটাটাই আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা। আমরা ঘন্টা তিনেক চলে পৌঁছলাম, নৌয়াকালিকাই জলপ্রপাতের কাছে। ধু ধূ প্রান্তরের মধ্যে দেড়শ মিটার মত হেঁটে ভিউ পয়েন্ট। অনেক ওপর থেকে জলপ্রপাত দেখলাম। সকল ভ্রমণ স্থানের মত এখানেও বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানে স্থানীয় জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমরা দারচিনি কিনলাম। ফেরার পথে পাশেই সোহরা রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট এলাকা। আমরা সবাই নেমে স্কুল আর মন্দির দেখে এলাম। এই মিশন ১৯৩১ সালে তৈরী। অতদিন আগে ঐ দূর্গম জায়গায় এই মিশন স্থাপন করা হয়েছে ভাবলে রোমাঞ্চ বোধ হয়। এক মহারাজের ভাষণে শুনেছি, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে, সপ্তাহে একবার জীপ গাড়ী নিয়ে গৌহাটি শহরে বাজার করতে আসা হত।

এরপর আমরা পৌঁছলাম একটা গুহার কাছে। টিকিট কেটে গুহার একদিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক দিয়ে বেরোলাম। একশ পঁয়ত্রিশ মিটার রাস্তা , বেশ রোমাঞ্চকর। ভেতরটা বেশ আঁকাবাঁকা। এক এক জায়গায় একটু অসাবধান হলেই মাথায় ঠোক্কর লাগার সম্ভাবনা। আমাদের দলের চার পাঁচ জনই গুহায় ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেড়িয়েছি। সামনে বিরাট চত্বরে গাড়ী রাখার জায়গা। বেশ কিছু গাছের তলা সিমেন্ট বাঁধানো। কুণ্ডুর লোক আমাদের হাতে হাতে দুপুরের খাওয়ার প্যাকেট দিল। ঐ সব বাঁধানো গাছের তলায় বসে সকলে খেয়ে নিলাম। মিনিট পনের চলার পর বড় রাস্তার পাশে এক জায়গায় বাস থামল। সবাই নেমে উল্টো দিকে সেভেন সিস্টার ফলস দেখতে গেলাম। জলপ্রপাত একেবারেই জল শুন্য। একটু বৃষ্টি হলে সাতটা ধারায় জল নামে জানলাম। আমাদের অনেকের ধারণা ছিল, চেরাপুঞ্জি তে বৃষ্টি দেখা যাবে। এপ্রিল এর এগারো তারিখ এক টুকরো মেঘ ও আকাশে ছিল না। শিলং এর অনেক কাছে এসে, বড় রাস্তা থেকে বাম দিকের ছোট রাস্তা ধরে একটি ভেতরে ঢুকলাম। এখানে এলিফ্যান্ট ফলস জলপ্রপাত। তিনটি ধাপে জলপ্রপাত। এখানে বেশ জল ছিল। এক এক করে আমরা একেবারে নিচে পর্যন্ত নেমে দেখে এলাম। ওঠার সময় গুণে দেখলাম , একশ ছিয়াশি সিঁড়ি। ওখান থেকে সোজা শিলং এর হোটেলে ফিরে এলাম। শহরে সকালের থেকে বেশী জ্যাম, হোটেলে পৌঁছতে বিকাল পাঁচ টা বেজে গেল। আমাদের দলের কয়েকজন ট্যাক্সি নিয়ে পুলিশ বাজার ঘুরতে গেলেন, আমার উৎসাহ ছিল না।

পরদিন সকালে উঠে আমরা হোটেল থেকে নিচের দিকে হাঁটতে গেলাম। কিছুটা উৎরাই নেমে আবার চড়াই রাস্তায় উঠলাম। বেশ কিছুটা হেঁটে একেবারে একটা পাহাড়ের মাথায় পৌছে প্রায় সমতল রাস্তা পেলাম। হাটতে হাটতে একটা বড় ফুটবল মাঠে পৌঁছে গেলাম। কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে, অনেকে মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওখান থেকে দু দিকেই পাহাড় দেখা যায়, বেশ সুন্দর দৃশ্য। দ্বিতীয় দিনে আমরা চললাম মাউলিংনন গ্রামের দিকে। এটা অনেক টা চেরাপুঞ্জি র রাস্তায় এগিয়ে চল্লিশ কিমি মত গিয়ে বাম দিকের রাস্তা ধরতে হয়। মাঝে পাঁচ কিমি মত রাস্তা খুব খারাপ। ধূ ধু প্রান্তরের মাঝে রাস্তার পাশে একটা খুব ঝক ঝকে হোটেলের সামনে গাড়ী দাঁড়াল। সকলে হোটেলের টয়লেটে গিয়ে প্রস্রাব পায়খানা করে নিলাম। এমন বিচ্ছিন্ন জায়গায় এত সুন্দর ব্যবস্থা দেখে সকলেই প্রশংসা করলাম। এখন থেকে আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে, বড় রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে বেশ সরু রাস্তায় গাড়ী ঢুকল। এই রাস্তা শুধু সরুই নয়, একেবারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলল। দশ কিলোমিটার মত চলার পর আমরা মাওলিংনন গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামে ঢুকতে একটা চেক পোষ্ট, এখানে মাথা

পিছু তিরিশ টাকার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। একটু পাহাড়ী রাস্তা একশ গজ মত নেমে একটা বেশ ছড়ানো, পিচ ঢালা মাঠে পৌঁছল। ওখানে সবাই গাড়ী থেকে নামলাম। ঠিক দুপুর বেলা। ঝক ঝকে রোদ, কিন্তু কলকাতার মত আগুন গরম নয়। একজন ম্যানেজার জানিয়ে দিল, এক ঘন্টা গ্রাম ঘুরে আবার সেই জায়গায় ফিরে আসতে হবে। ওখানেই একটা হোটেলে দুপুরের খাবারের আয়োজন। আমরা সোজা গ্রামে ঢুকব না পিছন ফিরে ঘুরে ঢুকব তাই নিয়ে একটু টানা টানি হল। শেষে দলবেঁধে সোজাই ঢুকলাম। একটু এগিয়ে বাঁশের তৈরী ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পেলাম। এটা আমি আগে ইউটিউবে দেখেছিলাম। ওঠার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন কারণে বন্ধ ছিল। আমরা আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটেই গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের ঢালে ঢালে বাড়ী। প্রতিটি বাড়ীতেই ফুল আর পাতা বাহার এর গাছ। গ্রামটা পরিচ্ছন্ন গ্রাম বলে প্রচার পেয়েছে। আমার কিন্তু গ্রামটাকে পরিষ্কারের থেকেও সুন্দর বেশী মনে হয়েছে। গ্রামের চার্চের এলাকায় ঢুকে ঘুরে দেখলাম। ফুটবল মাঠে ঐ দুপুরের রোদেও ছেলেরা ফুটবল অনুশীলন করছিল, আমরা মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে অন্য দিকে গেলাম। গ্রামটাতে ঘুরে বেড়ালে ও লোকজন প্রায় দেখাই গেল না। প্রায় প্রতিটা বাড়ীতেই হোমস্টের ব্যবস্থা করেছে। একটা দোতলা বড় হোটেলও দেখলাম। গ্রাম ঘুরে এসে একটা বড় হোটেলের চালার নিচে আমরা সবাই খেয়ে নিলাম ঘন্টা খানেক পর গাড়ী ছাড়ল। মিনিট পাঁচ সাত চলেই পৌঁছে গেলাম লিভিং রুট ব্রীজের কাছে। এই গাছের শেকড় দিয়ে তৈরী সেতু একটি দর্শনীয় জিনিস বটে।একটি তিরিশ ফুট মত চওড়া ঝোরার উপর এই সেতু। মনে হল এক পাশের দুটি গাছের শিকড় দিয়েই সেতুটি তৈরী। সেতু পেরিয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে, নিচে নেমে , নানান ভাবে অনেক ছবি তোলা হল।সেতু তৈরীর গাছ দুটিকে বট গাছের মত লাগল। হাতের কাছে একটা নতুন ডালে কিছু পাতা দেখা গেল। অনেক টা আমরা যাকে রবার গাছ বলি, সে রকম পাতা। তবে আকারে অনেক ছোট। এই সেতু দেখার জন্য আমাদের চল্লিশ টাকা করে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়েছে। আমাদের গাড়ী অনেক টা নীচে একটা ছোট্ট মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমাদের বেশি হাঁটতে হয়নি। হয়তো একশ ধাপ ও নামতে হয়নি। কিন্তু আমাদের সাথে থাকা বয়স্ক লোকজন অনেকে ওখানে নামার সাহস পাননি।

ঐ দিন আর নতুন কিছু দেখা হয়নি, ঐ রুট ব্রীজ থেকেই সোজা শিলং এর হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন তো সকালে রওনা দিয়ে গুয়াহাটি ফিরে এসে দুপুরের প্লেন ধরে বিকেলে কলকাতা চলে এলাম। ঐ Mawlainong গ্রামের থেকে আবার চল্লিশ কিমি মত গেলে ডাউকি নামে একটি ভালো বেড়ানোর জায়গা আছে; আমাদের যাওয়া হয় নি। শিলং থেকে প্রথমদিনই চেরাপুঞ্জি গিয়ে আবার শিলং ফিরে না এসে, ঐ দিন ওদিকেই মাওলাইনোং গ্রামে গিয়ে থাকতে হত। তা হলে দ্বিতীয় দিনে ওখান থেকেই সকালে ডাউকি গিয়ে বিকেলে শিলং ফেরাটা কম পরিশ্রমের হত। সম্ভবত Mawlainong এ এত লোকের এক সাথে থাকার মত হোটেল না থাকায় কুণ্ডু স্পেশাল ওখানে রাত্রে থাকার কথা ভাবেনি। সব মিলে কুণ্ডুর ব্যবস্থাপনা ভালো। বিশেষ করে একটু বয়স্ক লোকজন এর জন্য তো আদর্শ। আর ওদের সাথে যেহেতু বাঙালি রান্নার লোক আর সরঞ্জাম যায়, খাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু পাঁচ ছয় মাস আগে থেকেই ট্যুর বুক করাটা সবার কাছে বাস্তব সম্মত না ও হতে পারে।

কাশ্মীর ভ্রমণ

বাঙালি মাত্রেই একবার কাশ্মীর ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে। আমিও অনেক বছরই ভেবেছি। আমার কোন কোন বন্ধু তিনবারও ঘুরে এসেছে। গত বছর দুই অনেক ইউটিউবের ভিডিও দেখে কাশ্মীর নিয়ে আগ্রহ আরও বেড়েছে। চাকরী থেকে অবসর নিয়ে এবার শুধু দেশের বেড়ানোর জায়গাগুলি ঘুরে বেড়াবো, এরকম ভেবে রেখেছি। ইউটিউবে দেখে দেখে কোন সময় কাশ্মীর যাওয়া যায় তাই নিয়ে বেশ চাপে পড়তে হল। আমার একটা বিশেষ ইচ্ছা হল, আপেল বাগানে আপেল পেকে আছে, সেই সুন্দর দৃশ্য দেখতে হবে। পূজার সময় আপেল পাকে, এই খবরটা পেলাম। তাই ঠিক করলাম, পূজার সময়ই যাবো। মেয়েকে সাথে নিতে হলে পূজার সময় ঠিক হবে না, পূজার পর পরই যেতে হবে। এরপর ঠিক করতে হবে, প্লেনে করে যাব না , ট্রেনে।

এখন তো হাতে অঢেল সময়। হুশ করে প্লেনে করে গিয়ে আবার উড়ে ফিরে আসার দরকার কি! ট্রেনে গেলে জানালা দিয়ে মাঠ ঘাট দেখতে দেখতে যেতে পারি। ট্রেনের খবর খুব সুবিধার নয়। এদিক থেকে জম্মু তাওয়াই যাওয়ার দুটি মাত্র ট্রেন; দু রাত ট্রেনের মধ্যে বসে থাকা। তারপর দু'শো কিমি গাড়ী করে যাওয়া , বেশ ঝামেলার ব্যাপার। আর একটা রাস্তা আছে, দিল্লি থেকে আর একটা ট্রেন ধরে কাটরা যাওয়া যায়। এতে গাড়ীর রাস্তা চল্লিশ কিমি কমবে। তাছাড়া আমার অনেকদিনের একটা ইচ্ছা পূরণ করা যায়। ট্রেনের সময় সূচি দেখে বুঝলাম, রাজধানী ধরে গেলে সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেনে দিল্লী থেকে কাটরা যাওয়া যাবে। পূজার ছুটির সময় ট্রেনের টিকিট কাটতে হলে, একশ কুড়ি দিন আগেই কাটতে হবে। ক্যালেন্ডার দেখে ঠিক ঐ একশ কুড়ি দিন আগের তারিখটা দেখে রাখলাম। কিন্তু ঐ তারিখটাতেই আমাদের ভিমতালে থাকার কথা। মোবাইলেই টিকিট কাটতে হবে। সাথে মেয়েকেও বলে রাখলাম, আমার কোন সমস্যা হলে ও যাতে বাড়ীতে বসে ল্যাপটপে টিকিট কাটতে পারে। এইবারই প্রথম, একেবারে টিকিট দেওয়া শুরু হওয়ার পনের মিনিটের মধ্যেই টিকিট কাটতে পারলাম। ঐ দিন দুপুর সাড়ে এগারোটায় সব টিকিট বিক্রী হয়ে , ওয়েটিং লিষ্ট শুরু হয়েছে দেখেছিলাম। পরদিনই দিল্লী থেকে কাটরা ট্রেনের টিকিটও কেটেছিলাম। ফেরার ব্যবস্থাও ঐ একই রাস্তায়। এসব খবর কিন্তু চার মাস আগের। এর মধ্যে রাঁচি ভ্রমণ করে এসেছি। আবার ডিসেম্বর মাসে মধ্য প্রদেশ ভ্রমণের জন্য টিকিট কেটে নিলাম।

রাজধানীতে প্রথম ভ্রমণের খবর আগেই লিখেছি। রাজধানী দিল্লী পোঁছয় এগারোটা নাগাদ, কাটরা ট্রেনের সময় সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ এ। দিল্লিতে এসে ঘন্টা সাত আট বসে থাকতে হবে। তাই ট্রেনের টিকিট কেনার সাথে সাথেই রিটায়ারিং রুমও বুক করলাম। এদের আবার নানান রকম ভিরকুটি আছে। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা আট টা , চাইলেও বুকিং হল না। কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যা আটটা থেকে ২৪ ঘন্টার জন্য বুকিং পেলাম। রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লী পৌঁছল দশটা পঞ্চাশ এ। প্লাটফর্মে নেমে খোঁজ করে জানলাম, রিতায়ারিং রুম ষোল নম্বর প্লাটফর্মে। ওদিকে গিয়ে, তিন তলায় উঠে জানলাম, ওখানেও আছে, কিন্তু আমাদের ১১৪ নং রুম এক নম্বর প্লাটফর্মে। আবার চলো উল্টো দিকে। খাতায় নাম লিখে চাবি নিয়ে রুমে ঢুকলাম এগারোটা পনের নাগাদ। স্নান করে দুপুরের খাবারের জন্য বেরোলাম। রেলের যে ভোজনালয় আছে, সেখানে রাজমা চাওল ছাড়া আর কিছু নেই। হেঁটে বড় রাস্তায় গেলাম। সামনের দোকানটাতেই ঢুকে পড়লাম। শুধুই ভেজ থালি আছে। তাই নিলাম। দাম দিতে গিয়ে বুঝলাম, ডাকাতের কবলে পড়েছি। যে থালীর দান দেড়শ টাকা হলেই বেশী, তার দাম নিল সাড়ে তিনশ টাকা করে। রাতের ট্রেনে খাওয়ার জন্য রুটি তরকারী প্যাক করে নিতে আবার ঐ বাজারটাতে গেলাম। গলির ভেতর একটা দোকানে দেখলাম, স্পেশাল থালি একশ তিরিশ টাকা। মেয়ে একদিন কম ছুটি নেবে বলে আমাদের সাথে ট্রেনে আসেনি। পরদিন দুপুরে প্লেনে উঠেছে। হিসেব মত অন্তত এক ঘন্টা আগে দিল্লী স্টেশনে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু পৌঁছল সাড়ে ছয়টা নাগাদ। শুধু ঢুকে আমাদের রুমটা একবার দেখল। আমরা সাত নম্বর প্লাটফর্মে পৌঁছনোর দশ মিনিট পর ট্রেন দিল। এই ট্রেনটা গোটাটাই রাত্রে রাত্রে; জানালার বাইরে দেখার কিছু নেই। ট্রেনে বসেও কাটরার গাড়ীর এজেন্টকে জানালাম, সকালে পৌঁছব। কাটরা পৌঁছে নতুন সিম কার্ড নিয়ে কাশ্মীর এ যেতে হবে। কিন্তু ভোরে জম্মু পৌঁছেই দেখলাম, মোবাইলে কোন সিগন্যাল নেই। কাটরা পৌঁছে দেখলাম, পৌনে ছ'টাতেও অন্ধকার। প্রায় সবাই প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়েই বৈষ্ণদেবী মন্দিরে যাত্রার জন্য নাম লেখাতে লাইন দিল। আমরা মন্দিরে যাব না। তাই বেরিয়ে ঠিক উল্টো দিকের দোকানে সিম কার্ড নেওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। গোটা তিনেক লোক একটা করে টেবিল নিয়ে, দোকান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের তিন জনের সিম কার্ড নিয়ে, এক্টিভেট করতে মিনিট পনের কুড়ি লাগল। তারপর গাড়ীর জন্য ফোন করতে পারলাম। ড্রাইভার বলল, মিনিট পনের পরে আসছে। আমরা ঐ ট্রাভেল এজেন্সির দোকানে বসে চা খেলাম। সাতটার আগেই গাড়ী এসে গেল। ঠিক মত আলো ফুটতে প্রায় পৌনে সাতটা বেজেছিল। ড্রাইভার জানাল, শ্রীনগর পৌঁছতে সাত ঘন্টা লাগবে। সুন্দর রাস্তা ধরে চলল গাড়ী। দেড় ঘন্টার মত চলে রাস্তার পাশের একটা দোকানে প্রাতরাশ করতে থামলাম। পাহাড়ী রাস্তা, পাশে পাশে চলল চেনাব নদী। সাড়ে এগারোটায় একটা দোকানে চা খেতে বসলাম। দোকানদার বলল, এরপর ভালো রাস্তা, দু ঘন্টায় পৌঁছে যাবেন। রাস্তা বেশ ভালো। কিন্তু কয়েক কিলো মিটার

পরই জ্যামে পড়লাম। বানীহাল শহর পেরোতেই দেড়টা বেজে গেল। রাস্তার পাশের একটি হোটেলে পৌছে দুপুরের খাওয়ার খেয়ে নিলাম। বানিহাল পর্যন্ত গোটা তিন চার টানেল পেলাম। প্রথম টানেলটি সাড়ে নয় কিলো মিটার। বাণীহাল পেরিয়ে আধঘন্টা মতো চলার পর আবার একটা নয় কিমি টানেল পেরোলাম। তারপর থেকেই সোজা চওড়া রাস্তা। পাশে পাশে ধানের ক্ষেত। ধান কাটা হয়ে গেছে। গাড়ী সোজা চলল হু হুঁ করে। এক জায়গায় শুরু হল ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর কারখানা। রাস্তার দু পাশের প্রায় সব বাড়ীতেই ব্যাট তৈরীর কাঠ সাজানো। এরকম অন্তত তিন চার শ বাড়ী দেখলাম। তারপর আবার শুরু হল কেশরের দোকান। শক্তিগরের ল্যাংচা দোকানের মত , মাইল চারেক ধরে চলল কেশর দোকান। হাজার থানেক। শ্রীনগর পৌঁছতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। তার মানে রাস্তায় রাস্তায় দু দিনের বেশী কেটে গেল।
১৭.১০.২৪.

কাশ্মীর ভ্রমণ 2

কাশ্মীর ভ্রমণ করতে এসে একটা দিন পথে পথে কেটে যাবে? এখানে সূর্য ডোবার সময় কলকাতার থেকে প্রায় চল্লিশ মিনিট পর। আমরা হোটেলে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে, একবার ডাল লেক থেকে ঘুরেই আসি, এই ভেবে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোটেল ডাল লেক থেকে দেড় কিমি দূরে। রাস্তায় একটা অটো নিলাম, একশ টাকা ভাড়া। লেকের পাড়ে হাঁটতে শুরু করতেই শিকারাওলা ছিনে জোকের মত ধরে ফেলল। অন্তত আধ ঘন্টা দিনের আলো আছে দেখে রাজী হয়ে গেলাম। বেশ দরাদরি করে , এক ঘন্টা, আটশ টাকায় রফা হল। বহু প্রতীক্ষিত ডাল লেকে শিকারা ভ্রমণ শুরু করলাম। এই ভ্রমণের জন্য কোন তিথি নক্ষত্র দেখে বেরোইনি। ঘটনাচক্রে এটা ছিল, কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। আমরা ঘটনাচক্রেই ঠিক সন্ধ্যার মুখে শিকারায় উঠেছি। একটু পরেই দেখি পাহাড়ের মাথায় গোল চাঁদ উঠেছে। বেশ কিছু ছবি তোলা হল। আমরা এ বছরের প্রথম দিকে কেরালার ব্যাক ওয়াটারে হাউস বোট এ থেকেছি। সেখানে বড় বজরা মাইলের পর মাইল জলে ঘুরে বেড়ায়। ডাল লেকের ধারে ধারে অসংখ্য হাউস বোট। এরা চলে না। তাই এতে থাকার আগ্রহ ছিল না। আমরা শিকরা থেকে দেখলাম। শিকরা চলতে শুরু করতেই ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা করে নানান জিনিস বিক্রী করতে পাশে পাশে চলল। আমরা একটা ডিঙ্গি থেকে কাওয়া কিনে খেলাম। এটা কাশ্মীরের এক বিশেষ পানীয়। কফির থেকে দাম বেশী। আমার তেমন কিছু ভালো লাগেনি। শিকরা থেকে জলে ভাসা অনেক ছোট ছোট বালি হাঁসের মত পাখি দেখলাম। অন্ধকার হলে , সব হাউস বোট এ আলো জ্বলে উঠল। জলের ধারে ধারে মীনা বাজার। শাল ইত্যাদির দোকান। আমরা নামিনি। ঘাটে ফিরে এসে কম বয়সের ছেলেদের কাছে চা খেলাম। সব ট্যুরিস্ট স্পট এর মত এরাও লোক ঠকাতে ওস্তাদ। চা তিরিশ টাকা বলে, দাম নেওয়ার সময় পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নিল। এ এমন কিছু নয়। পরে আরও বড় ঠগের পাল্লায় পড়েছি। আবার একটা অটো নিয়ে ফিরে এলাম। আমাদের হোটেলের গলিতে ঢোকার আগের বড় রাস্তার পাশে প্রচুর দোকান পাট। কিন্তু সন্ধ্যার পর কোনোটাতে একটাও খদ্দের দেখলাম না। শিকারার থেকেও শুধুই বাংলা ভাষায় কথা শুনলাম। এদিকের দোকানে যে দু একটা খদ্দের দেখলাম, তারাও বাঙালি। ১৮.১০.২৪.

কাশ্মীর ৩

আজ সতেরই অক্টোবর। শ্রীনগরে যা কিছু দেখার আছে আজ দেখে নিতে হবে। এখানে সকলেই প্রথমে যায় , শঙ্করাচার্য মন্দিরে। এটা একটা পাহাড়ের মাথায় শিব মন্দির। শঙ্করাচার্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বর্তমান মন্দিরটি ততোটা পুরনো নয়, পরের দিকে কোন রাজা পুরোনো মন্দিরটি সংস্কার করেছেন। এই মন্দিরে ওঠার সময়, পাহাড়ের মুখেই সি আর পি এফ ভালকরে পরীক্ষা করে তারপর গাড়ী ছাড়ে। পাহাড়ের পাকদন্ডি বেয়ে অনেকটা উঠে যায় গাড়ী। বড় ট্রাভেলার গাড়িগুলি প্রায় এক কিমি আগেই দাঁড়িয়ে যায়। চার চাকার গাড়ী আরও পাঁচ সাত শ মিটার উঠে যায়। ওখান থেকে দু তিনশ মিটার হেঁটে এগোতে হয়। বিশেষ করে ট্রাভেলার এর যাত্রীরা অনেকে অটো করে বাকী রাস্তা ওঠে। আবার বেশ ভালো করে চেকিং হল। তারপর প্রায় চারশ সিঁড়ি উঠতে হয়। আমরা কিছুদিন আগেই রাঁচির জলপ্রপাত দেখতে কয়েক হাজার সিঁড়ি ওঠা নামা করেছি। এখানে সিঁড়ি বেশ উচু উচু, তাই পা ধরে যায়, অনেকেই বেশ হাঁপিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। ওপর থেকে গোটা শ্রীনগর শহর দেখা যায়। সকলেই ছবি তোলার চেষ্টা করে, আমরাও করলাম। মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির মুখে সত্তর আশি জনের মত লাইন পড়ল। কিন্তু মিনিট পাঁচ সাত এর মধ্যে শিব লিংগ প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে এলাম। এরপর গোটা পাঁচেক সুন্দর বাগান দেখা। ডাল লেকের পাড়ে পাড়ে গাড়ী চলল কয়েক কিমি। এখানে লেক বেশ চওড়া। শিকারা প্রায় নেই এদিকে। চশমে শাহী বাগান দেখার জন্য দু কিমি আগেই গাড়ী পার্কিং এ রাখতে হল। অটো নিয়ে যেতে দু' শ টাকা, ফিরতে দু 'শ টাকা। বাগানগুলি সবই মোগল আমলের। কিন্তু এখনও বেশ ভালো আছে। সবকটা বাগানেই ঢোকার টিকিট তিরিশ টাকা। বোটানিক্যাল গার্ডেন সম্ভবত অনেক পরের। শালিমার গার্ডেনের ভেতরে বেশ কিছু মোঘল আমলের স্থাপত্য ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফোয়ারায় জল নেই। এই বাগানে বেশ কিছু পুরনো চীনার গাছ আছে। চিনার এদের গর্বের গাছ। এক একটা গাছের বয়স 375 বছরের বেশী। পরেও অনেক এরকম প্রাচীন গাছ দেখেছি। একেবারে রাস্তার মাঝে রাখা আছে বিশাল বিশাল চিনার গাছ। আমাদের এদিকে রাস্তার পাশে গাছ থাকলেই তাকে কাটা হয়। রাস্তার পাশে গাছ থাকবে কেন! সবকটা বাগান দেখা হলে হোটেলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা হলেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে, তাই আর বেরোনো হচ্ছে না।

আঠারো তারিখ সকালে বেরোলাম গুলমার্গ দেখতে। ঘন্টা দুই আড়াই সময় লাগে। গুলমর্গ পৌঁছনোর দশ বারো কিমি আগে থেকে পাহাড়ে ওঠা শুরু। সুন্দর পাইন গাছের ছায়ায় ছায়ায় পাকদন্ডি রাস্তা। মাঝে দু একটা ভিউ পয়েন্ট করা আছে, ছবি তোলার জন্য। পাহাড়ে অনেক হলুদ পাতার মাঝারী মাপের গাছ; ড্রাইভার বলল ওগুলি আখরোট গাছ। গুলমার্গ পৌঁছনোর সাথে সাথেই ঘোড়ার দালাল জুটে গেল। আমরা আগেই জানতাম, রোপওয়ে পর্যন্ত যেতে ঘোড়া না নিলেও চলে। কিন্তু গাড়ী নিলে পাঁচ ছয়টা পয়েন্ট দেখাবে বলে, গাড়ী নিতে রাজী করিয়ে ফেলল। শুরু করল ছয় হাজার টাকা থেকে। শেষে সাড়ে তিন হাজার টাকায় রফা হল। গাড়ী থেকে নেমেই বুঝলাম, এটার জন্য এক হাজার টাকা ভাড়া হওয়া উচিত। টুরিষ্ট স্পটে দালালের খপ্পরে পড়ে দরাদরি করতে হবে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু এরকম ডাকাতের কবলে পড়তে হবে, কে জানত!

২০.১০.২৪.

কাশ্মীর ভ্রমণ 4

গুলমার্গের গন্ডোলা , মানে রোপওয়ে। এর টিকিট এর দারুন চাহিদা। আমরা দু মাস আগে অনলাইনে টিকিট কেটে নিয়েছিলাম। চাহিদা ওখানে গিয়ে বুঝলাম। বিশাল লম্বা লাইন। আমাদের টিকিট এই আঠারই অক্টোবর সকাল এগারোটা পনের থেকে একটা পনের সময়ের। আমরা দশটা কুড়ি নাগাদ গুলমার্গ পৌঁছেছি। সাড়ে তিন হাজার টাকার গাড়ী আমাদের মিনিট চারেকে একটা জায়গায় এনে থামাল। রাস্তার বাম দিকে সুন্দর তৃণভূমি। ছবি তোলার মতই। ডান দিকে কুড়ি ধাপ মত সিঁড়ি উঠে ছোট্ট মিলিটারী মিউজিয়াম। একটি হল ঘরে আধুনিক অস্ত্র ইত্যাদির প্রদর্শনী। আর অনেক ছবি। এখানে ছবি তোলা যায়। উল্টো দিকের হলে অনেক ঝকঝকে বসার চেয়ার। সিঙ্গারা আর সন্দেশ বিক্রি করছেন। আমি একটা সিঙ্গারা খেলাম। এরপর গন্ডোলা পর্যন্ত যেতে এক কিমি মত রাস্তা। পাশে পাশে গোটা চার পাঁচ জায়গায় নেমে দেখতে বলল। ব্রিটিশ আমলের গল্ফ গ্রাউন্ড, এই সব। আমরা কোথাও না নেমে সোজা গিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। হলের বাইরে প্রায় চার পাঁচ শ লোকের পিছনে দাঁড়ালাম। কিছু লোক লাইন ভেঙ্গে এগোনোর চেষ্টা করছে দেখে সি আর পি জওয়ান দারুণ ধমক দিল। হলের ভেতরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রায় এক ঘন্টা লাইন চলল। এরপর টিকিটের কিউ আর স্ক্যান, আধার কার্ড মিলিয়ে ছাড়া হল। এক একটা গন্ডোলায় ছয় জনের বসার ব্যবস্থা I হিসেব করে করে বসানো। যেমন আমরা তিনজন, সাথে আর তিনজন ডেকে বসাতে হচ্ছে। মিনিট দশ বারো চলার পর প্রথম ধাপ I ওখানে নেমে অনেকটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর মত আছে। এখন বরফ নেই। কিছু ছবি তুলে, দ্বিতীয় ধাপের জন্য লাইন দিলাম। আবার মিনিট দশেক উঠে গেলাম। ওখানে ধুধু প্রান্তর। পাথরের খাঁজে খাঁজে কিছু বরফ পেলাম। এই জায়গা প্রায়ই বরফে ঢেকে থাকে। আমরা আপেল দেখার জন্য এসেছি, এ সময় বরফ থাকে না। আবার সেই ফেরার লাইন। এক এক ধাপে এক ঘন্টা লাইন। প্রথম ধাপে নেমে, মাঠের অন্য প্রান্তে গিয়ে খেয়ে নিলাম। পরে অবশ্য বুঝেছি ঐ খাদ্য খুব স্বাস্থ্যকর ছিল না; আমাদের সবার পেট খারাপ হল। ফেরার পথে আমাদের ভ্রমণের মূল আকর্ষণ; আপেল বাগানে গাছে পাকা আপেল দেখা , হল। কুড়ি টাকা করে দিয়ে বাগানে ঢোকা হল। আমাদের আগে একটা বড় দল ঢুকেছে। বাগানে ঢুকে তো আমাদের আনন্দে আত্মহারা অবস্থা। এতোদিন ছবিতে দেখেছি, এবার নিজের চোখে দেখলাম। সবাই ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত। এটা ছোট একটি বাগান, সব গাছ ভরে আছে পাকা আপেল। খুব কড়া পাহারা। আগের দলের লোকদের প্রায় ঠেলে বের করছিল। বাগানের মধ্যে পেটি পেটি আপেল বিক্রী হচ্ছে। সাথে সাথে তৈরী করা আপেলের রস খেলাম। চল্লিশটি আপেলের একটি ছোট প্যাকেট চারশ টাকায় কেনা হল। আঠারো কেজির বড় পেটি, তাও দু একটা বিক্রী হল। পরে রস বিক্রেতার কাছ থেকে জানলাম, এই বাগানের আপেল পাড়া হয় না, এগুলি শুধু ছবি তোলার জন্য রাখা। পরে আমরা অন্য বাগানে, একেবারেই গাছ থেকে পাড়া আপেল খেলাম। হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। অপেলের পেটি গাড়িতেই থাকল। এই গাড়ী আমাদের কাটরা স্টেশনে পৌঁছে দেবে। ২১.১০.২৪.

কাশ্মীর ভ্রমণ 5

19 অক্টোবর আমাদের সোনমার্গ যাওয়ার কথা। শ্রীনগর থেকে প্রায় নব্বই কিমি দূর, তাই সকালে আটটাতেই রওয়ানা হলাম। আমাদের এই ড্রাইভার খুব সময় মেনে চলে। শহরের বাইরে বেরনোর জন্য একটি সরু শহরতলীর রাস্তা ধরে অনেকটা চললাম। একটা জায়গায় রাস্তার পাশে পরপর বেশ কয়েকটি প্রাচীন চিনার গাছ আছে। প্রায় গোটা রাস্তার পাশে, এমনকি রাস্তার মাঝেও বিশাল বিশাল চিনার গাছ। কেউ কোনোদিন একটা ডালও কেটেছে বলে মনে হয় না। শহর থেকে দশ বারো কিমি বাইরে, শিন্ড নদীর উপর ব্রীজ পেরিয়ে অন্য পাড়ে গেলাম। গোটা রাষ্টাই এই নদীর পাড়ে পাড়ে চললাম। এটা কিন্তু ইন্ডাস বা সিন্ধু নদী নয়। এগারোটা নাগাদ সোনমার্গে গাড়ী পৌঁছল। গাড়ী থামার সাথে সাথেই ঘোড়ার দালাল এসে গেল। তিনটি ঘোড়ার জন্য বারো হাজার টাকা বলল। আমরা তিন বারো ছত্রিশ থেকে দরাদরি শুরু করে সাড়ে চার হাজার টাকায় রফা হল। আমরা কেউ কোনোদিন ঘোড়ায় চাপিনি। এগুলি সবই একটু নিচু। আসলে এরা সব খচ্চর। বাংলায় কেন যে এদের নিয়ে একটা গালাগালি চালু হয়েছে জানিনা। এরা কিন্তু বেশ বাধ্য হয়ে থাকে দেখলাম। আমাদের তিনজনের জন্য একজন সহিস। উনিশ বছরের ছেলে। ওই আমাদের গাইড। মুখে নানান শব্দ করে, শিষ দিয়ে ঘোড়াদের নির্দেশ দেয়। আমার স্ত্রী ওকে জিজ্ঞেস করল, তুমি একা তিনটি ঘোড়া কি করে সামলাবে? ও বলল, আমি দশটা ঘোড়া সামলাতে পারি। পঞ্চাশ মিটার মত বাঁধানো ফুটপাথ ধরে চলার পর, ডানদিকের রাস্তা ধরল ঘোড়ার মিছিল। সামান্য সময় পরই এবোরো খেবড়ো পাথরের ভেতর দিয়ে চলল। নীচের দিকে তাকালে মনে হবে , এই বুঝি ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ল। কিন্তু ওরা যে ওতেই চলতে অভ্যস্ত, একটা ঘোড়াও একবারও হোঁচট খেল না। সহিষ ছেলেটি পাশে পাশে ধারা বিবরণী দিতে দিতে চলল। ডান দিকে একটু নিচে একটা মাঠ মত দেখিয়ে বলল, ওখানে অমিতাভ বচ্চনের সিনেমার শ্যুটিং হয়েছিল; সিনেমার নামও বলল। আমার মত বেরসিকের কাছে সবই সমান, নামটা একটু পরেই ভুলে গেলাম। আরও একটা জায়গায় ঐ রকম সিনেমার শ্যুটিং এর খবর বলেছিল। এক কিমি মত চলে, আমরা ওপর থেকে দেখলাম নিচে একটা জায়গায় বেশ কয়েকটি ঘোড়া জড়ো হয়েছে। ছেলেটি বলল, ওটি এক নম্বর পয়েন্ট। আমরা আরও এগিয়ে যাব, তাই ওখানে নামব না। দু দিকেই বিশাল বিশাল উঁচু পাহাড়, মাঝে পাথর ছড়ানো নদীর পথ। সামান্য একটা জলের ধারা দেখা যায়। একটা জায়গায় উল্টো দিকের পাহাড়ে একটি হিমবাহ দেখিয়ে বলল, ওটি থাজিবাস হিমবাহ। নদীর থেকে অন্তত হাজার ফুট উপরে সাদা বরফ নেমে এসেছে। আমরা এদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চললাম। চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ঘোড়া নীচের দিকে নেমে একেবারে নদীর কাছে চলে এল। সহিশ ছেলেটি আমাদের দেখিয়ে দিল, কেমন করে লাগাম আলগা করে ঘোড়াকে জল খেতে দিতে হবে। পাথরের উপর দিয়ে কয়েক ইঞ্চি গভীর জল বয়ে যাচ্ছে। সব ঘোড়া ওখানে মুখ দিয়ে জল খেয়ে তারপর এগোল। নদীর পাশে অনেকটা মাঠের মত; তার মধ্যে একজন চা বিক্রী করতে বসেছে। আমরা ঘোড়া থেকে নেমে চা খেলাম। অনেকেই ওখানে চা খেয়ে ফেরার রাস্তা ধরল। আমাদের ঘোড়া চলল এগিয়ে। আবার একটু একটু করে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যেতে থাকল। সামনে আর ঘোড়া দেখতেও পাচ্ছিলাম না। একটু দূরে উঁচু পাহাড়ের খাঁজে আর একটা হিমবাহ দেখতে পাচ্ছিলাম। ঐ উপরে ওঠার কথা ভাবতেই পারছিলাম না। ক্রমশ উঠতে উঠতে নদীর জলের ধারা থেকে প্রায় হাজার ফুট উপরে উঠে গেলাম। একটি জায়গায় প্রায় পঁচিশ তিরিশ ফুট রাস্তা এক ফুট বা তারও কম চওড়া। ঘোড়া নিজের ছন্দে চলল। সেরকম লোক হলে নীচে নদীর দিকে তাকিয়ে ভয়েই শেষ হয়ে যেতে পারে। ঐ পথে ফেরার সময় উল্টো দিক থেকে গোটা চারেক ঘোড়া এসে গেল। দুজন মানুষ পের হওয়াই অসম্ভব। এদিকে একটা জায়গায় চারটি ঘোড়াকে থামিয়ে ওদের সহীশ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল, আমরা পেরনোর পর ওরা গেল। আমাদের সহীস ছেলেটি বলল, আমি শিষ দিয়ে ওদের জানিয়ে থামতে বলেছি। পরের কথা আগে বলে দিলাম। ঐ ভয়ংকর মোড়টা পেরনোর পর সামনে গোটা দুই ঘোড়া দেখলাম। এক সাদা চামড়ার ছিপছিপে যুবক হাতে একটা হেলমেট ঝুলিয়ে হেঁটে ফিরছে দেখলাম। ঐ বিকট পাথুরে রাস্তায় কি করে হাটছে, ভাবাই যায় না। এক পাথর ছড়ানো জায়গায় পৌঁছনোর আগে, একটু বাম পাশে একটা খাদের উপরে একটা পাথরের সেতুর মত হয়ে আছে দেখলাম। ওটার কুড়ি পঁচিশ ফুট দূরে, ঘোড়া থেকে নামতে বলল। তারপর সামনের কাঠ কয়লায় ঢাকা একটা বিরাট চাথাল দেখিয়ে বলল, ঐ দেখুন গ্লেসিয়ার। প্রথমে তো বুঝতেই পারিনি কোথায় দেখতে বলছে। পরে সেই ন্যাচারাল ব্রীজ এর অন্য প্রান্ত দেখে বুঝলাম, ওটা হিমবাহ গলে, একটা বিরাট খোদল মত হয়েছে। ওদিকে হলদেটে সাদা মার্বেল পাথরের মত ওটি আসল জমাট বাঁধা হিমবাহ। ওটিই সিন্ড নদীর উৎস। সোন মার্গে এসে যে একেবারে একটা নদীর উৎস পর্যন্ত যাওয়া যায়, আগে কেউ বলেনি। আমি ইউটিউব ভিডিও দেখেছি, থাজীবাস হিমবাহ সাদা বরফ নিয়ে নদীর কাছে নেমে এসেছে। সেই সময় আরও দেড় কিমি এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ফেরার জন্য ঘোড়ায় উঠতেই ঘোড়াগুলি যেন দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে শুরু করল। এবার আর নদীর কাছে নামাই হল না। উপরের পথ ধরেই চললাম। ঘোড়া মাঝে মাঝে পড়ে থাকা শুকনো পাতা খেতে থাকল। এ বেচারাদের কোন সময়ই বোধহয় পেট ভরে খাওয়া জোটে না। যেতে দু ঘন্টা, ফিরতে এক ঘন্টা

লাগল। ফিরে ঘোড়া থেকে নামতেই ঘোড়ার আসল মালিক এসে গেল টাকা নিতে। সোহিস বলল, আমাকে বখশিস দিন। একশ টাকা দিলাম। মালিক লোকটিকে UPI Payment করতে গিয়ে পড়লাম বিপদে। এমন বিপদে এই প্রথম পড়লাম। সে এক ভিড়কুটি কান্ড। চলল প্রায় তিন দিনের বেশী। ২২.১০.২৪.

কাশ্মীর 6

আমি অনেকদিনই SBI BHIM UPI ব্যবহার করি। ভীম মাঝে মাঝেই কাজ করে না। আসলে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত বেশি যে, এতটুকু সন্দেহ হলেই, পেমেন্ট বন্ধ করে দেয়। আমার এই সমস্যা হচ্ছে দেখে, আমার মেয়ে বলল, বাইরে যাচ্ছ, ফোন পে লাগিয়ে দিচ্ছি। বাড়ীতে বসে দু চারটি লেনদেন করে , পরীক্ষা করে নিলাম। কাশ্মীরে গিয়েও ঠিকই কাজ করছিল। সোনমার্গে ঘোড়ার আসল মালিককে সাড়ে চার হাজার টাকা দিতে গিয়ে, ঝুলে গেল। Processing চলল তিনদিন ধরে। ঘোরাওলা বলল, এই সমস্যা হয় মাঝে মাঝে, দু দিনও লাগে। ওকে বললাম, ঐ আমাদের গাড়ী, ওখানে গিয়ে বসি। দেখি হয় কি না। ওর তাতে আপত্তি নেই। গাড়ীর ড্রাইভার মাঝে মাঝেই লোক নিয়ে আসে। রাস্তায় হোটেল, আপেল বাগান এসব জায়গায় ওকে চেনে দেখেছি। ওকে বললাম সমস্যাটা। ও জানাল , ঘোড়াওলার সাথে আলাপ নেই। আরও কিছুক্ষণ দেখার জন্য, ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড এর পাশের একটা সুন্দর হোটেলে ঢুকে বসলাম, দুপুরের খাবারের জন্য। আমাদের সবারই পেট বিগড়ে আছে। তাই খাবার প্রায় কিছুই পেলাম না। খিচুড়ি খেতে গিয়ে দেখি, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে, ভয়ংকর ঝাল করে দিয়েছে। তাই কয়েক চামচ খেয়ে তো রাত্রে আমাকে বার চারেক উঠতে হল। আমাদের বেড়ানোর এইটা সবথেকে বড় সমস্যা; বাইরের কোন খাওয়ার সহ্য হয় না। হোটেলের খাওয়ার টেবিলে বসে , আমার মেয়ে ফোনে নানান ভাবে চেষ্টা করে চলল, যদি ঐ UPI Payment টা বন্ধ করা যায়; হল না। আমার Bank of Baroda থেকে যদি payment Stop করা যায়, ওদের দুটি ল্যান্ড লাইনে ফোন করলাম। ফোন বেজেই গেল, কেউ ধরল না। Phone pay Customer care এ কয়েকবারের চেষ্টায় কানেকশন হল। কিন্তু OTP তো আসবে কলকাতার মোবাইলে; সে তো ওখানে কাজ করে না। সব চেষ্টা ছেড়ে , শেষ পর্যন্ত ঘোড়াওলাকে ক্যাশ টাকা দিয়ে চলে এলাম। লোকটি ভদ্রলোক। টাকা ওর একাউন্ট এ ঢুকলে, ফেরৎ করে দেবে, এই আশা করে চলে আসা ছাড়া করার কিছুই ছিল না। অ্যাপ দেখাচ্ছিল, Processing, ৪৮ ঘন্টাও লাগতে পারে। পরের দুদিন একই জিনিস দেখিয়ে গেল। তিন দিন পর যখন প্রায় কাটরার কাছে ফিরে এসেছি, গাড়ীতে বসে অ্যাপ খুলে দেখি, পেমেন্ট হয়ে গেছে। মেয়ে সাথে সাথেই ঘোড়ার মালিককে ফোন করে জানাল। আমার ফোনের থেকে পেমেন্ট স্ট্যাটাস ওর Whats app এ পাঠাতেই , আমার UPI তে টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। আজকাল UPI, কার্ড পেমেন্ট এসবের জন্য আমি তো ATM Card ও নিয়ে যাই না। ক্যাশ টাকা কিছু থাকে সাথে। পরদিন সকালে আমরা শ্রীনগরের হোটেল ছেড়ে পাহেলগাও রওনা দেব। এই সব শীতের জায়গায় হোটেলের ছেলেগুলো আটটার আগে ঘুম থেকে উঠতে চায় না। আগের রাতে বলে, বিল তৈরী করে নিতে হয়। আমরা ভোরে উঠে, গরম জলে স্নান করে, আটটায় হোটেল ছেড়ে দিয়ে গাড়ীতে ওঠার জন্য তৈরী। মেয়ে বিল মেটাতে গিয়ে ফিরে এসে বলল, ATM এ যেতে হবে, এরা ক্যাশ টাকা দিতে বলছে। এত ভাল হোটেল, UPI payment নেবে না, ভাবি নি। হোটেলেরই একটি ছেলে আমাদের নিয়ে চলল ATM দেখাতে। এর মধ্যে আমাদের চার দিন থাকা হয়ে গেছে শ্রীনগরে। শহরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, আধুনিক অস্ত্র হাতে CRPF দেখে দেখে, ওটাই স্বাভাবিক বুঝে গেছি। এমন কি হাই ওয়ের পাশে চাষের মাঠেও ওদের ডিউটি করতে দেখে দেখে, ওটাই স্বাভাবিক বুঝে গেছি। কিন্তু আজ সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে গলির মুখে আসতেই ওদের সংখ্যা অস্বাভাবিক বেশী দেখলাম। বড় রাস্তা সকালে ফাঁকা ফাঁকা থেকেই; আজ লালচক সবদিক দিয়ে বন্ধ। গাড়ী ঢোকা তো বন্ধই, আমাদের হেঁটেও যেতে দিল না। ঘুরে গেলাম ATM এ। প্রথম ATM এ মেয়ে ঢুকে যতক্ষণে বেরল, বাইরে থাকা CRPF জওয়ান এর সাথে গল্প করলাম। একজন বাঙালি জওয়ান ছিলেন, তার সাথেই কথা হল। মেয়ে বেরিয়ে বলল, এখানে টাকা নেই। জওয়ানই দেখিয়ে দিলেন, উল্টো দিকে J & K ব্যাংক এর ব্রাঞ্চ অফিস। সেটার ভেতরেই ATM, কাজ হল। ফেরার সময়ও ঘুরে আসতে হল। লালচকে মাছি গলতে পারছে না। হোটেলের ছেলেটা দেখলাম নির্বিকার। সে বলল, আজ রবিবার, এই বড় রাস্তার পাশের ফুটপাথে বাজার বসবে, দশটার পর মেলার মত ভিড় হবে। ঐ রবিবারের হাটের জন্য এত কড়াকড়ি কি না বুঝলাম না। পরে খবরে দেখেছি, আগের দিন দূরে কোথাও জঙ্গি হানা হয়েছে। আমরা স্বাভাবিক ভাবেই পহেলগাও রওনা দিলাম। ঐ শ্রীনগরে ছাড়া আর কোথাও কড়াকড়ি দেখিনি এই কদিনে। প্যাহেলগাও এর গাড়ীর ড্রাইভার ছেলেটিও খুবই ভালো পেয়েছিলাম। সে নিজের থেকেই বলল, টিভিতে টেররিস্ট এ্যাটাক ইত্যাদি দেখিয়ে ট্যুরিস্টদের ভয় পাইয়ে দেয়। টুরিষ্টই তো আমাদের সব; ট্যুরিজম নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি। ঘোড়ার দালাল, বা গাড়ীর দালাল ছাড়া সবার ব্যবহারই বেশ আন্তরিক। আমার ঐ ঘোড়ার মালিক আমাকে টাকা না পাঠালে আমি কিই বা করতে পারতাম! পাহেলগাঁও ভ্রমণই কাশ্মীর ভ্রমণ এর আসল মজা। শেষ দুদিন ওখানে ছিলাম। ওখান থেকে ফেরার রাস্তাও আমাদের জন্য অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ২৩.১০.২৪.

কাশ্মীরে ৭
কুড়ি তারিখ, রবিবার সকালে আমরা চললাম পাহেলগাম। আমি আগেই বলেছি, আমার এবার কাশ্মীর ভ্রমণ এর দিন ঠিক করেছি, বাগানে পাকা আপেল দেখার জন্য। আসার সময়ই গাড়ীর ড্রাইভার রিঙ্কু শর্মাকে বলেছিলাম, আপেল বাগানে দাঁড়াতে।সে বলেছিল, কত দেখবে? চল, দেখাবো। গুলমার্গ থেকে ফেরার পথে একটা ছোট একটা বাগানে ঢুকে, হা হয়ে গেছিলাম। আপেল ওখানে কিনেছি দেখে রিঙ্কু বলেছিল, এত আগেই না কিনে পহেলগাম এর রাস্তায় কিনতে পারতে। ঠিকই বলেছিল। কাটরা থেকে শ্রীনগর আসার সময়ই দেখেছি, অনন্তনাগ এর রাস্তা ডানদিকে চলে গেছে। এই রাস্তায় যেতে হবে পাহেলগাম। শ্রীনগর এর দিকে কিছুটা এগোনোর পর , দুই রকমের জিনিস চোখে পড়বেই। কয়েক মাইল ধরে হাইওয়ের পাশে পাশে চলল, ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর কারখানা। প্রায় সব বাড়ীতেই। ছাদে সাজানো হয়েছে কাঠের টুকরো। নিচে, রাস্তার দিকে ব্যাটের দোকান। তার কয়েক মাইল পর শুরু হয়েছে কেশর এর দোকান। মনে হচ্ছিল, শক্তিগড় এর ল্যাংচার দোকান এর মত। কিন্তু পরে গুণতে গিয়ে দেখি কয়েক হাজার হতে পারে। মনে হবে, অভিধানে যত শব্দ আছে, সব দিয়ে দোকানের নাম আছে। রিঙ্কু বলেছিল, কিনতে চাইলে নামতে পার। আমাদের আগ্রহ ছিল না। ফাঁকা মাঠ দেখিয়ে রিঙ্কু বলেছিল, এইগুলিতে কেশর চাষ করা হয়। এবার পাহেলগামের দিকে যাওয়ার সময় ব্যাট তৈরীর কারখানা দেখার জন্য থামতে চাইলেও, ড্রাইভার থামল না। অনন্তনাগ জেলা শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আবার দু দিকে ফাঁকা মাঠ। একটি আপেল বাগানের সামনে গাড়ী থেকে নামলাম। বাগানের মালিক বা মালিকের ছেলে রাজু এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল। বাগানে ঢুকে প্রথমে চোখে পড়ল, রাজুর মত আর একজন, কয়েকজনকে চেয়ারে বসিয়ে নানান জিনিস বিক্রী করতে ব্যস্ত। বোতলে ভরা আপেলের জ্যাম, ইত্যাদি বিক্রিতে ওদের বেশ আগ্রহ। আমি সোজা বাগানের মধ্যে ঢুকে ছবি তোলা শুরু করলাম। ভেতরের দিকে গাছে প্রচুর আপেল। রাজু নিজেই আপেলের রস বানিয়ে খাওয়াল। ছবি তুলে খুশী কি না জানতে চাইলে বললাম, গাছের থেকে আপেল পেড়ে খেতে চাই। সাথে সাথেই রাজী। আমাকে নিয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। একটা গাছের থেকে টুকটুকে লাল আপেল পেড়ে দিল। আগেই দেখেছি, রিঙ্কু একটা বড় আপেল খাচ্ছে। আমার স্ত্রী কন্যা কিছু জ্যাম জেলি ইত্যাদি কিনল। আরও ঘন্টা দেড়েক পর পৌঁছালাম পাহেলগম। বাজারের পাশেই আমাদের হোটেল। একটা নাগাদ হোটেল এ পৌঁছেছি। ওদের কাছে জানতে চাইলাম, তিনটা নাগাদ বেরিয়ে বৈসারণ যাব কি না। ওরা বলল , দুটোর আগে বেরিয়ে যাও। আমরা দুপুরে খেয়েই বেরোলাম। রিঙ্কুর গাড়ী এখানে দুদিন বসেই থাকবে; ও ওর বন্ধুর বাড়ী চলে গেল। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে দু পা হাঁটতে না হাঁটতে ঘোড়ার জন্য এক বয়স্ক শহিস আমাদের ধরে, মালিকের কাছে নিয়ে গেল। মাঠে কয়েকশ ঘোড়া আছে। আবার দরাদরি শুরু হল। তিনটি ঘোড়া নয় না দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে, পাঁচ হাজার টাকায় রফা হল। হোটেলের প্রায় পিছনের দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা। এবার তিনটি ঘোড়ার জন্য দুজন গাইড। একশ মিটার মত চলার পর শুরু হল বিভৎস পাথুরে রাস্তায় চড়াই। যেমন বাজে রাস্তা তেমনই খারাই। বড় বড় পাইন গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলল ঘোড়া। নিচের দিকে পাথরের মাঝে মাঝে কাদা। তারপর শুরু হল ধুলো। ঘোড়ার পায়খানার ধুলো। ফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হল। ঐ খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে চলতে দু জায়গায় থেমে, কম বয়সের ছেলেটি বলল, এটা একটা পয়েন্ট। বিশেষ কিছু নেই। উঠতে উঠতে এক সময় দেখি কয়েকশ ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ওটাই বৈশারণ এর গেট। পঁয়ত্রিশ টাকার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে দেখি, একটা বিশাল বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা। পাহাড়ের মাথায় এরকম একটা মাঠ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কয়েকশ যাত্রী, কিন্তু একটুও ভিড় মনে হয় না। যে যার মত ঘুরছে, ছবি তুলছে। চারদিকের পাহাড় এর মাথায় এই সময় বরফ নেই। থাকলে এর মিনি সুইজারল্যান্ড নাম সার্থক। এখানেই একটি ছেলে একটি পশমিনা ছাগল নিয়ে এসে ছবি তোলার জন্য দরবার করলে, আমরা দুটি ছবি তোলার জন্য ওকে কুড়ি টাকা দিলাম। অন্য জায়গায়, পরে আরও অনেক এরকম সাদা লোমশ ছাগল দেখেছি। এক ঘন্টা মত থেকে বেরিয়ে এলাম। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামার সময় কিন্তু ভয় পাইয়ে দিতে থাকে। ঘোড়াগুলি যে এই রাস্তায় চলতে পটু, বোঝাই যায়। ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। পরদিন লোকাল গাড়ী নিয়ে অন্য দিকে যেতে হবে। আজ সন্ধ্যা টিভি দেখেই কাটালাম। ২৪.১০.২৪. ফেরার পথে, রাজধানী এক্সপ্রেস তিন ঘন্টা দেরী করে চলছে, বসে বসে লিখছি।

কাশ্মীরে ৮
পাহেলগামে একরাত থাকলে পরের দিন সকালে তিন চার ঘন্টার জন্য গাড়ী নিয়ে, তিনটি জায়গা ঘুরে, দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসা যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সামনের রাস্তায় চায়ের দোকান বসেছে। হোটেলের ছেলে শুয়েই থাকল। আমি নিজেই চাবি নিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। চায়ের দোকানেই গাড়ীর লোকের সাথে দেখা হল। ছোট গাড়ী বাইশ 'শ টাকা বলল। আরও বলল, এখনই বেরোলে টোল এর টাকা লাগবে না। এত সকালে সবাই তৈরী হতে পারবে না, আধ ঘন্টা পর বেরোব জানালাম। সাড়ে আটটায় বেড়িয়ে চললাম আরু ভ্যালী। বারো কিমি রাস্তার পাশের প্রায় পুরোটাই পাশে পাশে লিদার নদী, উল্টো দিকের পাহাড়ে সুন্দর পাইন গাছের দৃশ্য। সব জায়গায়ই ছবি তোলার ইচ্ছা হবে। দু তিন জায়গায় নেমে ছবি তোলা হল। টোলের গুমটিতে অত সকালে লোক আসেনি। আরু ভ্যালীতে নেমেই বুঝলাম প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আমি তো এমনিতেই শীতকাতুরে, টুপী গ্লাভস নিয়েই বেরোই। আমার স্ত্রী, মাফলার হোটেলে রেখে চলে গেছিল; নেমে কাঁপতে থাকল। আরু ভ্যালী অনেকটা ছোট। বৈশরন এর দশ ভাগের এক ভাগও হবে না। পাহাড়গুলি মনে হয় হাতের কাছেই। একটি ভালো হোটেল আছে, মাঠের পাশে। একজন বয়স্ক মানুষ , কাশ্মীরি জোব্বা গায়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছিল; চা কফি খেতে। কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, আপনার দোকান কোথায়? বললেন, দোকান নয়, হোটেলেই পাবেন। ঢুকলাম, মূলত ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে। বিরাট ডাইনিং রুমে বসলাম। ওনার জোব্বার ভেতর থেকে কাঙ্গরি বের করে দিয়ে বললেন, হাত সেঁকে নাও। এই কাঙরির কথা আমি পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, সার্জারী বইতে পড়েছি। এই প্রথম দেখলাম। বেশ আরাম করে হাত গরম করে নিলাম। বেতের বোনা ফুলের সাজির মত। মাঝে মাটির পাত্রে কাঠ কয়লার আগুন। পরে দেখেছি, রাস্তায় ছোট দোকানে বিক্রী হচ্ছে। কফি খেয়ে বেরিয়ে দেখি একটি ছেলে , শাল, মাফলার ইত্যাদির দোকান বসাচ্ছে, মাঠে। ওর কাছে , স্ত্রীর জন্য একটি সস্তা মাফলার কেনা হল। এরপর চললাম, বেতাব ভ্যালি। গাড়ীতে উঠে ড্রাইভার ছেলেটির সাথে নতুন করে দাম দর কষাকষি করেছি। ওদের হিসেবে, সকালের চার ঘন্টার জন্য বাইশ' শ পঞ্চাশ টাকা। তিনটি জায়গায় এক ঘন্টা করে থাকা যাবে। তার বেশী হলে , ঘন্টায় সাড়ে চার শ টাকা করে। আর সাড়ে তিন হাজার টাকায় রফা হল, বিকেল পর্যন্ত থাকা যাবে। দু তিনটি অন্য জায়গায়ও নিয়ে যাবে। আরু থেকে আধ ঘন্টা মত লাগল বেতাব ভ্যালী যেতে। গাড়িতেই ড্রাইভার বলেছিল, ঘোড়ায় চড়ার জন্য চারশ টাকার বেশি রাজী হবেন না। নামার সাথে সাথেই ঘোড়ার দালাল জুটে গেল। তিনটি ঘোড়ার জন্য চার হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত নামাল। আমরা তো ঘোড়ায় আর চড়বই না। একশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। প্রথম দিকে প্রায় সাত - আট শ' মিটার এক রকম গাছের ছায়ায় ছায়ায় চললাম। পরে ঘোড়াওলা বলল, ওগুলি " বীলু" গাছ। ঐ গাছের কাঠে ক্রিকেট ব্যাট হয় বলতে বুঝলাম, ওগুলি উইলো গাছ। উইলো বাগান ছাড়িয়ে পৌঁছে গেলাম সুন্দর একটি সবুজ প্রান্তরে। চারিদিকে পাহাড়। আমরা সোনালী রোদে বসে সময় কাটালাম, ছবি তোলা হল। এখানেও একজন , সাদা লম্বা লোমের পশমিনা ছাগল নিয়ে হাজির। এ ছাড়াও খরগোশ, সাদা পায়রা নিয়েও কম বয়সের ছেলে মেয়ে এসে বলছে, ছবি তোলার জন্য দশ কুড়ি টাকা দাও। বোঝা যায়, এদের পড়াশোনার কথা কেউ ভাবেনি, কম বয়সের থেকেই কিছু রোজগার করা শুরু করে দিয়েছে। এই দিনের ড্রাইভার আমাদের সেরকমই কিছু খবর বলেছিল। গ্রামে ওর নিজের মেয়েরা এখন স্কুলে পড়ছে। কলেজ সেই জেলা শহর অনন্তনাগে। আমাদেরকে বসে থাকতে দেখে প্রথমে এক ঘোড়াওলা এসে বলল, তিনশ টাকা দিয়ে চলুন। এদের জন্য মায়া হচ্ছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী কন্যা আর ঘোড়ায় চড়তে রাজী নয়। আবার একজন এসে বলল, দুই 'শ টাকা দেবেন, চলুন। বুঝলাম, সকাল থেকে বেচারার কোন রোজগার করা হয়নি। ওর জন্য বড় মায়া হল ; চললাম ওর সাথে। ঘাসের উপর বোধহয় ঘোড়া চালানোর অনুমতি নেই। নদীর তীরে, বালুচরে গোটা পঞ্চাশ ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে নিয়ে একটা কালো ঘোড়ায় তুলল। ঘোড়া সোজা নদীর জলে নেমে চলল। স্বচ্ছ জলের নীচে নুড়ি পাথর। জল ছয় আট ইঞ্চি হবে। ঘোড়ার পায়ের থেকে একটু জল ছিটিয়ে আমার পায়ে লাগছিল। জল পেরিয়ে নীচু ডাঙায় উঠে কালো ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল, একবার মনে হল, ফিরে যেতে চায়। কি ব্যাপার, জানতে চাইলে শহিষ বলল, ওর সঙ্গী আসেনি বলে ফিরে দেখছে। ওকে তাড়া দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। পনের মিনিট পর ফেরার সময়, ঘোড়াওয়ালার সাথে কথা বলতে বলতে আসছিলাম। ওর দুটি ঘোড়া। এই কালো আর একটা সাদা। বছর দশ বারো আগে বেশ দাম দিয়েই কিনেছে। আরু ভ্যালির লোকেরা বরফের সময়, নিচের দিকে নেমে আসে বলেছিল। এই ঘোড়াওয়ালা বলল, আমরা গ্রামেই বসে থাকি, জঙ্গলের থেকে কাঠ জোগাড় করে রাখি, তাতেই ঘর গরম করে নিতে হয়। গোটা মাঠ তো বরফে ঢাকা থাকে, ঘোড়া খায় কি? ও বলল, মকাই আর কি সব খেতে দিতে হয়। আমরা জল পেরনোর সময় দেখলাম, সাদা ঘোড়াটা আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ওর কাছে ফিরলে, যেন নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরল। নদীর দুটি ধারা পেরিয়ে, একটা পাথর ছড়ানো মাঠ মত; ওরা বলে, কোনি মার্গ। তারপর নদী বেশ বড় বড় পাথরের ভেতর দিয়ে ফুট পাঁচ সাত নিচে নেমে এসেছে। এটাকেই ওরা বলে, ওয়াটার ফলস। কিছুই দেখার নেই। কিন্তু আমাদের মত পর্যটকেরা না চাপলে

ওদের রোজগার শূন্য। আর বাইরের দালালের খপ্পরে পড়ে হাজার টাকা দিলে, আটশ টাকাই জলে। ঘোড়া আর তার মালিকের কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম গাড়ীর কাছে।
এরপরের গন্তব্য , চন্দনওয়ারী। এই চনদনোয়ারি থেকেই অমরনাথ যাত্রার জন্য পদযাত্রা শুরু হয়। এখন তো হুশ করে গাড়ী চলে গেল, প্রায় দশ বারো কিমি। যাত্রার সময় লাখ লাখ মানুষ হাজীর হয়, হাঁটাচলার জায়গাই থাকে না। চন্দনোয়ারি বেশ দোকান পাট নিয়ে জমজমাট জায়গা। গাড়ী , পার্কিং এর দিকে গেল, আমরা সোজা হাঁটতে শুরু করে কিছুটা বা দিকে এগোলাম। এখানে শত শত পর্যটক। সবাই একবার অমরনাথ যাত্রার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করে। আমরাও করলাম। ভক্ত মানুষ ঐ সিঁড়িতেই মাথা ঠেকিয়ে অমরনাথকে প্রণাম জানাচ্ছে। যে কষ্টকর যাত্রা এ জীবনে আর কখনো হয়ে উঠবে না, সেখানে যে লক্ষ কোটি ভক্তের পদধূলি পড়েছে: সেই ধুলাই তো ভক্তের মাথায় উঠতে পারে। মনে মনে বাবা অমরনাথ কে প্রনাম জানিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। এখানে ঝালমুড়িওয়ালার কাছে কুড়ি টাকার সাদা মুড়ি কিনেছি। আমাদের ড্রাইভার সেটা দেখেছে। তাই বলল, পাহেলগাঁ বাজারেই পাবে এ জিনিস। ফেরার সময়, পাহেলগাম সোজা না ফিরে উপরে একটা রাস্তা দিয়ে ঘুরে ফিরলাম। ঐ রাস্তায় প্রায় শ খানেক কটেজ আছে। বরফের সময় যেখানে স্কি করা হয়, সেটাও দেখলাম। হোটেলের সামনে , গাড়ী থেকে নামার সময় , ড্রাইভার মুড়ির দোকান দেখিয়ে দিল। এক প্যাকেট মুড়ি কিনে হোটেলে ফিরে এলাম। বিকেলে নদীর উপর ব্রীজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের নিচে একটু ঘুরে এলাম। সন্ধ্যায় টিভি খুলে দেখি, নবান্নে জুনিয়ার ডাক্তারদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর মিটিং দেখাচ্ছে। চার মাস আগে থেকেই ঠিক করে রাখা কাশ্মীর ভ্রমণ করতে চলে গেলেও মন পড়ে ছিল, ধর্মতলায়। প্রবল প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে, ছেলে মেয়েদের জেদি বক্তব্যগুলো শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কাশ্মীরে হয়তো আবারও আসব। কিন্তু সন্তানসম জুনিয়ার ডাক্তারদের এই মাথা উঁচু করে করা লড়াই, সারা জীবন মনে থাকবে। তোমাদের কুর্নিশ জানাই। ২৫.১০.২৪.

কাশ্মীর 9

বাইশে অক্টোবর সকাল সাড়ে আটটার আগে , গরম জলে স্নান করে, ফেরার রাস্তা ধরলাম। সকালে উঠে আগের দিনের মত আমি বাইরের চায়ের ঠেলায় চা খেয়ে এলাম। ওখানে আরও তিনজন চা, বাটার টোস্ট খাচ্ছিলেন। একজনকে আর একজন , মাইতিদা বলে ডাকায় বুঝে নিলাম, মেদিনীপুরের লোক। একটু গল্প হল। ওরাও আজই আমাদের মত কাটরা ফিরছেন। গোটা কাশ্মীরে রাস্তা ঘাটে, শিকারায়, ঘোড়ায় মনে হবে শুধুই বাঙালি। এই পূজার মরশুমে বোধহয় বাঙালি পর্যটক বেশী যায়। গাড়ীতে উঠে ড্রাইভার রিঙ্কুকে বলেছিলাম, আবার রাজুর বাগানে নেমে আপেল কিনব। যাওয়ার সময় এতোটা চোখে পড়েনি, ফেরার সময় দেখলাম, অন্তত পঞ্চাশটি ছোট বড় আপেল বাগান। কারো বাড়ীতে হয়ত একটি বা দুটি আপেলের গাছে, আপেল পেকে আছে। আমাদের এখানের গ্রামের বাড়িতে পেয়ারা গাছের মত। ফেরার পথে রাজুর বাগানে ঢুকলাম একটু সকাল সকাল। ওরা তখন সবে দোকান সাজাচ্ছে। রাজু ভাইয়া কোথায় জানতে চাইলে বলল, এক কিমি দূরে, বাড়ীতে গেছে। আরও দুটি ছেলেকে দেখে মনে হল , রাজুর নিজের দাদা। আর বয়স্ক জন দুই ওদের কাকা হবেন। সবাই আপেলের কাজেই ব্যস্ত। এবার দেখলাম, ঘাসের উপর স্তূপাকার আপেল রাখা হয়েছে। বলল, কাল বিকেলেই পাড়া হয়েছে। আমরা আগেই গুলমর্গের রাস্তায় এক পেটি আপেল কিনেছি। এখান থেকে কিছু খুচরো আপেল কিনে, ট্রলি ব্যাগ এ ভরে নেব ভেবেছিলাম। ওরা বলল, ওরকম ওজন করার ব্যবস্থা নেই। ছোট পেটিতে ছয় কেজি ধরবে, তাই নিয়ে যাও। বাড়ী ফিরে বুঝলাম, ওদের কথা না শুনলে, কাশ্মীর এর বাগানের আপেল সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত। ওরা আন্দাজে পেটি ভরে দিল, বাছাই করা আপেল দিয়ে। আমি এর মধ্যে আবারও বাগানে ঢুকে অনেক ছবি তুলে নিলাম। এমন আপেলের নন্দনকানন এ আর হয়তো কোনোদিন আসা হবে না। কাশ্মীরে বরফে মোড়া প্রকৃতি দেখতে এলে, সে সময় গাছে গাছে পাকা আপেল দেখা হবে না। এখানে এরা বলবার সময় দাম একটু বেশি বলছিল বটে, কিন্তু আমার মেয়ে QR এ পেমেন্ট দেওয়ার সময় , ওরা নিজেরাই দেড়শ টাকা কমিয়ে নিল। এর মধ্যে আর একটা বিরাট দল এসে গেল। ওরা বাঙালি নয়। পরে রাস্তায় এসে দেখেছি, চারটি ট্রাভেলার এ ওরা এসেছে। আমি শুধু আলতো করে বলেছিলাম, তোমাদের বাগানে কি “ গোল্ডেন ডেলিসিয়াস” আছে? এক ভাই বলল, চলো দেখাচ্ছি। অত খদ্দের ছেড়ে চলল বাগানের মধ্যে। আমিও ওর পিছন পিছন ছুটলাম, মোবাইলে ভিডিও অন করতে করতে। এর আগে টিভিতে মুসাম্বি পাড়তে দেখেছি, এখানে লোহার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আপেল পাড়তে দেখলাম। তিনটি সোনালী আপেল পেড়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। রিঙ্কু গাড়ীতে উঠে বসার পর, একটা বড় ক্যারী ব্যাগে ভরে গোটা দশেক আপেল ওকে দিয়ে গেল। ভালো ব্যবহার মানুষকে কেমন করে মুগ্ধ করে, সামান্য আপেল চাষী আবারও আমাকে দেখিয়ে দিল। প্রায় রাস্তার উল্টো দিকে একটি ছোট্ট খাওয়ার দোকানে দাঁড়াল আমাদের গাড়ী। পাগড়ীমাথা পাঞ্জাবীর দোকান। রিংকুর চেনা দোকান। আমরা মুড়ি আর সন্দেশ খেয়ে রওয়ানা দিয়েছি, তাই শুধু কফি খেলাম। আমার মেয়ে আর রিঙ্কু আলুর পরোটা খেল। কিন্তু এই সামান্য খবরটি বলার জন্য এই দোকানের গল্প বলছি না। এখানে গাড়ী থেকে নামতেই একটা দৃশ্য দেখে রিঙ্কু খুব মজা পেল। আমাদের কাছে আকর্ষণীয় তেমন কিছু না হলেও, ওদের কাছে প্রায় ভিডিও করে রাখার মত ব্যাপার। দোকানের বাইরে যে কটা চেয়ার টেবিল ছিল সব দখল করে, প্রায় কুড়ি জন মহিলা, ছেলে, বয়স্ক লোক প্রচুর মুড়ি খাচ্ছে। দু তিনজন জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েও মুড়ি খাচ্ছে। এই দেখে, রিঙ্কু হাসতে হাসতে আমাদেরকে কাছে এসে বলল, দাদা, এ লোক ইতনা সারা মুড়মুড়া খা রহা! একেবারে ভাত খাওয়ার মত করে চানাচুর মুড়ি খাওয়া দেখে ও দারুন উচ্ছ্বসিত। আমরা ঐ রকম মুড়ি খাওয়া দেখেই বুঝতে পারি ওরা মেদিনীপুরের লোক। ওদের কথা শুনে নিশ্চিত হলাম। ওদের কাছে দুটি বড় পলিথিনের বস্তায় মুড়ি দেখলাম। ওরা দুটি ট্রাভেলার গাড়ীতে ঘুরছে। বেরোনোর সময় দেখলাম, দোকানের পাশ দিয়ে একটা আপেল বাগানে ঢোকার গেট। গাছে আপেল চোখে পড়ল না। এবার আমরা সোজা কাটরা ফিরব। মাঝে অনন্তনাগে চৌমাথায় ট্রাফিক পুলিশ আমাদের গাড়ী থামিয়ে রিংকুর সাথে একটু তর্কাতর্কির পর , ফাইন করল। কি গণ্ডগোল কিছুই বুঝলাম না। পাহেলগাম থেকে পঞ্চাশ কিমি মত এসে সেই হাইওয়েতে পৌঁছলাম। এই রাস্তা দিয়ে আমরা ছয় দিন আগে উল্টো দিকে , শ্রীনগর গিয়েছিলাম। এবার চেনা রাস্তা। দুদিকে ছড়ানো ধানের ক্ষেত; সব ধান কাটা হয়ে গেছে। বানিহালের দশ কিমি মত আগে , নয় কিমি একটা টানেল; এটা পর্যন্ত সমতল, তারপরই পাহাড়ী রাস্তা। যাওয়ার সময় বানিহাল শহর পেরনোর আগে থেকে জ্যামে আটকা পড়ে ছিলাম; শহরটা পেরোতেই ঘন্টা দেড়েক লেগেছিল। এবার গাড়ী আস্তে আস্তে চললেও মিনিট পনের মত লাগল শহর পেরোতে। কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় পাহাড়ী রাস্তা চওড়া করার কাজ চলছে। খুব ধুলো ওড়ে। যাওয়ার সময় আমি ছয়টা টানেল শুনেছিলাম; ফেরার সময় আটটা পেলাম। কাটরা থেকে কুড়ি পঁচিশ কিমি আগে একটা জায়গায় থেমে, রিঙ্কু সব্জি কিনল। আমিও শশা কিনলাম। আমরা ফেরার সময় কাটরার ট্রেনে আর রাজধানীতেও শশা দিয়ে মুড়ি খেয়েছি; আর দিল্লী থেকে কেনা মিষ্টি। ফেরার সময় রাজধানীতে টিকিট কেনার সময়ই খাওয়ার বাদ দিয়ে কিনেছি। গাড়ী ছাড়ার পর ক্যাটারিং এর লোক ,কে কি খাবে জানতে এলে বলে দিলাম, আমরা শুধু দু বেলা চা খাব। তাই দিয়েছিল। রাজধানী

এক্সপ্রেস প্রায় তিন ঘন্টা লেটে ফিরছিল, তাই আসানসোলের পর সকলকে খিচুড়ি খেতে দিচ্ছিল। আমাকেও প্রায় জোর করে খাওয়াল। লঙ্কার গুঁড়ো ছিল না এদের খিচুড়িতে। রিঙ্কু আমাদেরকে পৌনে চারটা নাগাদ কাটরা স্টেশনে নামিয়ে দিল। আমরা প্রায় তিনঘন্টা আপার ক্লাসের ওয়েটিং রুমে বসে কাটালাম। কাটরা দিল্লী ট্রেন সঠিক সময়ের পনের মিনিট আগে দিল্লী ঢুকে গেল। আমাদের রিটায়ারইং রুম আগের রাত আটটা থেকে চব্বিশ ঘন্টার জন্য নেওয়া ছিল। দিল্লীতে প্রায় সাত আট ঘন্টা বসে কাটাব ? মেয়ে দিল্লীর মেট্রো ভালো চেনে, আগে অনেকবার চেপেছে। ওকে বললাম, চল ঘন্টা তিনেক ঘুরে আসি। তিনটি মেট্রো স্টেশন গিয়ে, বাইরে দেড় কিমি মত হেঁটে ইন্ডিয়া গেটের কাছে গেলাম। ওদিকটা বেশ সুন্দর। বোধহয় কুড়ি পঁচিশটা স্কুলের মেয়েদের নিয়ে তাদের স্কুলের দু একজন করে দিদিমনি এই জায়গায় বেড়াতে এনেছে। এছাড়াও আমাদের মত কয়েকশ যাত্রী। বিকেল সাড়ে চারটার রাজধানী সময় মত ছেড়ে দিল। তখনই মনে হল , এবারের মত কাশ্মীর ভ্রমণ শেষ হল।

আমার এই লেখাগুলি পড়ে অনেকেই নানান রকম মন্তব্য করেছেন। অনেকেই আগে ঘুরে এসেছেন। কেউ কেউ বরফের সময় গিয়েছেন, তাই বাগানে আপেল দেখার সুযোগ হয়নি। আমাদের তেমনি কোথাও বরফ দেখা হয়নি। হ্যাঁ, আপেল তো দুটি বাগান থেকে দুই পেটি কিনেছি। রাজুর বাগানে তো আপেল খেয়ে, বাছাই করে পেটি ভরে নিয়েছি, তাই ওদের আপেল নিয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গুলমার্গের রাস্তায় যে বাগানে প্রথম ঢুকেছিলাম, তারা পেটি ভরে রেখেছিল। বাড়ী এসে খুলে দেখলাম, বত্রিশটার মধ্যে আটটি আপেল কিছু না কিছু গণ্ডগোলের ছিল। রাজুর দাদা আন্দাজে ছয় কেজি ওজন বলেছিল; বাড়ীতে ওজন করে দেখি, সাত কেজির বেশি।

অনেকে বেড়ানোর খরচ ইত্যাদি জানাতে বলেছেন। খাওয়ার খরচ নিজের নিজের মত। আর ওখানে কতটা কি কিনবেন,সেটাও এক এক জনের একেক রকম। তাই ওগুলি বাদ দিয়েই একটা হিসেব দিলাম। আমরা তিনজনে একটা রুমেই থেকেছি। চার সিটের সেডান গাড়ীতে তিনজন ঘুরেছি। ছয় রাত , সাত দিন।

Direct Srinagar Flight এখন বারো হাজার টাকা মত। আমার মতে বেষ্ট প্ল্যান হবে, দিল্লী পর্যন্ত রাজধানীতে গিয়ে, ওখান থেকে শ্রীনগর ফ্লাইট। শ্রীনগর ফ্লাইট দিল্লী থেকে পাঁচ হাজার টাকা বা তারও কম। একদিন বিকেলে রাজধানীতে চেপে পরদিন সকালে এগারোটা নাগাদ দিল্লী। মেট্রোতে চড়ে সোজা এয়ারপোর্ট। বিকেলের ফ্লাইট ধরে সন্ধ্যায় শ্রীনগর। শ্রীনগর to শ্রীনগর পাঁচ দিনের গাড়ী ভাড়া পনের হাজার এর কমে হবে। রাস্তায় পাক্কা দুদিন কমে যাবে। গাড়ীর জন্য অনলাইনে search করে, দু তিনটি কোম্পানির সাথে কথা বললেই ঠিক ভাড়া বোঝা যায়। আমাদের Balaji Tour and Travels সবথেকে কম ভাড়া নিয়েছে। ড্রাইভার রিঙ্কু শর্মাকে সরাসরি ফোন করে জানতে পারবেন। রিঙ্কু ভালো গাইড এর কাজও করেছে।

Kashmir Tour package

Train tickets . 16000.
Car for 7days. Rs. 17500.
Hotels.15800.
Horses. 9800.
Local Car. 3500. +3500.
Sikara. 800.

For Three persons. Excluding Foods. And local shopping, Apple purchase.

Total. 60000.

আমরা শ্রীনগরে ছিলাম চারদিন। লালচকের কাছে হোটেল চিনার ইন এ। এটা থ্রি স্টার হোটেল; বেশ ভালো। কিন্তু ডাল লেক থেকে দেড় কিমি দূরে। একই দামে , ডাল লেকের কাছে হোটেল আছে। তাছাড়া আমরা তিনজন একটি রুমে ছিলাম। দুজন হলে নিশ্চয়ই একটু কম হবে। লালচকের হোটেল ভাড়া প্রতিদিন 2700 টাকা। আমার মেয়ে গুগল রিভিউ দেখে দেখে হোটেল ঠিক করেছিল।

পাহেলগাম এ হোটেল প্যালেস্টাইন একেবারেই বাজারের মধ্যে। স্টার হোটেল নয়, কিন্তু ভালো। প্রতিদিন 2500 টাকা ভাড়া।
২৬.১০.২৪.

পাহাড়ে ভ্রমণ।
2024 সালের 31শে মার্চ আমার চাকরী জীবন শেষ হল। বছর খানেক আগে থেকেই এই বিশেষ দিনটির জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়েছি। 65 বছর বয়স পর্যন্ত চাকরী করে একটা নির্ভেজাল ছুটি পাওয়া যাবে, এটাই ছিল প্রধান ব্যাপার। চাকরী জীবনে একটানা সাতদিন ছুটি পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। তাই চাকরী জীবন শেষ হলেই একটা লম্বা ছুটিতে বেরিয়ে যাব, এই ছিল পরিকল্পনা। মাস দুই আগে ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি রাতের কোন গাড়ীতে জায়গা নেই। অগত্যা সকালের কাঞ্চনজঙ্ঘা গাড়িতেই যাব ঠিক করলাম।
23এ এপ্রিল সকালে বের হলাম বাড়ী থেকে। শিয়ালদা স্টেশন থেকে গাড়ী ধরে সন্ধ্যায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছলাম। ওখানেই রেলের রিটায়ারিং রুম বুক করা ছিল, সন্ধ্যা আটটা থেকে পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত। ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত ওয়েটিং হল এ বসে থাকতে হল। NJP স্টেশনে আগেও থেকেছি। বেশ বড় ঘর, মোটামুটি পরিষ্কার। পরদিন বেশ ভোরেই উঠে স্নান করে তৈরী হয়ে নিলাম। সাড়ে সাতটায় গাড়ী আসার কথা ছিল, ঠিক সময়ে এসে গেল গাড়ী। ঐ 24 এপ্রিল সকাল থেকেই শুরু হল আমাদের আসল ভ্রমণ। শহর ছাড়িয়ে সেবকের কাছে পৌঁছতে আধ ঘন্টা মত লাগল। তারপরই জঙ্গল আর পাহাড় শুরু হল।
তিস্তা নদীর ধার দিয়ে পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ি চলল। কালিঝোরায় তিস্তার ওপর বাঁধ পেরিয়ে অন্য পারে গেলাম। তারপরই শুরু হল শুধুই উপরে উঠতে থাকা। মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নিচে তিস্তা নদী দেখা যায়। বেশ কয়েক মাইল ওঠার পর, এক জায়গা থেকে নিচে সেবকের করোনেশন সেতু দেখা গেল। ড্রাইভার জানাল, পর আরও ভালো দেখা যাবে। তাই এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুটা উপরে ওঠার পর, পানবু নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম। ড্রাইভার জানাল ওটা একটা ভিউ পয়েন্ট। নেমে , রাস্তা থেকে একটু এগিয়ে নিচে দেখলাম দূরে তিস্তা নদী দেখা যাচ্ছে। একটু কুয়াশা থাকায় করোনেশন সেতু বোঝা গেল না। ওখানে কয়েকটা ছোট ছোট চায়ের দোকান মত আছে। একটাতে বসে মোমো খাওয়া হল। উল্টো দিকে পাহাড়ের ঢালে কয়েকটা কটেজ দেখা যায়, আমরা আর ওদিকে গেলাম না। প্রায় তিন ঘন্টা চলার পর লোলেগাও পৌঁছলাম। রাস্তার পাশে একটি ছোট বুদ্ধ মন্দির দেখিয়ে ড্রাইভার বলল, এটা দেখে নিতে পারেন। ওখান থেকে আমাদের হোম স্টে কাছেই জেনে, পরে আসা যাবে ভেবে আর নামলাম না। এবার গাড়ী পাহাড়ের উল্টো দিকে নামতে শুরু করল। বেশ ঘন পাইন এর বনের ভেতর দিয়ে মাইল তিনেক নেমে পৌঁছে গেলাম কাফের হোমস্টে।
এই প্রবল গ্রীষ্মে ও ওদের বাগানে প্রচুর ফুল। প্রথমেই ভালো লাগে। সাধারণ ভাবে লোকে যে সময় পৌঁছয় আমরা তার অনেক আগেই পৌঁছে গেছি, তাই একটু বাইরে বসে থাকতে হল। যে কোন কারনেই হোক, আমাদের একটা চার বেডের ঘর দেওয়া হলো। পরে জেনেছি, ওটা ওদের সবথেকে ভালো ঘর। এবারই প্রথম কোন হোমস্টেতে থাকা। তাই সব কিছুই নতুন নতুন লাগছিল। আসলে আমরা বছর দুই ধরে ইউটিউবে বিভিন্ন লোকের দেখানো অনেক হোমস্টে দেখেই, এবার চারটি জায়গায় থাকার জন্য বেড়িয়েছিলাম। স্বাভাবিক ভাবেই এটাই আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। তিনদিন থাকার পর আমাদের অভিজ্ঞতা খারাপ না।
কাফের হোমস্টেতে আমাদের রুম থেকে সামনের দিকে তাকালে, দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু এবার প্রায় সবদিনই আকাশে কুয়াশা থাকায় কাফের থেকে সামনের দুই সারি সবুজ পাহাড় দেখেছি। আমাদের রুম ছিল তিনতলায়। আমাদের থেকে ঘন্টা দেড়েক পরে আর একটা দলে সাত আট জন গেষ্ট এলেন। ওদের কয়েকজন আমাদের নিচের রুমে উঠলেন। আমরা একটার পর খাওয়ার খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম, দুটোর আগে হবে না। এটা একটা সমস্যা। আমাদের একটার আগেই খাবার অভ্যেস। ওদের বলাতে এক কাপ করে লিকার চা পেলাম। তাই নিয়ে বাগানে রঙিন ছাতার নিচে বসে থাকলাম। আগেই বলেছি, ওদের বাগান খুব সুন্দর। ফুলের বাগান ছাড়াও একটু নিচেই ওদের সব্জী বাগানও আছে। এই হোম স্টের নিজের অনেকটাই সব্জী বাগান আছে। আলু পেঁয়াজ কপি মটরসুটি বাগানেই হচ্ছে। এছাড়া ওদের গোয়ালে দুধের গরু ও আছে। কিন্তু বাগান নষ্ট করে দেয় বলে মুরগী নেই। বাগানে বসলে, বা সামনের বারান্দায় বসলে পিছন দিকে বিরাট ঘণ পাইন গাছের জঙ্গল দেখা যায়। পিচের রাস্তা এদের হোমস্টে ছাড়িয়ে আরও দুই তিনশ মিটার নেমে গেছে, পঞ্চায়েত আপিস পর্যন্ত। কিন্তু গাড়ী সারাদিনে দশটাও চলে না। দূরে দূরে পাহাড়ের ঢালে গ্রামের বাড়ি দেখাযায়, কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দ আসেনা। ভোরের দিকে মোরগের ডাক, আর মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক আসে। এই হোমস্টের সাত আট টি কুকুর আছে। যারা কুকুর পছন্দ করেন, তাদের ভালো লাগবে। আমরা যখনই যেদিকে হাঁটতে বেড়িয়েছি, গোটা দুই তিন কুকুর আমাদের সাথে সাথে চলেছে। এদের ডাইনিং হলটিও বেশ বড় আর সাজানো। এক সাথে বারো চোদ্দ জন বসে খাওয়া যায়। খাওয়া প্রায় সব হোমস্টেতে একই রকম। দিনে ডাল তরকারী আলু ভাজা পাঁপড় ভাজা আর ডিমের ঝোল। রাত্রে চিকেন, রুটি বা ভাত যে যা খায়। সকালের চা দিতেও বেশ দেরী করে, সব জায়গায়। সকালের টিফিন লুচি, পরোটা বা রুটি চাইলে রুটি। বিকেলে চায়ের সাথে পাকোড়া। শুধু এই একই রকম খাওয়ারের জন্যই একটানা তিন দিনের

বেশী থাকা বিরক্তিকর হবে। আর আমাদের মত যারা আলু প্রায় খায় না, তাদের তো আরও মুশকিল। প্রথম দিন বিকেলে আমরা পাইন বনের ভেতরে হাঁটতে চললাম। সাথে চলল তিনটি কুকুর। বনের ভিতরে ট্রাক চলে যাওয়ার মত পাথর বাঁধানো রাস্তা আছে। আমরা প্রায় এক কিমি হেঁটে গেলাম, রাস্তা খুব একটা খাড়া নয়। একটিই ট্রাকে কাঠ কেটে ফিরল দেখেছি। সন্ধ্যার পর সব হোমস্টেতেই সময় কাটানো মুশকিল। এই সময় আইপিএল এর খেলা ছিল বলে মোবাইলে খেলা দেখে সময় কাটিয়েছি। এছাড়া ভোটের সময় বলে মাঝে মাঝে মোবাইলেই খবরও দেখেছি। সকাল বিকাল রাস্তা ধরে দেড় দু কিমি হাঁটা, তাছাড়া আর করার কিছুই নেই। 26 তারিখ ওখানে ভোট ছিল। আগের দিন সকালে মালিক সুনীল তামাং ভোটের ডিউটি করতে চলে গেল। ওর স্ত্রী আর অন্য কর্মচারীরা আমাদের দেখাশোনা করল। ভোটের দিন সকালে চা ফ্লাস্ক এ রেখে , ডাইনিং হলে বিস্কুটের কৌটোর সাথে রেখে সবাই ভোট দিতে চলে গেল। টিফিন পেতে দেরী হবে বুঝলাম। কিন্তু প্রায় অন্য দিনের মতই সময় টিফিন দিয়ে দিল। একটিই মেয়ে আমাদের খাওয়ার দিচ্ছিল। সে বলল, ভোরে উঠে ভোট দিতে গিয়েছিল। আমরা একদিন নিচের দিকে প্রায় এক কিমি হেঁটে কাফের গ্রামের শেষ পর্যন্ত গেলাম। আর একদিন উপরের দিকে হাঁটতে লাগলাম, বৌদ্ধ মন্দির পর্যন্ত যেতে পারি কি না দেখতে। কিন্তু মাইল দেড় দুই হেঁটে বুঝলাম, যেতে পারব না। ফিরে এলাম। 27 এপ্রিল সকালে টিফিন খেয়ে পরের হোম স্টে, সামথারে যাওয়ার জন্য দশটা নাগাদ গাড়ী ডাকা ছিল। গাড়ী ঠিক সময়ে চলে এল। কাফের হোম স্টে থেকে বিদায় নিলাম।
তৃতীয় পর্ব।
কাফের থেকে সামথার বেশী দূর নয়। গাড়ীতে দেড় ঘন্টাও লাগল না। কাফের থেকে মাইল তিনেক উঠে এসে বৌদ্ধ মন্দির পেলাম। ওটা লেলেগাও এর ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে। মন্দিরের পাশে একটি সুন্দর বাগান আছে। আমরা মন্দিরে না ঢুকে ঐ বাগানের দিকে গিয়ে কয়েকটা ছবি তুলে ফিরে এলাম। বড় রাস্তা ধরে কয়েক মাইল এগিয়ে আবার পাহাড়ী রাস্তায় ঢুকল গাড়ী। সমথার এর বাজার থেকে ডান দিকে সরু রাস্তায় ঢুকল গাড়ী। এক কিমি মত গিয়ে একটা সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখাগেল। তারপর থেকেই পাথুরে রাস্তা ধরে নেমে চলল গাড়ী। দু কিমি মত নেমে আমিহুদ হোমস্টেতে পৌঁছলাম। বেশ ঝকঝকে তিনতলা বাড়ী। পাশের বড় বাড়িটা থেকে একজন পাহাড়ী লোক বেরিয়ে এসে, আমাদের ব্যাগ দুটি তিন তলায় তুলল। তিন তলার কোনের ঘরটি আমাদের দিল। এখনকার ঘরটি কাফেরের ঘরের প্রায় অর্ধেক। কিন্তু বারান্দায় বেরিয়ে মন ভালো হয়ে গেল। এখানেও সামনে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ। কুয়াশার জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। হোমস্টের কর্মচারী ডোনাল্ড দেখিয়ে দিল, কোনদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর দূরের কোন পাহাড়ে কি কি বেড়ানোর আছে। এখানে নিচের দিকে তাকালে পর পর বাড়ী ঘর দেখা যায়। ডোনাল্ড দেখল, বাঁ দিকে একটি চার্চ এর প্রেয়ার হল। ওটা ছাড়িয়ে এগোলে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে বলল। এদের থাওয়ার জায়গা বেসমেন্টে। এদের এখানে আবার কাসার থালায় থাওয়া। ডোনাল্ড ছাড়া আর জন দুই কম বয়সী কর্মচারী আছে। বিকেলে চার্চের মাঠ পেরিয়ে ভিউ পয়েন্ট এ গেলাম। সত্যিই দেখার মত। কয়েক হাজার ফুট নিচে গ্রামের বাড়ি ঘর দেখা যাচ্ছে; যেন এরোপ্লেন থেকে দেখছি। এখানেও আমরা তিনদিন ছিলাম। কোনদিন নীচের দিকের রাস্তা ধরে হেঁটে মাইল খানেক নামলাম। কোনদিন উপরের দিকে উঠে চললাম। একদিন খুব সকালে উপরের দিকে হাঁটতে লাগলাম, স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত চলে গেলাম। অত সকালে হাসপাতালের কোন কর্মচারীকে দেখলাম না। একজন পাহাড়ী মহিলা বসে ছিলাম। উনি মাকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে এসেছেন বললেন। পরে ডোনাল্ড এর কাছে জেনেছি, দুজন ডাক্তার আছেন। হাসপাতালের পরিষেবায় ওরা খুশী। হোমস্টের একটু উপরে একটি ডনবস্কো স্কুল। সোমবার সকাল থেকে নিচের গ্রামের দিক থেকে ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুলের দিকে উঠে আসচে দেখলাম। উপরের দিক থেকেও অনেক বাচ্চা গাড়ী করে এল। আমরা বিকেলে স্কুলের মাঠে বাচ্চাদের খেলতে দেখলাম। রবিবার সকাল থেকেই নিচের গ্রামের থেকে লোকজন চার্চের দিকে আসছে দেখা গেল। অনেকে গাড়ী করেও এল। সারাদিন থেকে বিকেলের দিকে একে একে ফিরে গেলেন। চার্চের অনুষ্ঠানের জন্য, ডোনাল্ড আমাদের জন্যওমাটন পেয়ে গেল। একটা জিনিস লক্ষ করে খারাপ লাগছিল, এত ভালো একটা হোম স্টে অথচ গেষ্ট নেই। আমরা তিনদিন ছিলাম, তার মধ্যে একদিন রাত্রে নিচের একটি রুমে গেষ্ট এসেছিল। ডোনাল্ড একটা গাড়ি ঠিক করে দিলে আমরা একদিন ঘন্টা তিন চার ঘুরে এলাম। প্রথমে গেলাম লামাদারা। একটি পাহাড়ের মাথায় কয়েকটি কটেজ। আশপাশের দৃশ্য মনোরম। ওখান থেকে গেলাম চারখোল। পাহাড়ের মাথায় অনেকটা জায়গা জুড়ে বেশ কয়েকটি কটেজ আর হোটেল। কটেজের বাগান দেখে বোঝা যায় একসময় বেশ সাজানো ছিল। ড্রাইভার জানাল বছর ছয়েক আগে মালিক মারা যাওয়ার পর আর দেখার কেউ নেই। মালিকের একমাত্র কন্যা বিদেশে থাকেন, এদিকে আসেন না। সম্ভবত পুরোনো কর্মচারীরা গেষ্ট এলে কটেজ খুলে দেয়। একসময়ের প্রাণ চঞ্চল একটি জায়গা কেমন নির্জীব পড়ে আছে। মনটা ভারী হয়ে গেল। নামার সময় ড্রাইভার দেখাম, উল্টো দিকের পাহাড়ে আমাদের হোমস্টে আর ডনবস্কো স্কুল দেখা যাচ্ছে। ঐ গাড়িকেই বলে দিলাম, পরদিন সকাল দশটায় চলে আসতে, আমরা এখান থেকে যাব দার্জিলিং এর দিকে ঋষিহাটের হোমস্টেতে। অমিহুদ এর এই ডোনাল্ড

লোকটি খুব ভদ্র। প্রথমদিন বলেছিলাম , আলু খাই না। ও আমাদের আর আলু দিল না। মাছ আছে কি না জানতে চেয়েছিলাম,; আমাদের প্রায় চার পাঁচ বার মাছ দিয়েছিল। তিনদিন সামথারে থেকে রওনা দিলাম ঋষিহাটের দিকে। পথে আমাদের জন্য একটা চমক অপেক্ষা করছে, জানতাম না।

চতুর্থ পর্ব।

সুন্দর নামের আমাদের ড্রাইভার। আমরা দুজন মাত্র যাত্রি, কিন্তু গাড়ি আট জন বসার মত, টাটা সুমো। সামথার বাজার থেকে ডান দিকে, সাতাশ মাইল এর রাস্তা ধরল। গাড়ির ভাড়া থেকেই বোঝা গেল আজ বেশ দূরে যাচ্ছি। পাহাড়ের ঢালে ঢালে গাড়ী নেমেই চলল। সাতাশ মাইল একেবারে তিস্তা নদীর পাড়ে। এখানে তিস্তা নদী পেরিয়ে আবার পাহাড়ী রাস্তায় উপরে ওঠা। এসব রাস্তায় কোনদিন আসিনি। ড্রাইভার কাকে যেন ফোনে বলল, মংপো হয়ে যাচ্ছে। আমি আমার স্ত্রী কে বললাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত জায়গাটা মংপু। তাই কোনরকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। হঠাৎ দেখি পাহাড়ী রাস্তার পাশে একটি উঁচু তোরণে লেখা, রবীন্দ্র ভবন। হৈ হৈ করে গাড়ী থামাতে বললাম। এমন একটি পুন্যতীর্থের পাশ দিয়ে চলে যাবে, নামবে না, এমন আহাম্মক বাঙালি পাওয়া যাবে না। ডান দিকের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম রবীন্দ্র ভবন এর দিকে। একজন মহিলা ডেকে টিকিট নিতে বললেন। পঁচিশ টাকা করে টিকিট। পুরনো বাড়ীটি এখন একটি সংগ্রহশালা , আমরা দু জনই শুধু যাত্রী। নিজেরাই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাগানে কয়েকটা ছবি তুলে ফিরে এলাম। আমাদের উচ্ছাসের কারণটা ড্রাইভার বুঝলই না। এই মঙপু কে ড্রাইভার মঙ্গপো বলছিল। এমন আর একটি জায়গা আছে, রংপো। গত অক্টোবরে পুর্ব সিকিম থেকে ফেরার সময় ধ্বসে রাস্তা আটকে ঋষিখোলা থেকে ফেরার সময়, রংপো ঘুরে ফিরেছিলাম। সে এক উৎকন্ঠার যাত্রা ছিল। মঙ্গপু থেকে জোড়বাংলো পর্যন্ত রাস্তাটা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। ঘন পাইন বনের ভেতর দিয়ে মাইল এর পর মাইল রাস্তা। মাঝ মাঝে মেঘ এসে রাস্তা ঢেকে দিচ্ছিল। জোড়বাংলায় এসে দার্জিলিং এর মূল রাস্তায় গাড়ি চলল। এটাই ঘুম। ঘুমে রাস্তায় একেবারে কলকাতার রাস্তার মত গাড়ীর ভিড়। কিছুটা এগিয়েই আমরা বাম দিকে ছোট রাস্তায় ঢুকে গেলাম। পরে জেনেছি, ওটাই মিরিক যাওয়ার রাস্তা। কয়েক কিমি এগিয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকল গাড়ী। এখন থেকে রাস্তা বেশ খারাপ। মাঝে মাঝে রাস্তা সারানোর কাজ চলছে। বেশ ঘন বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা। ফেরার সময় ড্রাইভার তার মোবাইলে ছবি দেখিয়েছে, সন্ধ্যার পর ঐ রাস্তায় চিতা বাঘ দেখা যায়। ঋষিহাট ঘুম থেকে অনেকটা নিচে। পিচের রাস্তা Rishihat ছাড়িয়ে চলে গেছে। একটা মোড়ের কাছের থেকে রাস্তা খাড়া উঠে গেছে, হোমস্টের নিচে পর্যন্ত। তারপরও প্রায় পঞ্চাশ গজ হেঁটে উঠতে হয়। ওদের ছেলেরাই লাগেজ তুলে নিয়ে যায়। এদের ও কয়েকটা কটেজ আর একটি তিনতলা বাড়ী। আমরা তিন তলার একটি ঘর পেলাম। এদের বাড়ী আর কটেজগুলি চা বাগানের মধ্যে, উপর নিচ সব দিকেই চা বাগান। এখানেও সামনে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ। একটু বাঁ দিকে তাঁর দেখা পাওয়ার কথা। দেখা যাক, দেখা যায় কি না।

আগের পর্বগুলো পড়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। কেই 25 বছর আগে ললেগাও ঘুরে এসেছেন। কেউ যেতে চান। আমার কাছে যেটা সবথেকে বড় খবর মনে হয়েছে তা হল, আবহাওয়া। কলকাতায় তখন 40-42 চলছে। আমরা ওখানে কম্বল গায়ে ঘুমিয়েছি। সন্ধ্যার পর সোয়েটার আর মাথায় টুপি। চারটি জায়গার মধ্যে ঋষিহাটেই সবথেকে বেশী ঠাণ্ডা পেয়েছি।

পঞ্চম পর্ব

ঋষিহাটে আমাদের দু দিন থাকার কথা। প্রথমদিন inবিকেলে ওদের চা বাগানের মধ্যে দিয়ে উপরের দিকে হাঁটতে লাগলাম। নিচে থেকে দেখে বোঝা যায় না, উপরে অনেক বাড়ী ঘর আছে। একটি প্রাইমারী স্কুল আর তার ছোট্ট মাঠ ও আছে। ঐ মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল। আরও উপরে উঠে একটি মোনাস্ত্রী পেলাম। বড় বাড়ী ঘর থাকলেও কোন মানুষ জন দেখলাম না। উল্টো দিকে বড় গেটের থেকে সোজা রাস্তা নেমে গেছে। ওদিকে কয়েকজন যুবক বসে ছিলেন। একজন এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। ওনারা সাত জনের দলে এসেছেন। কোন্নগরের ওদিককার স্কুলের শিক্ষক। ওনারা বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছে খাওয়ার প্রায় কিছুই পাননি বলে অনুযোগ করলেন। সন্ধ্যা হতেই সামনের, বিশেষ করে ডান দিকের পাহাড়গুলি আলোয় ঝলমল করে উঠল। ওদিকটা দার্জিলিং শহর। সন্ধ্যার পর বেশ ঠাণ্ডা, বারান্দায় বসা যাচ্ছিল না। এদের খাওয়ার জায়গা বেশ ছোট। রাতের খাওয়ার আমাদের ঘরেই দিয়ে গেল। পরদিন সকালে আমরা নিচের দিকে হাঁটতে বেরোলাম। হোম স্টের একটি সাদা কুকুর আমাদের সাথে চলল। দেড়শ মিটার মত নেমে যেখানে পিচ রাস্তায় পড়লাম, সেখানের একটি বাড়ী থেকে একটি লাল কুকুরকে ডেকে আনল সাদা কুকুরটি। দুজনে চলল আমাদের সাথে। আমরা প্রায় এক কিমি নেমে আবার উঠে এলাম। এদের এখানে চায়ের সাথে বিস্কুট দেয় না, বলবার পর এনে দিল। ঐ দিন ছিল মে মাসের এক তারিখ। এগারোটা নাগাদ আমার মোবাইলে ব্যাংক থেকে মেসেজ এল, আমার প্রথম পেনশন পেয়েছি। বেশ অবাক করার মত ব্যাপার। মে ডে তে ব্যাংক খোলা থাকবে আশা করিনি। আমার বাবা পঞ্চাশ বছর আগে স্কুলের শিক্ষক হিসাবে অবসর নিয়ে, পেনশনের জন্য নয় বছর দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। আমি একেবারে প্রথম মাসেই পেয়ে

গেলাম! দুই তারিখ আমাদের পরিবারের একটি বিশেষ দিন। এবার দিনটা ঋষিহাটে শুরু হল। ভোরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে মনে হল তাঁর দেখা পাওয়া যাচ্ছে। এবার সবদিনই, সব জায়গা থেকে ঘোলা আকাশ দেখেছি, তাই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। সকাল হতেই দেখলাম, ঠিক, কাঞ্চনজঙ্ঘা। সারা সময় ঐ দিকেই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। বারান্দায় বেরিয়ে কয়েকটা ছবি তোলা হল। আজও নিচের দিকে হাঁটতে বেরোলাম, সাথে সেই সাদা কুকুরটি। লাল কুকুরকে আজ আর ডাকতে হল না, নিজেই এসে আমাদের দলে যোগ দিল। আজ আরও প্রায় এক কিমি নিচে নামলাম। একটা মোড়ের মাথায় একটি লোহার বেঞ্চ তৈরী করা হয়েছে, এখান থেকে কাঞ্চন জঙ্ঘা সুন্দর দেখা যাচ্ছে। বসলাম। সাথে সাথে লাল কুকুর এসে পায়ে হেলান দিয়ে বসলো। এ যেন আমার কত দিনের বন্ধু। ওখান থেকে ফেরার রাস্তা ধরলাম। সেই হোমষ্টের মোড়ে এসে দেখি একটি ছোট্ট দোকান খুলেছে। ওদের কাছে একটি বিস্কুট এর প্যাকেট কিনে দুই কুকুরকে খাওয়ানো হল। এদের দোকানে চায়ের অর্ডার দিয়ে বসে ছিলাম; হোম স্টে থেকে কম বয়সী দুই স্বামী স্ত্রী নেমে এল। এরা মোনাষ্ট্রী কোন দিক দিয়ে ওঠা যায় জানতে চাইলে দু দিক দিয়েই ওঠা যায় জানালাম। আমরা চা খেতে খেতে দেখলাম ওরা পিচের রাস্তা ধরে উপরের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। আমরাও ওদিকে রওনা দিলাম। আমাদের সাথে চলল সাদা কুকুরটি। কয়েকশ গজ এগিয়ে যাওয়ার পর অন্য দুটি কুকুরকে দেখলাম, ওরা সাদা কুকুরকে তেড়ে গেল। একটু এগিয়ে দেখি দুটি বাচ্চা কুকুর রাস্তার পাশে খেলছে। একেবারে নেকড়ের বাচ্চার মত। অনেকটা উঠে, বাঁদিকে মোনাষ্ট্রীতে ওঠার রাস্তা পেলাম। সকালে এদিক থেকে মাইকে মন্ত্র পাঠের শব্দ শুনেছি। এখন আবার সব শুনশান। বড় গেটের পাশে ছোট গেট, তাই দিয়ে আমরা চারজন ঢুকলাম। বেশ বড় চত্বর কিন্তু একজনও লোক নেই। আমরা কয়েকটা ছবি তুলে পিছন দিকের রাস্তা দিয়ে নেমে এলাম। হোমষ্টের ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে বিল করতে বলে গেলাম। কটেজগুলির পাশে একটি ছোট্ট ঘরই অফিস। ওখানেই ওদের নিজেদের বাগানের চা পাতার প্যাকেট কিনলাম। চায়ের চাষই ওদের আসল কাজ, কয়েক বছর হল হোমস্টে করেছে। এখনকার মালিকের বাবা একজন প্রাক্তন সেনা কর্মী। অন্য সব কর্মচারীর সাথে সমানে কাজ করে যাচ্ছেন। দশটা নাগাদ আমরা ঋষি হাট থেকে টুকভার হোম স্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তখনও কাঞ্চনজঙ্ঘা সুন্দর দেখা যাচ্ছে।

দার্জিলিং পর্ব

এবারও আমাদের দু জনের জন্য বড় গাড়ী। সেই ঘুম থেকে কলকাতার রাস্তার মত গাড়ীর ভিড়। বাতাসিয়া পৌঁছে ড্রাইভারকে বললাম, এখানে দশ মিনিট দাঁড়ানো যায়? সে বলল, এখানে না দাঁড়িয়ে ম্যাল এ চলুন। ঘন্টা খানেক লাগল ম্যালের কাছে পৌঁছতে। মাঝে দুবার পাশ দিয়ে ঝকঝকে টয় ট্রেন যেতে দেখলাম। পরে জেনেছি, এখন আর শিলিগুড়ি পর্যন্ত চলেনা টয় ট্রেন। আমরা সাড়ে এগারোটার পর ম্যালে পৌঁছালাম। তখনও সেখানে অনেক যাত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এবার নতুন যা দেখলাম, ম্যাল রোডে সরকারী ভাবেই হকারদের বসানো হয়েছে। ঝকঝকে রোদ থাকলেও বেশ ঠাণ্ডা বাতাস ছিল। আমরা এক কাপ করে কফি খেয়ে গাড়ীতে ফিরে এলাম। দার্জিলিং ছাড়িয়ে গাড়ী চলল তুকভার এর দিকে। এবার গাড়ী পাহাড়ের ঢালে ক্রমশ নেমেই চলল। মাত্র আট কিমি রাস্তা। টুকভারের মিটমা হোম স্টে একেবারে রাস্তার পাশে। এই রাস্তা দিয়ে দিন রাত অবিরাম গাড়ী চলে। এটাকে ঠিক অফ বিট জায়গা বলা যায় না। এদেরও ঘর বেশ ভালো। খাওয়া দাওয়া খারাপ না। অনেকেই বলেছেন, বিকেলে এখান থেকে একটা গাড়ী নিয়ে দার্জিলিং ঘুরে যায়। আমরা বিকেলে পাহাড়ী রাস্তায় উপরে উঠলাম হেঁটে। আর সঙ্গীও একজন চারপেয়ে চলল আমাদের সাথে। এখানে রাস্তা বেশ খাড়া। উপরে উঠে সুন্দর চা বাগানের মধ্যে পৌঁছলাম। এরা বিকেলে চায়ের সাথে বিস্কুট দেয়, পাকোড়া নয়। এখানে একজন বয়স্ক সহ যাত্রী পেয়েছিলাম, তার সাথে গল্প করে অনেক সময় কাটল। পরদিন সকালে বেরোতে গিয়ে সমস্যা হল। এরা গেটে তালা দিয়ে রাখে। তালা খুলল সাতটা নাগাদ। চা খেয়ে হাঁটতে বেরোলাম, এবার নিচের দিকে। একশ মিটার মত নেমে বাঁ দিকে একটা ফুটবল মাঠ পেলাম। পাহাড়ের উপরে এত বড় মাঠ সহসা দেখা যায় না। মাঠে এক চক্কর দিয়ে ফিরে এলাম। দশটা নাগাদ শিলিগুড়ি ফেরার গাড়ীতে উঠলাম। আমাদের ট্রেন রাত্রে, তাই রাস্তায় কয়েকটা জায়গা ঘুরে নামব বলেছিলাম। হোমস্টে মালিকই বলে দিলেন, মিরিক ঘুরে নামতে। এবার আর দার্জিলিং এ নামলাম না। কিন্তু ঘুম পর্যন্ত আসতেই দেড় ঘন্টা লাগল। ঘুমের পরে মিরিকের রাস্তা ফাঁকা। ঘুম থেকে দশ বারো কিমি নেমে একটা বাজার মত এলাকা পেলাম। ড্রাইভার বলল, লেপচা জগৎ। ওখানে না নেমে এক কিমি মত এগিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দর জায়গায় পৌঁছলাম। একটু আগে থেকেই রাস্তার পাশে সব গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে। ডান দিকে রাস্তার পাশে সুন্দর পাইন গাছের জঙ্গল। এক একটা গাছ বোধহয় একশ ফুটের বেশি লম্বা। কুড়ি টাকা করে টিকিট কেটে পাইন বনের মধ্যে ঢুকলাম। সকলেই ছবি তুলতে ব্যস্ত। আমরাও ছবি তুলে নেমে এলাম। রাস্তার পাশের দোকানে কফি খেয়ে গাড়ীতে ফিরে এলাম। কিছুটা এগিয়েই গাড়ী বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে উপরে উঠতে থাকল। ড্রাইভার বলল, সকলে এদিকে নিয়ে যায় না, এটাও একটা ভালো দেখার জায়গা। এক কিমি মত পাইন এর বনের ভেতর দিয়ে উঠে একটা ফাঁকা চত্বরে পৌঁছলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে দুটি বড়

পুকুরের মত জল, সিমেন্টে বাঁধানো। বড় জলাশয়ে প্রচুর মাছ দেখলাম। এই জায়গার নাম জোড় পোখড়ি। এখানেই কয়েকটা কটেজ আছে দেখলাম। উল্টো দিকে দিয়ে নেমে বড় পিচ রাস্তায় পড়লাম। এবার আধ ঘন্টা মত চলে বেশ একটা মজার জায়গায় পৌঁছলাম। ড্রাইভার জানাল রাস্তার ডান দিকের বাড়ী সকল নেপালের। আর বাঁ দিকে ভারত। কয়েকশ মিটার এগিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলাম। ঐ জায়গার নাম সীমানা। অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে। আমরাও নামলাম। ড্রাইভার দেখল, দূরের বড় পাহাড়টার মাথায় সন্দাকফু। ফাঁকা চত্বরে অনেক দোকানপাট বসে গেছে, মেলার মত। বেশিরভাগই শীতের পোশাক। আমরা কিছু চকলেট কিনে ফিরে এলাম। গাড়ী পাহাড়ী রাস্তা ধরে কয়েক কিমি এগিয়ে আবার একটা বাজার এলাকায় পৌঁছল। ড্রাইভার বলল এখানে নামতে পারেন, নেপালে ঢুকতে হলে আ ই কার্ড লাগবে। দেখার কিছুই নেই জেনে আর নামলাম না। আরও আধ ঘন্টা মত চলে একটি সুন্দর চা বাগানের মধ্যে পৌঁছালাম। গোপালধারা চা বাগান। অনেক গাড়ী থেমেছে। ড্রাইভার বলল ফটো তোলার জন্য নামতে পারেন। বেশ বেলা হয়েছিল, তাই নামলাম না। আমাদের মিরিক পৌঁছে খাওয়ার কথা। আমাদের তিরিশ বছর আগে দেখা মিরিক চেনা গেল না। এত বেশী গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে যে গাড়ী রাখার জায়গা পাওয়াই মুসকিল। লেকের পাশে একটি হোটেলে মাছ ভাত খেলাম। ভালো না। এরপর ব্রীজ পেরিয়ে অন্য পারে গিয়ে, হেঁটে প্রায় গোটা লেকই ঘুরে নিলাম। ঐ দুপুর রোদেও কেউ কেউ নৌকায় ঘুরছে, কেউ ঘোড়ার পিঠে। এক ঘন্টা ওখানে কাটিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম। সেই তিরিশ বছর আগে মিরিক যাওয়ার রাস্তায় অনেক চায়ের বাগান দেখেছিলাম যেন। এবারও অনেক দেখলাম, কিন্তু আগের মত সেরকম সবুজ মনে হল না। এবার ক্রমশ নেমেই চলল গাড়ী। দুধিয়ায় একেবারে সমতলে পৌঁছলাম। আগেরবার যেন শিলিগুড়ি থেকে দুধিয়া অনেক কম সময়ে পৌছে ছিলাম। এবার রাস্তাটা অনেক চওড়া দেখলাম। বিকেলে শিলিগুড়ি শহরে ঢুকেও নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পৌঁছতে প্রায় এক ঘন্টা লাগল। আমাদের গাড়ী রাত আটটা চল্লিশে। সাড়ে ছটা থেকে স্টেশন এ বসে থাকতে হল। এবার যাওয়ার সময়, ট্রেনে মালদা স্টেশন এ আর ফেরার সময় এনজেপিতে ওন লাইনে খাওয়ার অর্ডার দিয়েছিলাম। IRCTC থেকে, ক্যাশ অন ডেলিভারী। খাওয়ার মোটামুটি। পদাতিক এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শিয়ালদা পৌঁছে গেলাম। এবারের ঘোর গ্রীষ্মের গরমের বেশিরভাগ সময় পাহাড়ে কাটিয়ে এলাম। এত লম্বা ছুটি চাকরীতে থাকলে পেতাম না।

নৈনিতাল
নৈনিতাল এর কথা ছোটবেলা থেকে শুনেছি। কিন্তু এতদিন যাওয়া হয়নি। এছাড়া রানীক্ষেত, আলমোড়া, এত নাম শোনা। চাকরী থেকে অবসরের পর, অন্তত দেশের মধ্যে যে সকল ভ্রমণস্থান এর নাম খুব শোনা যায়, সেগুলি ঘোরার ইচ্ছা আছে। মার্চের মাঝামাঝিই উত্তরাখন্ড রাজ্যের নৈনিতাল আর তার আশপাশের কয়েকটি জায়গা ঘোরার জন্য, ট্রেনের টিকিট কেটে রাখলাম। কলকাতায় জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশ গরম থাকে। ঐ সময় নৈনিতালের এদিকে বর্ষা নামে কি না জানা নেই। এখন যে কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আগে, ইউ টিউবে বেশ কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যায়। হাওড়া থেকে লালকুঁয়া এক্সপ্রেস সকাল আটটা পনেরোতে ছেড়ে পরদিন সকালে সাতটার আগে পৌঁছয়। এটা সপ্তাহে একদিন, শুধু শুক্রবারই হাওড়া থেকে ছাড়ে। আর একটা ট্রেন , হাওড়া কাঠগদাম বাঘ এক্সপ্রেস সবদিনই ছাড়ে, কিন্তু সময় বেশী লাগে। গুগুলের সাহায্যে ভ্রমণ স্থানগুলির অবস্থান আর দূরত্ব দেখে নিলাম। এ ব্যাপারে বিখ্যাত ইউটিউব চ্যানেল এর শিবাজী পালের পরামর্শ বেশ কাজের। লালকুয়া থেকে ভীমতাল 45 কিমি মত। এখান থেকে নৈনিতাল বাইশ কিমি মাত্র। আমি কিন্তু এখান থেকে সোজা নৈনিতাল যাবো না। আমরা এখান থেকে যাব রানীক্ষেত।
লালকুয়া এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া থেকে ছাড়ল। ট্রেন ছাড়ার প্রায় সাথে সাথেই আমাদের আশেপাশের সহযাত্রী সবার সাথে আলাপ হয়ে গেল। আমাদের সাথেই বসেছে তিনজন বন্ধু, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। জোয়ান তিন বন্ধু চলেছে ট্রেকিং করতে। হুগলীর সিঙ্গুর এর একটি বিরাট দল চলেছে আমাদের মত ভ্রমণে। আমাদের সাথে বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুজন চলেছেন, ঐ সিঙ্গুর এর দলের সাথে। ঐ দাদু বেশ আলাপি। বয়স বললেন পঁচাত্তর। তাঁর উপর সবে পেটের ক্যান্সার এর চিকিৎসা শেষ হয়েছে। দিদার পা ভাঙ্গার পর অপারেশন হয়েছে। এদের ভ্রমণের উৎসাহ দেখলে বেশ অনুপ্রাণিত হতে হয়। দাদু দিদা তো গোটা পাঁচেক করে ব্যাগ নিয়েছেন। ব্যাগে মুড়ি, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, ভাত তরকারী সব নিয়ে চলেছেন। দাদুর ওষুধের পোটলাটি প্রায় মুড়ির ব্যাগের সমান। আমরা সকালে বাড়ী থেকে ছাতু মুড়ি খেয়ে বেড়িয়েছি। কটা বাপুজী কেক আর একটা বিস্কুটের ছোট প্যাকেট নিয়েছি। আমি Zoop থেকে একটি লাঞ্চ প্যাক এর অর্ডার দিয়েছি। ওরা ধানবাদে ঠিক সময়ে পৌছে দিল। খাওয়া যায়। আমাদের বাড়ীর মত তেলঝাল ছাড়া রান্না বাইরে বেরিয়ে আশা করি না। রাতের জন্য ও একটি প্যাকেট অর্ডার দিয়েছি। বেনারসে একটা মজা হল। আমি Zoop এ টাকা দিয়ে রেখেছি। ওদের ছেলে এসে আমার নাম আর সিট নম্বর মিলিয়ে ব্যাগ থেকে প্যাকেট বের করার আগেই আর একটি ছেলে এসে আমার নাম জেনে একটি প্যাকেট দিয়ে টাকা চাইল। টাকা দেওয়া আছে জেনে একটু অবাক হল। আমি মোবাইল খোলার আগেই প্রথম ছেলেটি আমার নাম লেখা প্যাকেট বের করে দিল। এবার পরের ছেলেটি বলল, তাহলে অর্ডার ক্যান্সেল করলেন? বলেই তার প্যাকেট তুলে নিয়ে চলে গেল। এ খাদ্যও কষ্ট করে খেতে হল। ট্রেকিং এর ছেলে তিনজন বাড়ী থেকে রুটি তরকারী নিয়ে এসেছিল ; দু বেলা খেয়েও শেষ করতে পারল না। সকালে উঠে দেখি ট্রেন দেড় ঘন্টা লেটে চলছে। হোটেলের থেকে সকালেই ফোন করে জেনে নিয়েছে কটা নাগাদ আমরা পৌঁছব। গাড়ীর জন্য সেই মাস দুই আগেই অগ্রিম টাকা দিয়ে রেখেছি। লালকুয়া স্টেশনে নেমে ড্রাইভারকে বার তিনেক ফোনাফুনি করে অসংখ্য গাড়ী আর অটোর ভেতর থেকে আমাদের গাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল। সকাল সাড়ে আটটার সময় বাইরে যা গরম দেখলাম, কলকাতার থেকে বেশীই মনে হল। প্রায় মাইল দশ চলার পর পাহাড়ী রাস্তায় উপরে উঠতে থাকল গাড়ী। আরও প্রায় এক ঘন্টা চলার পর গাড়ীর এ সি বন্ধ করা গেল। আমরা এগারোটার আগেই ভীমতালের পারে আমাদের হোটেলে পৌঁছলাম। ঘরে ফ্যান চলছে। কিন্তু জল গরম করে স্নান করতে হল। আজ ১৫ ই জুন।
ভীমতালে দুপুরের আগে পৌঁছে রোদের জন্য কোথাও বেরোলাম না। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে জেনে নেওয়া গেল, এখানে দেখার কি আছে। আমাদের ড্রাইভারকে বললাম, বিকেলে সাততাল দেখতে যাব। সেই মত বিকেল চারটার পর বেরোলাম। কলকাতার মত গরম না হলেও বেশ রোদ ছিল। আধ ঘন্টা মত চলে পৌঁছলাম সাততাল। ভীম তালের পাশের পাহাড়গুলি একটু নেড়া নেড়া। এদিকে বেশ গাছপালা আছে। রাস্তায় একটা জায়গা থেকে অনেক নিচে একটি ছোট পুকুর মত দেখা গেল। নাম জানলাম, গরুড় তাল। সাততালের পাড়ে গাড়ী রাখার জায়গা পাওয়াই মুশকিল। যেখানে গাড়ী পার্ক করা হল সেখান থেকে বাঁধানো রাস্তা লেকের দিকে নেমে গেছে। রাস্তার দুই পাশে শুধুই দোকান। ফার্স্ট ফুডের দোকানের ভিড়ে রাস্তাই হারিয়ে গেছে। আমরা একটি দোকানে চা খেয়ে জলের দিকে নেমে গেলাম। শত শত নৌকা সাজানো আছে। নানান রকমের নৌকা। কম বয়সী ছেলে মেয়েরা সেই সব নৌকায় চড়ে লেকের জলে ঘুরছে। মাঝে একটি ছোট সেতু আছে। আমরা সেই সেতু পেরিয়ে অন্য পারে গেলাম। দু চারটি ছবি তুলে গাড়ীতে ফিরে এলাম। আবার সেই ছায়া ঘেরা রাস্তা দিয়ে ফিরলাম। এক জায়গায়, নিচে একটি পাড় বাঁধানো জলাশয় দেখিয়ে ড্রাইভার বলল, ওটা মানুষের তৈরী লেক। নাম নল -দময়ন্তী তাল। আমাকে গৌতমবাবু জানিয়েছেন, পাঁচশো বছর আগে, এক ভূমিকম্পে নৈনিতাল, ভীমতাল প্রভৃতি লেক গুলি তৈরী হয়েছে। সন্ধ্যায় হোটেলে বসে ক্রিকেট খেলা দেখে সময় কাটাব ভেবেছিলাম; খেলা তো হলই না। রাত্রে

আলো জ্বলে ওঠার পর লেকের পাশের পাহারগুলিতে আলো ঝলমল করে সুন্দর দৃশ্য তৈরী করল। রাত্রেও এখানে গায়ে চাদর গায়ে দিতে হল না। ভোরে উঠে আমাদের অভ্যাস মত হাঁটতে বেরিয়ে দেখি মেন গেটের তালা খোলা হয়নি। নীচে নেমে একজন কর্মচারীকে ডেকে তালা খোলা হোল। পাড়ার ভেতরের প্রায় সোজা রাস্তা ধরে একটু একটু করে উঠতে থাকলাম। আধ মাইল মত উঠে আবার ফিরে এলাম। একটি আম গাছের থেকে কয়েকটা কাঁচা আম রাস্তায় পড়ে আছে দেখলাম। একটি বাড়ির উঠানে একটি গাছে বড় কুলের মত অনেক ফল ধরে আছে দেখলাম। প্রথমে মনে হল আপেল। ভালো করে দেখে বোঝা গেল, ন্যাসপাতি। পরে রানীক্ষেত থেকে কৌশানি যাওয়ার রাস্তার পাশে অনেক এই রকম ন্যাসপাতি গাছ ফলে ভরে আছে দেখেছি। একশ মিটার মত নেমে ভীমতাল লেকের পার ধরে হেঁটে চললাম। এপারে পরপর অনেক হোটেল। দু জায়গায় বেশ কিছু বাচ্চা সাঁতার শিখচে দেখলাম। কয়েক জায়গায় শত শত মাছ ঝাঁক বেঁধে ঘুরছে; কেউ কেউ ওদের পাউরুটি ছুঁড়ে দিচ্ছে। অনেক সাদা রাজ হাঁস জলে সাঁতার কাটছে। আমরা লেকের একেবারে উল্টো দিকে পৌঁছতেই চায়ের দোকান থেকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। এটি দোকানে বসে চা আর বাটার টোস্ট দিয়ে টিফিন সারলাম।
পূজার পর পর ট্রেনে দিল্লির দিকে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। গতকাল দেখেছি, প্রথম দিনেই রাজধানীর সব টিকিট শেষ। আজ তাই ঠিক আটটায় মোবাইলে টিকিট কাটতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম। এদের WiFi ভালো। পাঁচ মিনিট আগে থেকেই IRCTC app এ লগইন করে বসে থাকলাম। ঠিক আটটায় খুলল। ৩৫৫ টি বার্থ দেখাল। আমাদের দুজনের নাম লিখে, অনলাইনে টাকা দিতে মিনিট দশেক লাগল। এর মধ্যেই ২০০ বার্থ বিক্রী হয়ে গেছে। মানে, ঘন্টা দুই তিন পর আর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।
ন টা নাগাদ বের হলাম রানীক্ষেত এর উদ্দেশে। মাঝে পড়বে এদিকের নিব কোরোরি বাবার কাইচি ধাম আশ্রম। গতকাল ওখানে মেলা ছিল, রাস্তা বন্ধ ছিল। আজও রাস্তায় প্রচুর গাড়ী। ধামের আট দশ মাইল আগে থেকেই গাড়ী আর এগোয় না। ধাম পেরোতে তিন ঘন্টা লাগল। একটু আগে থেকেই পাহাড়ের উপরের রাস্তা থেকে নিচে আশ্রমের মন্দির, ভিড় সব দেখতে পাচ্ছিলাম। ড্রাইভার একবার জানতে চাইল, আশ্রমে ঢুকতে চাই কি না। ঐ ভিড় দেখেই আমাদের সব আগ্রহ শেষ। বিকেল তিনটা নাগাদ রানীক্ষেত পৌঁছলাম।

রানীক্ষেত এ পৌঁছেছি কি না বোঝার আগেই রাস্তার পাশে দেখি, মেঘদূত হোটেল। গাড়ী থামাতে বললে ড্রাইভার বলল, আগে মন্দিরটা দেখে আসি। হোটেল ছাড়িয়ে দেড় দুই কিমি এগিয়ে পৌঁছলাম, ঝুলা দেবী মন্দির। ছোট একটি মন্দির। কিন্তু ঢোকার রাস্তার উপরে আর দুপাশে অসংখ্য ঘন্টা ঝুলছে। এখানে মানত করে কিংবা মনস্কামনা পূর্ণ হলে, লোকে একটি করে ঘন্টা ঝুলিয়ে রেখে যায়। ছোট বড় বিভিন্ন মাপের ঘন্টা, কত বছর ধরে ঝুলছে বোঝার উপায় নেই। মন্দিরে যাত্রী তেমন নেই। দুজন একজন করে যাত্রী আসচে। ওখান থেকে ফেরার সময়ও হোটেলে গাড়ী দাঁড়াল না। ড্রাইভার বলল, মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে, আগে দেখে আসি। রানীক্ষেত কুমায়ুন রেজিমেন্ট এর হেড অফিস। গোটা শহরটাই আসলে মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট। অত্যন্ত সুন্দর সাজানো রাস্তাঘাট। শুধু শহরটাই দেখার জন্য আসা যায়। মাথা পিছু পঁচাত্তর টাকা করে টিকিট কেটে মিউজিয়ামএ ঢুকলাম। সেই টিপু সুলতানের সময় থেকে হালের কার্গিল যুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাসের নানান ছবি, তরোয়াল, বন্দুক ইত্যাদি সাজানো আছে। আর আছে এই কুমায়ুন রেজিমেন্ট এর বহু বীরের ছবি আর তাদের বীরত্বের ইতিহাস। ভেতরে ছবি তোলার অনুমতি নেই। বাইরেও কয়েকটি কামান সাজানো আছে।
ওখান থেকে শহরের ভেতর দিয়ে গিয়ে , অন্য প্রান্তে একটি ছোট্ট পাহাড়ের নীচে পৌঁছে ড্রাইভার বলল, ওপরে মন্দির আছে দেখে আসুন। গাছের ছায়ায় ছায়ায় শ খানেক সিঁড়ি ভেঙ্গে একটি ছোট্ট মন্দিরে পৌঁছলাম। মন্দির এখানে দুটি, কালী আর দূর্গা। এখানে আসার আগেই আমরা আরও একটি জায়গায় মন্দির, গীর্জা আর গুরুদ্বারা দেখেছি। রেজিমেন্টের সেনাদের ট্রেনিং শেষ হলে, এই জায়গায় শপথ নিতে হয়। শহরের মধ্যেই একটি গল্ফ গ্রাউন্ড এর পাশ দিয়ে গেলাম। এটিও একটি দেখার মত জায়গা। কিন্তু অনেকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় ঘাসের রং ধূসর। মনে পড়ল , উটি যাওয়ার পথে কান্নুরে সুন্দর সবুজ গল্ফ গ্রাউন্ড দেখেছিলাম। পরে ঐ ক্যান্নোর এ সেনা প্রধান এর হেলিকপ্টার ভেঙ্গে পড়ে জায়গাটা কুখ্যাত হয়েছে।
আমরা হোটেলে ঢুকলাম সাড়ে তিনটা চারটার দিকে। এই মেঘদূত হোটেল এর বাড়ীটি একটি বহু পূরাতন বাড়ী, 1911 সালে তৈরী। বেশ বড় হোটেল, যাত্রীও অনেক এসেছে দেখলাম। হোটেলের নীচের রেস্টুরেন্টও বেশ বড়। ভোরে উঠে আমরা পিছনের দিকের সরু রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলাম। একটু দুরে একটি ময়ূর রাস্তা পেরিয়ে গেল দেখলাম। কাছে গিয়ে ছবি তোলার সময় দেখলাম, ওটা অন্য পাখী। পরে ছবি দেখে অনেকে জানিয়েছেন, ফিজেন্ট । বড় রাস্তায় ফিরে এসে দেখি দুটি বাসে করে 50-60 জন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীকে এনেছে। পরে ওরা রাস্তা ধরে দৌড় দিল।
আমরা ন টা নাগাদ হোটেল ছেড়ে কৌশানীর দিকে রওনা দিলাম। ঘন্টা খানেক গাড়ী চলার পর আমার স্ত্রী বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাঝের বড় সিট এ ওকে শুইয়ে বাকী রাস্তা এলাম। হোটেলে পৌছে ও সারাদিন শুয়েই থাকল। আমার কাছে কিছু

ওষুধ ছিল, কিছু পাশের একটা দোকান থেকে কিনে আনলাম। হোটেল থেকে একশ দেড়শ মিটার উপরেই গান্ধী আশ্রম। ড্রাইভারের সাথে আমি একাই হেঁটে উঠে দেখে এলাম। এই আশ্রমের নাম অনাসক্তি আশ্রম। এখানে থাকার সময় সুন্দর প্রকৃতি দেখে, গান্ধীজী একে মিনি সুইজারল্যান্ড বলেছিলেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে, আশ্রমের চত্বর থেকে হিমালয়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না। বিকেলে আমার স্ত্রী একটু সুস্থ হয়ে , হোটেলের চত্বরে হাঁটার সময় এক বাঙালি মহিলার সাথে আলাপ করে জানল, ওনারা একটি দল বদ্রিনাথ থেকে ফেরার পথে এখানে বিশ্রাম নিতে থাকছেন। আসার পথে দেখেছি, কৌশনী থেকে কর্নপ্রয়াগ প্রায় দু শো কিমি। আমার তো পাহাড়ী রাস্তায় 60-70 কিমি একদিনে যেতেই কষ্টকর মনে হয়। বিশেষ করে দুপুরে তো বেশ গরম পড়ছিল। পরদিন সকালে উঠে আমরা দুজনে গান্ধী আশ্রম ঘুরে এলাম। সকালে দেখি আমারও পেট খারাপ। এই নিয়ে আরও দিন চারেক বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। একটু ঝামেলায় পড়তে হল। দু লিটার ORS খেয়ে বিনসার এর উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। 18.6.24.
কৌসানির হোটেলে থেকে বেরিয়ে উল্টো দিকে দুই কিমি মত নেমে একটা চা বাগানের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে কিছু দোকানপাট আছে। বিশেষ করে শাল ফ্যাক্টরি। এই শাল ফ্যাক্টরি ব্যপারটা এখানে কুটির শিল্পের মত। এদিক ওদিক অনেক আছে। আমরা শাল কিনব না, তাই আর শাল তৈরীও দেখলাম না। একটু ওপরে উঠে চা ফ্যাক্টরি। ঢোকার জন্য টিকিট কাটতে হবে। চা বাগানের অবস্থাই করুন দেখলাম। আগে আমরা চা ফ্যাক্টরি দেখেছি, তাই আর ঢুকলাম না। কৌশণী থেকে রাস্তা নামতে নামতে একেবারে সমতলে চলে এল। এখানে একটা সরু নদী আছে, শুধুই পাথর, জল দেখা যায় না। ঐ নদীর দুই পাড়ে ধানের চাষ হচ্ছে। নদীর পাশ দিয়ে কয়েক কিমি এগিয়ে আবার আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে থাকল রাস্তা। একটা সময় ডান দিকের পাহাড়ের গায়ে বেশ বড় শহর দেখা গেল। আলমোড়া শহর। আমরা শহরের দিকে না গিয়ে বিনসারের দিকে চললাম। আলমোড়া থেকে আধ ঘন্টা মত এগিয়ে পৌঁছলাম চিতোই গোলু দেবতার মন্দিরে। YouTube এর কল্যাণে এই মন্দিরের খবর জানা ছিল। বড় রাস্তার পাশে, মন্দিরে ঢোকার গেটের পাশে বেশ কয়েকটি দোকান রাস্তার উপরে বসে গেছে। দূর থেকেই দেখা যায়, প্রচুর ঘন্টা সাজিয়ে রেখেছে। পূজার ডালি আর ঘন্টা বিক্রী করছে। এরাই জুতো জমা রাখছে। আমরাও একটা পূজার ডালি কিনে নিয়ে ঢুকলাম। কয়েকটি সিঁড়ি ওঠার পরই ঘন্টা আর ঘন্টা। যেদিকেই তাকানো যায় শুধু ঘন্টা ঝুলছে, হাজারে হাজারে। ছোট বড় নানান সাইজের ঘন্টা। ছোট বড় যে যেখানে হাত পাচ্ছে ঘন্টা বাজিয়ে দিচ্ছে। ডান দিকে একটি বাঁধানো চত্বরের পাশ দিয়ে পূজা দেওয়ার লাইন একেবেকে চলেছে। আমরাও লাইনে দাঁড়ালাম। এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে পূজা দেওয়া গেল। কিন্তু দেবতার মূর্তি কিছুই বুঝলাম না। নারকেলটি রেখে বাকী জিনিস ফেরৎ দিল। একটি প্রায় 100 কেজি ঘন্টার ছবি তুলে ফিরে এলাম। গাড়ী চলল বিনসারের দিকে। রাস্তার পাশে ঘর বাড়ী খুবই কম। ওপরে নীচে পাহাড়ের গায়ে গায়ে শুধুই চীর গাছ। সোজা সোজা দাঁড়িয়ে আছে, পাতা খুব কম। দেখলে মনে হবে, কেউ বোধহয় গাছগুলি লাগিয়েছে। যেদিকেই তাকানো যায় শুধুই ঐ একই রকম গাছ। পরে বিনসর অরণ্যেও দেখেছি ঐ একই দৃশ্য। অন্য গাছ হাজারে একটা হবে। মুন্সিয়ারি যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে কাঁচা রাস্তা ধরল গাড়ী। মাইল তিনেক খুবই অসমান পাথুরে রাস্তা। অন্য কোন গাড়িও দেখলাম না। মাইল দুই যাওয়ার পর গোটা দুই হোমস্টে। আরও এক মাইল গিয়ে আমাদের হোমস্টে পেলাম। ডান দিকে দূরে দূরে পাহাড়। গাছ শুধুই চীর। বাতাসে সো সো শব্দ। এদের ঘরে কোন ফ্যান নেই। বুঝলাম, তেমন গরম পড়ে না। পরদিন সকালে সামনের মাঠে হাঁটতে গিয়ে দেখলাম ঠাণ্ডা লাগছে। এবার পাহাড়ে ভ্রমণ করতে এসে এই প্রথম একটু ঠান্ডা পেলাম। সকাল আটটার পরই বেরিয়ে পড়লাম। আজকের গন্তব্য কাছেই, মাত্র 16 কিমি দূরের কাসার দেবী। এটা আলমড়া শহরের বাইরে। আমাদের সেই দূর্গম হোম স্টে থেকে বেরিয়ে প্রথম তিন কিমি মত পাথুরে রাস্তা। তারপর পাকা রাস্তা। পিছন দিকে এ রাস্তা চলে গেছে মুন্সিয়ারি। এবার আমরা ওদিকে যাব না। আলমোড়া থেকে প্রায় পৌনে দুশো কিমি। সেই দাদুদের সিঙ্গুর এর দলটি মুন্সিয়ারি যাবে। শীতকালে ওখান থেকে হিমালয়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তো কৌশানী থেকে কিছুই দেখতে পেলাম না। এই পাকা রাস্তা ধরে কয়েক কিমি এগিয়ে আমাদের গাড়ী ডান দিকে একটা ছোট রাস্তা ধরল। একটু এগিয়েই দেখি সেই পাথুরে রাস্তা। দুপাশের পাহাড়ে সেই চীর গাছ আর চীর গাছ। প্রায় এক ঘন্টা নির্জন বনের ভেতর দিয়ে চলে একটি মন্দিরের নীচে পৌঁছলাম। এই এক ঘন্টার রাস্তায় আর একটিও গাড়ী দেখিনি। মাঝে মাত্র তিনজন দেহাতি মহিলা ঘাসের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখেছি। এটাও বিন্সার জঙ্গল। একটি পাখিও নেই। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকও নেই। এই মন্দিরটিও গোলু দেবতার। যাত্রী প্রায় নেই। মন্দিরের পরই বড় রাস্তা। ডান দিকে চলে গেছে যাগেশ্বর। আমরা বাঁ দিকে আরও আধ ঘন্টা চলার পর কিছু কিছু বাড়ী ঘর দেখা গেল। রাস্তার পাশে আমাদের হোটেল দেখতে পেলেও আরও এগিয়ে গেলাম। একটা মোড়ের মাথায় গাড়ী দাঁড়াল। আমরা নেমে পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো সিঁড়ি ধরে মন্দিরের দিকে উঠলাম। শ খানেক সিঁড়ির উপর কাসার দেবীর মন্দির। ছোট্ট মন্দির। খুবই সাদামাটা। যাত্রীর লাইন নেই, তবে কিছু যাত্রী আছে। মন্দির ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে, আবার কুড়ি পঁচিশ সিঁড়ি উঠে শিব মন্দির। শিব মন্দিরে ওঠার আগে, বাঁ দিকে

একটি সরু পায়ে হাঁটার রাস্তা। লোকজন ওদিকে কেউ যাচ্ছে না। আমরা একজনকে জিজ্ঞেস করে এগিয়ে গেলাম। YouTube এ দেখা ছিল, তাই চিনলাম। একটি বড় পাথরের গাড়ী বারান্দার মত; এর নিচেই সেই বিখ্যাত গুহা। এক জ্যোতিষ দুজন খদ্দের পেয়ে ব্যস্ত আছে দেখলাম। ওখানে একটু বসার ইচ্ছা থাকলেও হতাশ হলাম। এবার চোখে পড়ল নীচে একটি সংকীর্ণ গুহা। সেখানে দুটি আসন পাতা রয়েছে। বুঝলাম ওটিই সেই মোক্ষম জায়গা যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করেছিলেন। আমি সাবধানে নেমে গেলাম সেই গুহায়। আসনে বালি থাকলেও একটিতে বসে গেলাম। মিনিট পাঁচেক বসে উঠে এলাম।
এই জায়গা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। এ জীবনে ওখানে পৌঁছতে পেরেছি সেটাই সৌভাগ্য। এই কাসার দেবী মন্দির এর পাহাড়ে নাকি বিশেষ মহাজাগতিক চুম্বক ক্ষেত্র আছে। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে এসে ধ্যান করেছিলেন। পরে উপরের শিব মন্দির চত্বরে দেখলাম, কয়েকজন চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। বিশেষ কোন অনুভূতি হল কিনা, কয়েকজন জানতে চেয়েছেন। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কুমোরের বাড়ীতে এক তাল মাটি নিয়ে ঢুকলেই কি একটু ঘট নিয়ে বেরিয়ে আসা যায়। মাটির তাল থেকে ঘট তৈরীর যে সাধনা সেটা অর্জন করতে কুমোর এর কত বছর লাগে!
কাসারদেবী মন্দির থেকে নেমে আসার পর আমাদের ড্রাইভার বলল, 200 মিটার এগিয়ে গিয়ে সারদা মঠ দেখে নিন। পাহাড়ের গা বেয়ে পাকা রাস্তা। নিচে, বহু নিচে মাঠ দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে কয়েকটা বাড়ী ঘর। একটু দূর থেকেই সারদা মঠের বড় লোহার গেট দেখা যায়। বন্ধ। পাশে ছোট্ট একটি গেট আছে। ভেতরে একটু পাহাড়ের ঢাল ধরে রাস্তা উঠেছে। প্রথমে নিবেদিতা ভবন। তার পিছনে ছোট মন্দির। মন্দিরের তিনটি দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ। কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখে ফিরে আসছি, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারিণী এসে একটি দরজা খুলে দিলেন। মন্দিরে ঠাকুর, মা আর স্বামীজী তিন জনের ছবি রাখা আছে। প্রণাম করে ফিরে এলাম। পাহাড়ের উল্টো দিকে আমাদের হোটেল। কাসার দেবী মন্দিরের প্রায় নিচেই। বিকেলে আবার হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের দিকে চললাম। এবার খেয়াল করলাম, হোটেলের অনেক কাছেই মন্দিরে ওঠার রাস্তা আছে। বেশ মেঘ করে এসেছে। কিন্তু অনেক লোক জনও উঠছে। আমরা এবার ও শিব মন্দির চত্বরে ঘুরে এলাম। বৃষ্টি আসতে পারে দেখে সকলে নেমে চললাম। পাহাড়ের প্রায় নিচে নামার পর টিপ টিপ বৃষ্টি নামল। পা চালিয়ে হোটেলে পৌছে চাবি নিতে নিতেই জোরে নামল বৃষ্টি। দুপুরে ছিল প্রচণ্ড গরম। রাত্রে কম্বল গায়ে ঘুমিয়েছি। সকালে উঠে প্রথমে হাঁটতে হাঁটতে সারদা মঠ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। মন্দিরের নিচের রাস্তা থেকে উল্টো দিকের পাহাড়ে আলমোড়া শহর দেখা যায়। বোঝা যায় না যে ওটা দশ কিমি দূরে। পরদিন সকালে যাওয়ার সময় আমাদের পঁচিশ কিমি ঘুরে যেতে হল। সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস থাকলে এসব জায়গায় মুশকিল। হোটেলের চা আটটার আগে হয় না। বাইরেও চায়ের দোকান খোলে না। আমরা হোটেলের নীচের রাস্তা ধরে উল্টো দিকে চলতে থাকলাম। ওদিকেও কয়েকটা হোটেলের বোর্ড দেখা যাচ্ছে। এক দেড়শ মিটার এগিয়ে দেখি একটি বৌদ্ধ আশ্রম। এরা মোনাষ্ট্রী লেখেনি। আমাদের গেটের বাইরে দেখে এক মহিলা এসে গেট খুলে দিলেন। দুটি বড় লোমওলা কুকুর ভেতরে ঘুরছে। ওরা কিন্তু ডাকাডাকিও করল না। মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। এক লামা এসে দরজা খুলে দিলেন। আমরা ভেতরে ঢুকে কয়েক মিনিট বসে বেরিয়ে এলাম। হোটেলে ফিরে স্নান করে আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমাদের গন্তব্য নৈনিতাল। আমরা আলমরা শহর ঘুরে যাব।
আমাদের ড্রাইভার লালা বদ্রিদাসজীর বাড়ী জানেনা। বাজারের ভেতর ঐ বাড়ী বলায় ও বলল, বাজারে গাড়ী যাবে না, হেঁটে যেতে হবে। আমরা তাতেই রাজী। শহরটা প্রায় এক পাক ঘুরে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে পৌঁছলাম। এর নাম রামকৃষ্ণ কুটির। রাস্তার পাশে তুরিয়ানন্দ গেট। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে স্বামী বিবেকানন্দ এর বড় মূর্তির কাছে পৌঁছতে হল। এখানে কোন মন্দির দেখলাম না। ওখান থেকে কিছুটা এগিয়ে, জেলা হাসপাতালের কাছে গাড়ী দাঁড়াল। ড্রাইভার বলল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাজার। গাড়ী আরও এক পাক ঘুরে নিচের রাস্তায় থাকবে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর কাছে গাড়ী পাব। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাজার পেলাম। বাজারের দোকানপাট সবে খুলছে। বেশ জমজমাট বাজার। সেই বাড়িটি আমি দেখলেই চিনব। তবুও একজনকে , স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ীতে ছিলেন, বলার আগেই আরও এগোতে বললেন। লালার সেই বিখ্যাত বাড়ীর বাইরে স্বামীজীর ছবি দেওয়া বোর্ড আছে। নিচে দু একটা দোকান আছে। কিন্তু বাড়ীটির দরজা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিচের এক দোকানে জানতে চাইলে বলল, ওনার সব ঘুরতে বেরিয়ে গেছেন। ভেতরটা দেখা হল না। রাস্তার উল্টো দিকে একটি লাল রঙের বাড়ীতে স্বামীজীর ছবি দেওয়া বোর্ড আছে। এই বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দু একটা ছবি তুলে ফিরে এলাম। আলমোরার বাজার থেকে একটা ছোট্ট শীতের পোশাক কিনে ফিরে এলাম। গাড়ী চলল নৈনিতালের দিকে। ভীমতাল থেকে যে পথে ওদিকে গেছলাম, সেই পথেই অনেক সময় ফিরে এলাম। আবারও পড়ল কাইচি ধাম। ভাবলাম মেলা চলে গেছে দিন চার পাঁচ আগে, তাহলে আর ভিড় হবে না। একবার বাবার ধাম ঘুরে যেতে পারি। কিন্তু ধামের কাছে এসে দেখি, সমান ভিড়। ওপর

থেকে দেখতে পেলাম বিশাল লম্বা লাইন। ভাওয়ালি শহরে পৌঁছে ডান দিকের রাস্তা ধরে গাড়ী চলল। এখান থেকে নৈনিতাল এগারো কিমি। যখন আর নয় কিমি বাকী, ভাবলাম প্রায় পৌঁছে গেলাম। এই সময় একটি দুই রাস্তার মোড়ে এসে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশ সব গাড়ী আটকে দিয়েছে। কোন গাড়ী নৈনিতাল যাবে না। কি ব্যাপার? কেন গাড়ী যাবে না, কেউ কিছুই বলতে পারল না। ফিরে এলাম ভাওয়ালী।

ভাঁওয়ালি ঢোকার মুখে একটি রাস্তার পাশের হোটেলে ঢুকলাম। এখানে দুপুরে কিছু খেয়ে পরে আবার নৈনিতালের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে দেখব। এদের সকলের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল আজ আর নৈনিতাল যাওয়া হবে না। একমাত্র নৈনিতাল এর হোটেলের ম্যানেজার ফোনে জানাল, দু এক ঘন্টা পর পর গাড়ী ছাড়ে। আমরা এক ঘন্টা পর ফিরে এসে দেখি, কোন গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই, পুলিশও নেই। নৈনিতাল শহরে ঢোকার প্রায় আধ কিমি আগে থেকে গাড়ী শম্বুক গতিতে চলল। লেকের পাড়ে পৌঁছে বোঝা গেল কেন শহরে গাড়ী ঢুকতে দিচ্ছিল না। অসংখ্য গাড়ী, তার থেকেও বেশি মানুষ রাস্তা দিয়ে চলেছে। লেকের যে পারে মল রোড সেদিকে নিচের রাস্তা একদিকে আর উপরের রাস্তা দিয়ে উল্টো দিকে গাড়ী চলছে। ড্রাইভার আমাদের বলে রেখেছিল, নীচের রাস্তায় তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হবে। কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে মল রোড পেরিয়ে আমাদের হোটেল। রাস্তা থেকে কুড়ি তিরিশ ফুট উপরে আমাদের হোটেল। ট্রলি ব্যাগ দুটি টেনে উঠতে হল। আমাদের ঘর দিয়েছে ছয় তলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। লিফ্ট ছাড়া এতোটা অনেকদিন ওঠা হয়নি। কিন্তু হাফাচ্ছি না দেখলাম। ঘরের ভেতর থেকেই লেকের জলে নৌকা চলছে দেখলাম। বিকেলে লেকের পাড়ে হাঁটতে বেরোলাম। এরকম ভিড়ের বেড়ানোর জায়গা কোনোদিন দেখিনি। ভিড় ঠেলতে ঠেলতে নয়না দেবীর মন্দির এ পৌঁছলাম। বাইরে থেকে পূজার ডালি কিনে নিয়ে মন্দির চত্বরে ঢুকলাম। যাত্রী অনেক আছে, কিন্তু পূজা দেওয়ার লাইন নেই। মন্দির ছাড়িয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে লেকের অন্য পারে চলে এলাম। এদিকে খুব একটা লোক জনও নেই। রাস্তাও খুব ভালো নয়। এ পারে কয়েকটা ছোট ছোট মন্দির আছে। এখানে সন্ধ্যা হয় অনেক পরে, প্রায় সাতটা নাগাদ। সব মন্দিরে ঘন্টা বাজিয়ে সন্ধ্যা আরতি শুরু হল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় পৌঁছে দেখি, রাস্তা প্রায় বন্ধ। ওপর থেকে ধ্বস নেমেছে। সারানোর কাজ চলছে। গোটা লেক একপাক ঘুরে হোটেলে ফিরতে রাত আটটা বেজে গেল। এদের ঘরের টিভিতে ক্রিকেট বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পেলাম।

পরদিন ভোরে উঠে আবার সেই নয়না দেবীর মন্দির এর দিকে হেঁটে চললাম। গতকাল বিকেলের মেলার মত ভিড়ের কিছুই নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। পাশেই একটি বিশাল মাঠ। মাঝে একটা হকি খেলার মাঠ। তাছাড়া আরও যা জায়গা আছে, দু টি ফুটবল খেলার মাঠ হয়ে যাবে। গোটা দুই ফুটবল মাঠের মত জায়গায় কয়েকশ গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য পাশের বাস্কেট বল খেলার মাঠে যোগ দিবস পালনের তোড়জোড় চলছে। আমরা পৌনে সাতটা নাগাদ নৌকার ঘাটের কাছে এসে দেখি , তখনও বোটিং শুরু হয়নি। সাতটা বাজতে আমাদের ডেকে নিল। আমাদের সাথে আর একটা নৌকায় তিনটি ছেলে উঠল। একজন মাঝি দু হাতে দাঁড় টেনে আমাদের আধ ঘন্টা ঘুরিয়ে আনল। মাঝির কাছেই কয়েকটা খবর জেনে নিলাম। লেকের জলে যে ঝাঁক ঝাঁক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সরকারই মাঝে মাঝে বড় মাছ ধরার ব্যবস্থা করে। মে জুন নৈনিতালের সবথেকে বেশী টুরিষ্ট আসার সময়। জুলাই থেকে পূজার ছুটি পর্যন্ত নৌকা প্রায় চলেই না। তখন ওরা গ্রামে গিয়ে চাষ আবাদ করে। সাড়ে নটায় আমাদের ড্রাইভার আমাদের ডেকে নিল। বেরোলাম নৈনিতালের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে। শহর থেকে বেরিয়ে মাইল তিন চার দূরে হনুমান মন্দিরে পৌঁছলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে হনুমান, মা অঞ্জনা, শিব মন্দির ছাড়াও নিব করোরি বাবার প্রার্থনা গৃহ দেখে নেমে এলাম। একটু ছোলা সেদ্ধ প্রসাদ দেওয়া হল। এরপর গেলাম, জল প্রপাত দেখতে। পঞ্চাশ টাকার টিকিট কেটে, শ দেড়েক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখলাম জলপ্রপাত। ফুট দশেক উপর থেকে জল পড়ছে। অনেকেই জুতো খুলে, জলে নেমে ছবি তোলার চেষ্টা করছে। সিকিম, মেঘালয়, পাঁচমারিতে এত সব লম্বা লম্বা জলপ্রপাত দেখেছি যে এটাকে তেমন দেখার মত মনে হল না। ওখান থেকে চললাম, বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই তিন চার কিমি যেতে ঘন্টা দেড়েক লাগল। গোটা রাস্তায় শুধুই ট্যুরিস্ট গাড়ী। পাহাড়ের ধাপে ধাপে নানান রকমের গাছ। গাছেদের নাম লেখা বোর্ড। আমাদের ভালো লাগল, পতঙ্গ সংগ্রহশালা। বিষধর প্রজাপতিও যে হয়, এই প্রথম জানলাম। এর পরের গন্তব্য ছিল কেভ গার্ডেন। গাড়ীর জ্যামের জন্য আর কোথাও নামার উৎসাহ পেলাম না। সোজা হোটেলে ফিরে এলাম। বিকেল চারটে নাগাদ প্রবল বৃষ্টি নামল। এক দেড় ঘন্টা চলল বৃষ্টি। ছটার পরও মেঘ করে থাকল। বেরোব কি না ভাবতে ভাবতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেকেই ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে। আমরা ঘন্টা খানেক রাস্তায় ঘুরে এলাম। বৃষ্টির পর রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেল। 22 তারিখ আমাদের নৈনিতালে শেষ সকাল। ভোরে উঠে বেরোনোর সময় সোয়েটার গায়ে দিতে হল। আজও সকালে রাস্তায় চা খেতে হল। আজ হাঁটতে হাঁটতে বড় বাজারের দিকে চলে গেলাম। নৈনিতালের জেলা হাসপাতালের কাছে এই বড় বাজার। দু একটি দোকান এই সকালেই খুলে গেছে।

আমরা বাজারের অন্য দিক দিয়ে নেমে এলাম নয়না দেবীর মন্দির এর কাছে। মন্দিরের পাশেই গুরুদ্বয়ার। আমরা জুতো খুলে ঢুকে যাচ্ছিলাম; ডেকে মাথা ঢাকতে বলল। একটি পাত্রে কিছু কাপড়ের টুকরো রাখা ছিল, তার একটি নিয়ে, মাথায় রুমালের মত বেঁধে নিলাম। ভেতরে ভক্তি সঙ্গীত বাজছিল। আমরা প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। একজন ডেকে প্রসাদ দিল। হোটেলে ফিরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, রান্নার ছেলেরা তখনও আসেনি। আবার বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে বাস ষ্ট্যান্ড এর কাছে এসে দেখলাম দু একটা দোকান খুলেছে। আমরা এক জায়গায় ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। একটি বড় ফলের দোকান থেকে কিছু ফল কিনে হোটেলে ফিরে এলাম। গাড়ীর মালিক দীনেশ জোশি জানালেন যে অন্য গাড়ী আসবে। এ কদিন যে ড্রাইভার আমাদের নিয়ে ঘুরেছে, সে আগের রাতে একটা ছোট এক্সিডেন্ট করেছে। নতুন ড্রাইভার অন্য গাড়ী নিয়ে আসবে। আমরা দশটার আগে স্নান করে, ব্যাগ গুছিয়ে বসে থাকলাম। ঠিক সাড়ে দশটায় গাড়ী এসে গেল। আমরা লালকুয়ার উদ্দেশে রওনা দিলাম। এবার বাড়ী ফেরার রাস্তা।
কদিন ধরে নৈনিতাল ঢোকা বেরোনোর রাস্তায় যা গাড়ীর জ্যামের অবস্থা দেখেছি, তাতে করে অনেক সময় নিয়ে বেরোনোই উচিত। আজ কিন্তু তেমন অবস্থা দেখলাম না। যদিও শহরের বাইরে একটা জায়গায় দেখলাম , গাড়ী আটকাচ্ছে। আধ ঘন্টা মত নেমে আসার পর গাড়ী মেঘের ভেতর দিয়ে চলল। আরও কিছুটা চলার পর বৃষ্টি নামল। একটা দোকানের কাছে গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার বলল, চা খেতে চাইলে নামতে পারেন। বৃষ্টির জন্য নামা গেল না। ড্রাইভার বলল আর মিনিট পনেরোর মধ্যে কাঠগোদাম পৌঁছে যাব। এই সময় থেকেই দেখলাম, রাস্তায় বেশ গাড়ীর ভিড়। কাঠগোডাম পৌঁছনোর অনেক আগেই বৃষ্টি থেমে গেল। কাঠগোদাম সমতলে। এখানে রাস্তাও বেশ চওড়া। দূর থেকে কাঠগোদাম রেল স্টেশন দেখলাম। আমাদের গাড়ী লালকুয়া স্টেশন থেকে। বড় রাস্তায় বেশ জোরে গাড়ী চালিয়ে, মিনিট কুড়ির মধ্যে আমাদের লালকুয়া পৌঁছে দিল। যাওয়ার দিন দেখেছিলাম , গাড়ী লোকজনের ভিড়। আজ আমরা আমাদের গাড়ী ছাড়ার সাত ঘন্টা মত আগেই এসেগেছি। স্টেশনে ঢোকার আগে বড় রাস্তায় একটা হোটেলে খেতে গেলাম। খুবই সাধারণ হোটেল। স্টেশনে ওয়েটিং রুমে এসে বসলাম। সে সময় আর চার পাঁচ জন যাত্রী শুয়ে বসে ছিল। বেশ গরম ছিল। এটা খুবই ছোট স্টেশন, এখানে এসি ওয়েটিং রুম নেই। পরে পরে , দলে দলে যাত্রী এসে পৌঁছতে থাকল। সবই পাহাড়ের দিকে ভ্রমণ করে ফিরছে। সবই প্রায় বাঙালি। আসলে এই ট্রেন টি সপ্তাহে একদিন করে চলে। হাওড়া থেকে শুক্রবার সকালে ছেড়ে শনিবার সকালে লালকুয়া পৌঁছয়। আবার শনিবার সন্ধ্যায় ছেড়ে রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ায় ফেরে। এদিকে যারা ঘুরতে আসে, তারা সেই মত ঘোরার প্ল্যান করে। গরমের মধ্যে ছয় সাত ঘন্টা বসে কাটানো বেশ কষ্টকর। আমাদের দিনেই ট্রেনটা আবার দেরী করে ছাড়ল। বিকেল পাঁচটা থেকে লাগাতার ঘোষণা করে গেল , ঠিক সময়ে সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশ এ ছাড়বে। সাতটা পঁচিশ পর্যন্ত গাড়ীর দেখা নেই। তখন বলতে শুরু করল , সাতটা চল্লিশে ছাড়বে। তখনও গাড়ী লুপ লাইনে দাঁড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত আটটা দশ নাগাদ গাড়ী দিল। প্রায় এক ঘন্টা দেরী করে গাড়ী ছাড়ল।
এবারের যাত্রায় ট্রেন খুব একটা ভালো পেলাম না। এই হাওড়া লালকূয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটা একটু অভাগা গাড়ী। দেরী করে ছাড়লেও সকালে বারাণসী পৌঁছে গেছে ঠিক সময়ে। কিন্তু বারাণসী স্টেশনে প্রায় এক ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখল। কত দেরী করে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে জানি না।
আমি বিশেষ করে শিবাজী পালের আর অনিন্দ্য বাবুর ইউটিউব চ্যানেল দেখে এবারের ট্যুর প্রোগ্রাম করেছি। অনিন্দ্যবাবু গাড়ীর জন্য দীনেশ জোশির ফোন নম্বর দিয়েছিলেন। আমি প্রায় তিনমাস আগে ট্রেনের টিকিট কেটেই দীনেশজীকে ফোন করে, আট দিনের জন্য গাড়ী বুক করেছিলাম। প্রতিদিন তিন হাজার টাকা করে। ড্রাইভার এর থাকা খাওয়ার দায়িত্ব ওদের। ভালো গাড়ী পেয়েছি। হোটেল সবই Make My Trip আর Go ibibo এর মাধ্যমে নেওয়া। আমার খরচের হিসাব অনুযায়ী ঠিকঠাকই হোটেল পেয়েছি। আমাদের খাওয়া দাওয়া খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই বাইরের তেল মশলা দেওয়া রান্না আমাদের জন্য একটি সমস্যা। এ ছাড়া বেড়ানোর কোন অসুবিধা হয়নি।

চতুর্থ পর্ব।
সুন্দর নামের আমাদের ড্রাইভার। আমরা দুজন মাত্র যাত্রি, কিন্তু গাড়ি আট জন বসার মত, টাটা সুমো। সামথার বাজার থেকে ডান দিকে, সাতাশ মাইল এর রাস্তা ধরল। গাড়ির ভাড়া থেকেই বোঝা গেল আজ বেশ দূরে যাচ্ছি। পাহাড়ের ঢালে ঢালে গাড়ী নেমেই চলল। সাতাশ মাইল একেবারে তিস্তা নদীর পাড়ে। এখানে তিস্তা নদী পেরিয়ে আবার পাহাড়ী রাস্তায় উপরে ওঠা। এসব রাস্তায় কোনদিন আসিনি। ড্রাইভার কাকে যেন ফোনে বলল, মংপো হয়ে যাচ্ছে। আমি আমার স্ত্রী কে বললাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত জায়গাটা মংপু। তাই কোনরকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। হঠাৎ দেখি পাহাড়ী রাস্তার পাশে একটি উঁচু তোরণে লেখা, রবীন্দ্র ভবন। হৈ হৈ করে গাড়ী থামাতে বললাম। এমন একটি পুন্যতীর্থের পাশ দিয়ে চলে যাবে, নামবে না, এমন আহাম্মক বাঙালি পাওয়া যাবে না। ডান দিকের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম রবীন্দ্র ভবন এর দিকে। একজন মহিলা ডেকে টিকিট নিতে বললেন। পঁচিশ টাকা করে টিকিট। পুরনো বাড়ীটি এখন একটি সংগ্রহশালা , আমরা দু জনই শুধু যাত্রী। নিজেরাই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাগানে কয়েকটা ছবি তুলে ফিরে এলাম। আমাদের উচ্ছাসের কারণটা ড্রাইভার বুঝলই না। এই মঙপু কে ড্রাইভার মঙ্গপো বলছিল। এমন আর একটি জায়গা আছে, রংপো। গত অক্টোবরে পুর্ব সিকিম থেকে ফেরার সময় ধ্বসে রাস্তা আটকে ঋষিখোলা থেকে ফেরার সময়, রংপো ঘুরে ফিরেছিলাম। সে এক উৎকন্ঠার যাত্রা ছিল। মঙ্গপু থেকে জোড়বাংলো পর্যন্ত রাস্তাটা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। ঘন পাইন বনের ভেতর দিয়ে মাইল এর পর মাইল রাস্তা। মাঝ মাঝে মেঘ এসে রাস্তা ঢেকে দিচ্ছিল। জোড়বাংলায় এসে দার্জিলিং এর মূল রাস্তায় গাড়ি চলল। এটাই ঘুম। ঘুমে রাস্তায় একেবারে কলকাতার রাস্তার মত গাড়ীর ভিড়। কিছুটা এগিয়েই আমরা বাম দিকে ছোট রাস্তায় ঢুকে গেলাম। পরে জেনেছি, ওটাই মিরিক যাওয়ার রাস্তা। কয়েক কিমি এগিয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকল গাড়ী। এখন থেকে রাস্তা বেশ খারাপ। মাঝে মাঝে রাস্তা সারানোর কাজ চলছে। বেশ ঘন বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা। ফেরার সময় ড্রাইভার তার মোবাইলে ছবি দেখিয়েছে, সন্ধ্যার পর ঐ রাস্তায় চিতা বাঘ দেখা যায়। ঋষিহাট ঘুম থেকে অনেকটা নিচে। পিচের রাস্তা Rishihat ছাড়িয়ে চলে গেছে। একটা মোড়ের কাছের থেকে রাস্তা খাড়া উঠে গেছে, হোমস্টের নিচে পর্যন্ত। তারপরও প্রায় পঞ্চাশ গজ হেঁটে উঠতে হয়। ওদের ছেলেরাই লাগেজ তুলে নিয়ে যায়। এদের ও কয়েকটা কটেজ আর একটি তিনতলা বাড়ী। আমরা তিন তলার একটি ঘর পেলাম। এদের বাড়ী আর কটেজগুলি চা বাগানের মধ্যে, উপর নিচ সব দিকেই চা বাগান। এখানেও সামনে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ। একটু বাঁ দিকে তাঁর দেখা পাওয়ার কথা। দেখা যাক, দেখা যায় কি না।
আগের পর্বগুলো পড়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। কেই 25 বছর আগে ললেগাও ঘুরে এসেছেন। কেউ যেতে চান। আমার কাছে যেটা সবথেকে বড় খবর মনে হয়েছে তা হল, আবহাওয়া। কলকাতায় তখন 40-42 চলছে। আমরা ওখানে কম্বল গায়ে ঘুমিয়েছি। সন্ধ্যার পর সোয়েটার আর মাথায় টুপি। চারটি জায়গার মধ্যে ঋষিহাটেই সবথেকে বেশী ঠাণ্ডা পেয়েছি।

রাঁচি ভ্রমণ

আগষ্টের প্রথমে , দুদিনের জন্য রাঁচি ঘুরে আসার জন্যে ট্রেনের টিকিট কেটে ছিলাম। তখন জানতাম না , সেপ্টেম্বর এর প্রথম সপ্তাহে এমন একটা মন খারাপ করে দেওয়া অবস্থার সৃষ্টি হবে। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই রাঁচি রওনা দিলাম। রাত নটা দশে হাওড়া থেকে ট্রেন। এই প্রথম মেট্রো ধরে দমদম থেকে হাওড়া এলাম। গঙ্গার নিচে দিয়ে মেট্রো যাচ্ছে বলে আলাদা কোন অনুভূতি হলনা। ট্রেনে বসার পর ছেলের ফোনে জানলাম, কলকাতায় এত সংখ্যায় মিছিল বেরিয়েছে যে, রাস্তা দিয়ে আসার চেষ্টা করলে হয়তো ট্রেন পেতাম না। এই রাতের হাওড়া হাতিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকাল ছয়টার আগেই রাঁচি পৌঁছয়।

রাঁচি স্টেশনের থেকে বেরিয়ে বাম দিকে একশ মিটার মত হেঁটে গেলে অনেক হোটেল। আমাদের আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হোটেলও ঐ একশ মিটার মত দূরেই ছিল। আমরা যদিও জানতাম হোটেলে হেঁটেই যাওয়া যাবে, কি মনে করে একটা টোটোতে উঠে পড়লাম। সে বোকাটা আমাদের নিয়ে মেন রোডে চলে গেল। এক কিমি দূরে গিয়ে আমার মনে হল, কিছু একটা ভুল হচ্ছে। হোটেলে ফোন করে আবার স্টেশনে ফিরে এলাম। হোটেলে পৌঁছে আর এক সমস্যা। ওরা বলল, অনলাইনে হোটেল বুক করে এলে, দুপুর বারোটায় চেক ইন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সকাল সাড়ে ছয়টায় হোটেলের ঘরে ঢুকলাম। গাড়ীও আগেই ঠিক করা ছিল। আমরা সাড়ে সাতটার আগেই স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ীর ড্রাইভারকে uuপ্রথমেই জানিয়ে দিলাম, আমরা জলপ্রপাত দেখতেই বেশী আগ্রহী, মন্দিরে পূজা দেব না।

রাঁচির জলপ্রপাতগুলি সবই শহর থেকে দূরে দূরে।

আমরা প্রথমেই গেলাম, হুন্ড্রু জলপ্রপাত দেখতে। এটা শহর থেকে দেড় ঘন্টার রাস্তা। ৪৫ কিমি দূরে। রাস্তা বেশ সুন্দর। তার থেকেও যেটা বেশী ভালো লাগলো, রাঁচি শহর আর গ্রামের সবুজ। যেদিকে তাকাই শুধুই সবুজ গাছপালা। মাঝে বেশ কিছু শালের জঙ্গল। হুন্ড্রু জলপ্রপাতের সিঁড়ির কাছে পৌঁছানোর কুড়ি পঁচিশ মিটার আগে, গাড়ী থেকে নেমে টিকিট কাটতে হল। গাড়ী পার্কিং এর জন্য কুড়ি টাকা, আর মাথাপিছু দশ টাকা করে টিকিট। গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দুই পাশে আট দশটি চালা হোটেল। প্রতিটি হোটেলের সামনে খাঁচায় রাখা দেশী মোরগ। দেখলে মনে হয়, মুর্গীর মাংসের দোকান। এই সব দোকানে , চা, জলখাবার, ঠাণ্ডা পানীয় পাওয়া যায়। দুপুরের খাবারের অর্ডার দিয়ে নিচে নামলে ফিরে এসে মুর্গীর মাংসের ঝোল আর ভাত পাওয়া যায়। এই হুন্ড্রু জলপ্রপাতে সাড়ে সাতশ মত সিঁড়ি নামতে হয়। সুন্দর পাথর বাঁধানো ছোট ছোট সিঁড়ি। নামতে কোন কষ্ট নেই। ওঠার সময় সবারই কষ্ট হবে। হাঁটুর ব্যথা থাকলে, বা বেশী বয়সে না নামাই ভাল। সিঁড়ি দিয়ে একটু নামলেই জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। একেবারে নিচে কয়েকটা দোকান আছে। এরা ঠাণ্ডা পানীয় বিক্রী করলেও চা রাখে না। জলপ্রপাতের জল যেখানে পড়ছে তার থেকে তিরিশ ফুট মত দূর থেকে দেখতে হয়। আমরা কিছু সময় থেকে , কিছু ছবি তুলে ফেরার রাস্তা ধরলাম। ওপরে উঠে একটা দোকানে চা খেয়ে গাড়ীতে ফিরে এলাম। আমাদের এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে ড্রাইভার ভাবল আমরা বোধহয় নিচে পর্যন্ত নামি নি। মাইল দুই ফেরার পর, ডান দিকের রাস্তা ধরে আরও এক কিমি মত চলে পৌঁছলাম সুবর্ণরেখা নদীর উপর গেটালসুদ ড্যামে। বাঁধের মাঝামাঝি গিয়ে , কয়েকটি ছবি তুলে গাড়ীতে ফিরলাম। এখান থেকে গাড়ী চলল বিয়াল্লিশ কিমি দূরে সীতা জলপ্রপাতের দিকে। সেই সুন্দর সবুজ প্রকৃতির ভেতর দিয়ে, এক ঘন্টা চলল গাড়ী। এখানেও গাড়ী রাখার জন্য আর আমাদের দুজনের জন্য টিকিট কেটে নিলাম। এখানে প্রায় কোন দোকান পাট দেখলাম না। এখানেও সবুজ গাছপালা ঘেরা বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হল। সেই রকম প্রচণ্ড জলের শব্দ। এখানে নতুন আর একটা জিনিস ছিল, পনের কুড়ি জন ছেলের হৈ হৈ চিৎকার। কিছুটা নেমে দেখতে পেলাম, পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে প্রবল জলের ঝর্না। অনেক উপরে, পাহাড়ের ধাপে অনেক ছেলে স্নান করছে আর হৈ হৈ করছে। আরও অনেক সিঁড়ি নেমে পুরো জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। জল নিচে যেখানে নদীর মত বয়ে যাচ্ছে, কয়েকজন সেখানেও নেমে গিয়েছে দেখলাম। ওখানে যেতে হলে আরও একশ সিঁড়ি নামতে হয়। আমরা ওখানে নামলাম না। এরপর চললাম জোনা ফলস্ দেখতে। এটা মাত্র ছয় কিমি দূরে। এখানে টিকিট কেনার জায়গায় একসাথে গোটা চারেক গাড়ী এসে পড়ল। টিকিট নিল মাত্র কুড়ি টাকা। গাড়ীর জন্য টাকা নিতে ভুলেগেল নাকি! এখানেও বেশ কয়েকটি দোকান আছে। একটি দোকানে দুপুরের খাবারের কথা বলে জলপ্রপাতের দিকে এগোলাম।

রাঁচি ২

জোনা জলপ্রপাতে নিচে নামতে ছয়শো সাড়ে ছয়শ সিঁড়ি নামতে হয়। সিঁড়িগুলি গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় হলেও, একেবারে নিচে নেমে দেখতে হলে বেশ রোদে পুড়ে দেখতে হয়। এখানেও অনেক উপর থেকে জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। গোটা দুই বাঁধানো চাথল থেকে একটু উপর থেকেই গোটা জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। নিচের চাথালে কয়েকজন ছবি তুলেছে দেখে আমরাও নামলাম। এখানে প্রপাতের জল এত কাছে যে জলের গুঁড়ো উড়ে এসে মোবাইল ভিজিয়ে দেয়। অনেকে আরও

পঞ্চাশ সিঁড়ি নেমে জল ছুঁয়ে আসচে। আমাদের জল ছোঁয়ার উৎসাহ ছিল না। আস্তে আস্তে উঠে এলাম। আগের দুটি জায়গার থেকে এখানে যাত্রি একটু বেশী দেখলাম। সেটা হয়তো আগের দু জায়গায় আমরা সকাল সকাল গেছলাম বলে। মিনিট দশেক বসার পর আমাদের খেতে দিল। গরম ভাত , শাল পাতার থালায়। চালা হোটেলে এর থেকে ভালো ব্যবস্থা আশা করলে হতাশ হতেই হবে। এরপর আমরা ফেরার রাস্তা ধরলাম।

রাঁচি শহর বেশ ছড়ানো। সকালে আমরা যেদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছলাম এবার তার উল্টো দিক দিয়ে চললাম। এদিকে অনেক ফাঁকা ফাঁকা ময়দানের মত জায়গার ভেতর দিয়ে চওড়া রাস্তা। যে কোন শহরে গেলে সেখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখা ছাড়াও শহরের রাস্তা, রাস্তার পাশের গাছপালা সবই আমি মন দিয়ে দেখি। রাঁচি শহর বেশ সবুজ। শহরের ভেতরে অনেক গাছ আছে। গাড়ি একটা টিলার উপরে উঠে দাঁড়াল। টিলার উপরে জগন্নাথ মন্দির। বাইরে জুতো খুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। ভেতরে ছবি তোলার কোন অনুমতি নেই। মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। দশ মিনিট পর খুলবে জানাল। অন্য দিকের সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নেমে দেখলাম, ওটাই মূল প্রবেশ দ্বার। বেশ কিছু গাছের নিচটা সুন্দর করে বাঁধানো। অনেক যাত্রী গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছিল, আমরাও বসলাম। কয়েক মিনিট পর যাত্রীরা উঠে চলল মন্দিরের দিকে। আমরাও চললাম। পনের কুড়ি জন যাত্রীর পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন হল। মন্দির থেকে বেরিয়ে গাড়ীর কাছে এসে, দূরে দেখলাম, নিচে রাঁচি শহর দেখা যাচ্ছে; ছবি তুললাম। চারটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় বেরিয়ে শহরের বড় রাস্তায় এক চক্কর ঘুরে এলাম। হোটেলের টিভিতে কলকাতার খবর দেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে সাড়ে ছয়টার মধ্যে হোটেল ছেড়ে বেরোলাম। ড্রাইভারকে বলেই রেখেছিলাম, তাড়াতাড়ি বেরোব। আগের দিনের মত একটি ছোট দক্ষিণ ভারতীয় খাওয়ার এর দোকানে বসে ইডলী আর ধোসা খেয়ে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে হল। সাড়ে সাতটায় গাড়ীতে উঠে চললাম , দশম জলপ্রপাত দেখতে। সকালে বিছানা থেকে নামার সময়ই বোঝা যাচ্ছিল, আগের দিন অনেক বেশি সিঁড়ি ওঠা নামা হয়েছে। পা এতো ব্যাথা করছিল যে মাটিতে পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। পরের তিন চার দিন ওরকম ব্যথা ছিল পায়ে।

দশম জলপ্রপাত রাঁচি শহর থেকে পঁয়ত্রিশ কিমি দূরে। অনেকটা রাস্তা কলকাতার দিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে এগিয়ে ছোট গ্রামের রাস্তা ধরতে হয়। এই গ্রামের রাস্তা প্রায় নির্জন। সবুজ প্রকৃতির ভেতর দিয়ে রাস্তা। এখানে কিন্তু জলপ্রপাত দেখতে কোন টিকিট কাটতে হল না। কয়েকটি দোকানপাট আছে। এখানেও নিচে পর্যন্ত নামতে শ’ চারেক সিঁড়ি। মাঝে মাঝে বেশ কয়েকটি চাথাল আছে। কয়েক জায়গায় বসার জন্য বেঞ্চ আছে। এখানেও আমরা একেবারে নিচে পর্যন্ত নামলাম না। পঞ্চাশ সিঁড়ি মত বাকি ছিল। আমরা থাকতে থাকতেই কয়েকটি ছেলে একেবারেই জলের কাছে নেমে গেল। আমরা বেশ কিছু ছবি তুলে গাড়ীতে ফিরে এলাম। এবার যাবো পাত্রাতু লেক। সেও ঘন্টা দেড়েকের রাস্তা।

রাঁচি ৩

পাত্রতু যাওয়ার রাস্তাও বেশ সুন্দর। পাত্রাতু পৌঁছানোর মিনিট পনের আগে একটি সুন্দর জায়গা আছে; গাড়ী সেখানে দাঁড়াল। এটি পাত্রাতু ভ্যালি ভিউ পয়েন্ট। আরও কয়েকটি গাড়ীও দাঁড়িয়ে ছিল। কীকয়েকটা ফুচকার গাড়ী, ডাবের ঠেলা। নিচে আঁকাবাকা পাহাড়ী রাস্তা। অনেক দূর পর্যন্ত কালচে সবুজ উপত্যকা দেখা যায়। পত্রাতু লেকও দেখা যায়। কয়েকটা ছবি তুলে, একটা ডাব খেয়ে গাড়ীতে উঠে চললাম। পাত্রাতু লেকে ঢোকার জন্য আধুনিক টিকিট কাউন্টারে টিকিট কেটে ঢুকলাম। সুন্দর সাজানো পার্কের ভেতর দিয়ে লেকের পাড়ে পৌঁছালাম। যে কোন বেড়ানোর জায়গার মত প্রচুর গুমটি দোকান, নৌকা ভ্রমণের নানান বন্দোবস্ত। স্পীড বোট, দাঁড় টানা নৌকা ইত্যাদি। আমরা খোঁজ নিয়ে জানলাম, এক ঘন্টা দাঁড়টানা নৌকায় চাপার খরচ পাঁচশ টাকা। আর দুজন যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করলাম প্রায় এক ঘন্টা, পাওয়া গেল না। আমাদের এই বয়সে নৌকা ভ্রমণের জন্য বিরাট উৎসাহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত গোটা পার্কে একবার ঘুরে গাড়ীতে ফিরে এলাম। এরপর কোথায় যাওয়া হবে জানতে চাওয়ায় ড্রাইভার বলল, কাছেই একটা জলপ্রপাত আছে। দুপুরে খাওয়ার জায়গার কথা জানতে চাইলে ড্রাইভার জানাল, পাশের ছোট হোটেলেই মাছ ভাত পাওয়া যায়। পাশের গ্রামের রাস্তা ধরে গাড়ী এগিয়ে চলল। তিন চার কিমি দূরে আর একটি জলপ্রপাত এর গেটে পৌঁছলাম। এখানে কোন টিকিট নেই। এটা পালানী জলপ্রপাত। একশ মিটার মত রাস্তা হেঁটে পাহাড়ের নিচে পর্যন্ত পৌঁছলাম I রাস্তার পাশে পাশে বাগানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু খুবই অযত্নে। সরু পাথুরে সিঁড়ি দিয়ে পঞ্চাশ সিঁড়ি মত নামতে হল। এখানেও দূর থেকে জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ। দশ বারোজন মত ছেলে ঝর্ণার জলে স্নান করছে দেখলাম। আমরা মিনিট দশেক থেকে কিছু ছবি তুলে ফেরার রাস্তা ধরলাম। গেটের কাছে একজন ভক্ত পৌঁছে গেল। গেটের বাইরে একটিই ঠেলা দোকান। সেখান থেকে বিস্কুটের প্যাকেট কিনে ভক্তকে খাওয়ান হল। পাত্রতুর সেই হোটেলে ফিরে এলাম খাওয়ার জন্য। একেবারে চালা না হলেও রাস্তার পাশের অতি সাধারণ ভাতের হোটেল। মাছের ঝোল ভাত খেয়ে গাড়ীতে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

ঘণ্টা খানেক গাড়ী চলার পর ড্রাইভার জানাল, কাঁকে মেন্টাল হাসপাতাল আসচে। আমি ইউটিউবে দেখেছি, অনেকেই রাঁচি বেড়াতে গিয়ে এই কাঁকের হাসপতালের গেটে ঘুরে আসে। আমার কাছে ব্যপারটা অশ্লীল মনে হয়েছে। এটাতে দেখার কি আছে জানিনা! সাধারণ একটা রাস্তার পাশের হাসপতালের গেট। রাস্তার একদিকে মহিলাদের আর অন্য দিকে পুরুষদের হাসপাতাল। আমাদের নামার কোন ইচ্ছাই ছিল না। এবার যে রাস্তা দিয়ে শহরে ঢুকলাম, সেই রাস্তায় বেশ গাড়ীর চাপ। শহরের ভেতরে একটি পার্কের বাইরে পৌঁছে গাড়ী থেকে নামলাম। এর নাম রক গার্ডেন। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। এটা একটা পাথুরে পাহাড়। নাম গোড্ডা হিল। পাথরের মাঝে মাঝে অনেক বড় বড় গাছ। পিছন দিকে এগিয়ে গেলে ওপর থেকে নিচে দূরে একটি বড় জলাশয়। নাম কাঁকে ড্যাম। এখান থেকেই রাঁচি শহর এর জল সরবরাহ করা হয়। লেকের জলে কচুরী পানা ভাসচে। কয়েকটি নৌকায় লোকজন ঘুরছে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল, তবুও অনেক যাত্রী পাহাড়ে ঘুরছিল। আমরা ওখানে চল্লিশ মিনিট মত থেকে বেরিয়ে এলাম।
এরপর চললাম, টেগোর হিল। শহরের ভেতরে একটা গলির ভেতরে গাড়ী দাঁড়াল। একটা ছোট গেট দেখিয়ে ড্রাইভার ভেতরে যেতে বলল। কোন টিকিট কাটতে হল না। কিন্তু সিঁড়িগুলি বেশ অযত্নে পড়ে আছে। মেঘলা আকাশ, সিঁড়ি গাছের ছায়ায় ঢাকা। একটি বোর্ডে লেখা পড়ে জানলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে একটি বাড়ী করে অনেক বছর ছিলেন, একশ বছর আগে। এখন সেই বাড়ীতে কেউ থাকে না। বাড়িটা সম্ভবত এখন মেরামত করা হচ্ছে। প্রায় চারশ সিঁড়ি বেয়ে টিলার উপর উঠলাম। টিলার মাথা থেকে সবদিকে রাঁচি শহর দেখা যাচ্ছে। আমরা কিছু ছবি তুলে আস্তে আস্তে নেমে এলাম। আমরা আগেই জানতাম, বিকেলে ফিরে ঘণ্টা পাঁচেক বসে থাকতে হবে। তাই স্টেশন রোডেই ফিরে এলাম। একটা সাধারণ হোটেলে ঢুকে পাঁচ ঘণ্টার জন্য একটি রুমে ঢুকলাম। রাত নটা নাগাদ হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে সামনের একটি হোটেলে রুটি খেয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম। রাত দশটায় ট্রেন। আমরা আধ ঘণ্টা আগে পৌঁছালাম। গাড়ী কিন্তু পৌনে দশটায় এসে গেল। গাড়ীতে উঠে মিনিট দশেক বসার পর ঠিক সময়ে গাড়ী ছাড়ল। সকাল ছয়টা পনের নাগাদ সাঁতরাগাছি স্টেশনে গাড়ী ঢুকল। আমরা তৈরী হয়ে বসে থাকলাম। টিকিয়াপাড়া ছাড়ার পর গাড়ী প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল। বসে বসে অত্যন্ত হতাশ হয়ে গেলাম। প্রায় সাড়ে সাতটার পর গাড়ী হাওড়ায় ঢুকল। ফেরার সময়ও মেট্রো রেল ধরে দমদমে ফিরলাম। ১৪.৯.২৪.

বাড়ীর কাছের আরশী নগর

কয়েক মাস থেকে একটু বাতিকগ্রস্তের মত দেড় দুই মাস অন্তর এদিক ওদিক ভ্রমণে চলে যাচ্ছি। দার্জিলিং কালিম্পং এর হোমস্টে, আলমোড়া নৈনিতাল এর দিকে, তারপর তো ভূস্বর্গ কাশ্মীর। এর মধ্যেই মধ্যপ্রদেশের কয়েকটা মন্দির শহর আর কন্যাকুমারী রামেশ্বরমের ওদিকে যাওয়ার টিকিট কেটে রেখেছি। কাশ্মীর থেকে ফিরে মনে হল, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যায়। কলকাতা থেকে ঘন্টা দুই ট্রেনে করে যাওয়া যায়, এমন বেশ কয়েকটি ভ্রমণ স্থানের খবর জোগাড় করে রেখেছি। দু চার মাস আগে থেকে ট্রেনের টিকিট কেটে রাখার দরকার নেই; লোকাল বা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একটা টিকিট কেটে উঠে পড়লেই হল। হুগলী জেলার বলাগড় ষ্টেশন থেকে একটু ভেতরেই সবুজ দ্বীপে, এরকম মাত্র ঘন্টা দুই ট্রেনে গিয়ে মোট তিন ঘন্টার কমেই পৌঁছে যাওয়া যায়। শুনেছি বেশ কয়েক বছর আগে। শিবাজীবাবুর ভিডিও দেখে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেছি। প ব সরকারের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট এর ওয়েব সাইটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সপ্তাহান্তে খালি পাওয়া মুস্কিল। আমার তো এখন গোটা সপ্তাহেই সপ্তাহান্ত। ঠিক আছে, শনি রবি না হোক, সোমবারই যাব। সপ্তাহ তিনেক পরে এক সোমবারের জন্য একটি ঘর এর জন্য অনলাইনে টাকা দেওয়ার আগে আর এক চমক। শুধুই বয়স ষাট বছর হওয়ার জন্য কয়েক বছর ধরে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি; সেরকম সুবিধা ভ্রমণেও পেতে পারি, এটা জানা ছিল না। দু হাজার তিনশ টাকার জায়গায় দু' শ তিরিশ টাকা ছাড় দিয়ে দু হাজার সত্তর টাকা দিতে হল। খুবই আলতো ভাবে আমাদের কন্যাকে তার মা বলেছিল, একদিনের জন্য ছুটি নিয়ে তুইও যেতে পারিস আমাদের সাথে। বছরের শেষ দিকে কিছু ছুটি জমা আছে, যাওয়া যায়; মেয়ে এটা বলতেই আবার ওদের ওয়েব সাইটে খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম। বিশেষ কিছু খবর পেলাম না। অগত্যা সোজা ঐ সবুজ দ্বীপের ম্যানেজার দিবাকরবাবুকে ফোন করলাম। উনি বললেন, অনলাইনে হবে না, মেয়েকে নিয়ে আসতেই পারেন, এখানে এসে টাকা দিতে হবে। কত? কুড়ি শতাংশ অতিরিক্ত। পরে অবশ্য দেখলাম, সবই লেখা আছে; যাকে বলে ফুট নোট এ। অর্থাৎ মেয়েও যাবে , সাব্যস্ত করা হল। এরপর কথা হল, ছেলে -বৌমা যদি যেতে পারে। ওদের দু'জনের আলাদা করে ছুটি নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাও হল। এবার আবার দেখ, WBTDCL এর ওয়েব সাইট। ঐ দিনে সবুজ দ্বীপে ঘর খালি পাওয়া যাবে কি না। পেয়ে গেলাম। সেই গত বছর সেপ্টেম্বরে, পুর্ব সিকিমে সবাই মিলে গিয়ে, প্রায় আটকা পড়েছিলাম। পাহাড়ে ধ্বস নেমে, রাস্তা আটকে সে এক বিরাট অশান্তি। বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, পাহাড়ী বন বাদাড়ে হেঁটে, জুলুক থেকে ঋষিখোলা ফিরতে হয়েছিল। পরদিনও রাত থাকতে উঠে রওয়ানা দিয়েও, প্রায় একশ কিমি ঘুরে , দৌড় দৌড়, দুপুরের ফ্লাইট ধরতে কি চাপ, কি চাপ! সবুজ দ্বীপের ম্যানেজার দিবাকরবাবু বলেছিলেন, সকাল আটটার পর শিয়ালদা কাটোয়া লোকালে দমদম থেকে সোজা আসতে পারেন। সেই মতই ঠিক হল। একদিন আগে ম্যানেজারবাবু ফোন করে জেনে নেন, দুপুরে এসে লাঞ্চ কি করবেন? এখানে পৌঁছতে এগারোটা পেরিয়ে যায়; তারপর বললে এদের পক্ষে রান্না করা সমস্যা। সেই মত গতকাল ওনার সাথে কথা হল। এরপর উনি জানতে চাইলেন, কিসে আসবেন? ট্রেনে এলে কোথায় নামতে হবে, তারপর টোটো ধরে নদীর ঘাটে। সেখানে এদের ভটভটি নৌকা থাকে সেই নৌকা না পেলে, নিজেদের আলাদা নৌকা ভাড়া করে আসতে হয়। এবার কিন্তু উনি বললেন, দমদমে না উঠে, শিয়ালদা স্টেশনে চলে গেলে ভালো। আজকাল কাটোয়া লোকালে ভালো ভিড় হয়ে যাচ্ছে। তাই করলাম; সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে চলে গেলাম। ট্রেন ফাঁকা ফাঁকা ছাড়ল। দমদমে উঠলেও অনেক জায়গা খালি ছিল। পরে অবশ্য সোদপুরেই ভিড় হয়ে গেল। সবাই এক জায়গায় বসে এসেছি, তাই কোথা দিয়ে দু ঘন্টা পেরিয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। বলাগড় স্টেশনের বাইরে থেকে একটা টোটোতে পাঁচ জনই উঠলাম। গ্রামের ভেতরের রাস্তা; পাকা হলেও বেশ এবড়ো খেবড়ো। মিনিট পনের লাগল। একটা জায়গায় দেখি রাস্তার পাশে পাশে মাটি খুঁড়ে জলের পাইপ বসানো চলছে। ওখান থেকে ডান দিকে ঘুরে, একশ মিটার মত দূরে নদীর ঘাট। টোটো আর এদিকে আসার উপায় নেই। নেমে ব্যাগ হাতে হেঁটেই নদীর পাড়ে পৌঁছালাম। নৌকা বাঁধা ছিল। কোন লোক নেই। পাশের একটি জেলে নৌকার মাঝি বলল, সবুজ দ্বীপে যাবেন তো, এটাই যাবে, উঠে পড়ুন। ঐ মাঝিই একটা কাঠের পাটাতন নামিয়ে দিল। আমাদের পরে পরে আরও দশ বারো জন যাত্রী আসার পর, নৌকা ছাড়ল। ২৫.১১.২৪.

সবুজ দ্বীপে 2

আমাদের অনেক সময় নৌকাতে বসে থাকতে হয়েছিল। আসলে আমরা পাঁচ জন একটা টোটো ধরে, ট্রেন থেকে নেমেই, সাথে সাথেই নদীর ঘাটের দিকে রওয়ানা দিয়েছিলাম। যারা দুজন এসেছেন, বা দলে আটজন, তাঁদের টোটো ভাগাভাগি ইত্যাদিতে সময় গিয়েছে। সব শেষে এসে পৌঁছলেন আট জনের একটি দিদাদের দল। তাঁদের দুই এক জন তো বেশ বয়স্কা। এই একশ মিটার হেঁটে আসতে সময় লেগেছে। তার উপর ঐ খোঁড়া রাস্তা পেরোতেও ওনাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। বলাগড় ষ্টেশন থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত টোটো ভাড়া মাথা পিছু পঁচিশ টাকা। এদের বলে দেওয়া সময়ে পৌঁছলে, ভুটভুটি নৌকার ভাড়া লাগবে না। অন্য সময় এলে নিজেকে নৌকা ভাড়া করে আসতে হয়। সেটার ভাড়া বোধহয় চারশ টাকা। ফেরার ব্যবস্থাও তাই; আগে পরে বেরোতে চাইলে, নিজেকে নৌকা ভাড়া করতে হবে। নদীর যে সরু খাঁড়িতে আমরা নৌকায় উঠেছি , সেটা এতই সরু যে, গঙ্গার ধারা বলে মনে হয় না। ডাইনে বাঁয়ে যতদূর দেখা যায়, মাছ ধরার নৌকা, জাল এসবই চোখে পড়ে। রাস্তা থেকেই দেখেছি একটা বিরাট বড় হোটেল তৈরী হয়েছে। নৌকা থেকে ঐ হোটেল দেখা গেল। তিন চার মিনিটে নৌকা বেশ বড় নদীতে এসে পৌঁছল। বাম দিকে ঘুরে, চওড়া নদীর বাঁ দিক ঘেঁসে চলল নৌকা। আরও মিনিট দশেক চলার পর, নদীর মাঝে দেখা গেল, সবুজ দ্বীপের সবুজ গাছপালা। নদীর দুই পাড়ই সবুজ কলা বাগানে সাজানো। সবুজ দ্বীপের জেটি বেশ ভালোকরে তৈরী, দরকার হলে বড় লঞ্চ বাঁধা যেতে পারে। গাড়ী পেরনোর মত ব্যবস্থা নেই। যাঁরা গাড়ী নিয়ে আসেন, পশ্চিম পাড়েই গাড়ী রেখে যেতে হয়। ফেরার সময় টোটো আমাদের সোমরা বাজার রেল ষ্টেশন এ নিয়ে এল। এদিকের রাস্তা একটু ভালো, আর দূরত্বও একটু কম। এদিকে ভাড়া নিল, মাথাপিছু দশ টাকা। সবুজ দ্বীপের জেটি থেকে ট্যুরিজম এর গেট পনের মিটার মত, আর ওদের আপিস গেট থেকে দেড়শ মিটার ভেতরে। সুন্দর বাঁধানো রাস্তা। পাশে পাশে কিছু বাহারি গাছ আছে, কিন্তু ফুলের বাগান নেই। ভেতরে বাগানের মত যে সব জায়গা আছে, সেসব জায়গায় জলের আগাছা ভরে আছে। বোঝা যায়, কিছুদিন আগে পর্যন্ত জল জমে ছিল। নদীর পাশে পাশে যে বাঁধানো রাস্তা আছে , সেই রাস্তায় পলি মাটি শুকিয়ে আছে; এসব জায়গায় জোয়ারের জল উঠে আসে সম্ভবত। আপিসের ঘর বা অন্যান্য সমস্ত কটেজ বা বাড়িগুলি থামের উপর মাঠের থেকে দশ ফুট উপরে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। সম্ভবত নদীর জল বাড়লে মাঠে জল এসে যায়। আপিসের খাতা পত্রের কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকতে আরও আধ ঘণ্টা মত লাগল। এর মধ্যে আমাদের কাগজের কাপে চা দেওয়া হল। আপিস ঘরে, নেতাজীর একটি ছোট্ট ছবি, দেওয়ালে টাঙানো। ঐ ছবির নিচে একটি ছোট্ট সুন্দর ওজন মাপার যন্ত্র, কেন রেখেছে বোঝা গেল না। কিন্তু এক এক করে খাতাপত্র লেখালেখির জন্য যে সময় লাগাচ্ছিল, সে সময়ই দিদারা কয়েকজন উঠে নিজেদের ওজন দেখে নিলেন। একটু আধটু রসিকতা হল। ঐ মেশিন রাখার উদ্দেশ্য, এদের এখানে দুই তিনদিন খেয়ে দেয়ে কতটা ওখন বাড়ল, দেখে বাড়ী ফিরতে পারেন, এবং, ইত্যাদি রসিকতা। প্রত্যেক কটেজে বড় ব্যাগগুলি পৌঁছে দিল একটি ছেলে। আমাদের তেমন কোন ব্যাগ ছিল না। প্রতিটি স্ট্যান্ডার্ড কটেজের সামনে পিছনে দুটি বারান্দা। ভেতরেও যথেষ্ট ভালো জায়গা। স্নানের ঘর বড় আর বেশ পরিষ্কার। পরদিন সকালে গরম জল পেয়েছি, গিজার চলিয়ে। অনেক হোটেলে যেমন অনেক সময় লাগে , তেমন নয়। পিছনের বারান্দা থেকে গঙ্গা নদী সুন্দর দেখা যায়। মাঝে অবশ্য ঝোপ ঝাড় হয়ে আছে। গোটা দ্বীপেই অনেক বড় বড় গাছ মরে আছে। কিছু মরা গাছের গুঁড়ি তো প্রায় মাটিতে মিশে আছে, এতই পুরনো। আমরা ঢোকার সময়ই দেখেছি, বড় বড় গাছের মাথায়, বেশ বড় বড়, কালচে ধুসর রঙের পাখি বসে কক কক করে ডাকছে। পিছনের দিকে একটি গাছের নিচে ঐ পাখিদের সাদা বিষ্ঠা এত পরিমাণে পড়েছে যে, রাস্তা বাঁধানো রঙিন পাথর দেখাই যায় না। বড় গাছগুলি কি এইসব পাখিদের বিষ্ঠার জন্য মারা গেছে? জানি না। নিজেদের ব্যাগপত্র ঘরে রেখেই আমরা গোটা এলাকাটা এক পাক ঘুরে দেখে এলাম। গোটা এলাকার চার দিক দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। পিছনের দিকে রাস্তা এমন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে যে নদী দেখা যায় না। পূর্ব দিকে, রাস্তা থেকে নদীর দিকে দুটি বাঁধানো ঘাট করা হয়েছিল, এখন মোটা লোহার তারের জাল দিয়ে আটকানো। দক্ষিণ দিকে একটি চার তলা সমান উঁচু, ওয়াচ টাওয়ার করা আছে। আমরা বিকেলে ওটাতে উঠে পাখিদের ফিরে আসা দেখলাম, আর অনেক ছবি, ভিডিও তুললাম। সূর্য ডোবার ঠিক আগে থেকে, প্রায় ঘণ্টা খানেক, গোটা এলাকা পাখিদের কলরবে মাতোয়ারা হয়ে গেল। আমরা প্রায় নিজেদের কথা নিজেরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আবার ভোরেও সূর্য ওঠার আধ ঘন্টা আগে থেকেই শুরু হয় ওদের হৈ হৈ করে দূরে দূরে গ্রামে উড়ে যাওয়ার কুচকাওয়াজ। কাক আর শালিক পাখী বেশী; ওরা ছাড়া সেই বড় শামুকখোলের মত পাখিও প্রচুর। দুপুরে প্রায় সব যাত্রীই একসাথে খাওয়ার টেবিলে হাজীর হলাম। আমাদের আগে থেকেই বলে রাখা, ডাল ভাত, মাছ তরকারী। পরে ওদের কাছে মিষ্টি দই আছে জেনে তাও নিলাম। আমার স্ত্রী নিল সাদা দই। ঐ সময়ই ম্যানেজার দিবাকরবাবু আর রান্না ঘরের অন্য একজন মিলে , সন্ধ্যায় আর রাত্রে কি খাবো খাতায় লিখে নিলেন। সন্ধ্যায় চা আর পাকোড়া খাওয়ার সময়, রেস্টুরেন্টের সামনে, রাস্তার পাশের ঝোপের আড়ালে একদল শেয়াল ডেকে উঠল। ওদের ডাক শুনে দূরে আর একদল সাড়া দিল। এতো কাছের থেকে এমন উদাত্ত কণ্ঠে

গণসঙ্গীত কোনোদিন শুনিনি, মোবাইলে রেকর্ড করে নিলাম। রাত্রে ঘুমানোর আগে, আর ভোর রাত্রে আরও কয়েকবার ঐ রকম ডাক শুনতে পেলাম , আমাদের ঘরের থেকেই। সন্ধ্যা ঠিক পাঁচটা থেকে সকাল ঠিক পাঁচটা পর্যন্ত গোটা চত্বর আলো জ্বলে থাকে। এমনকি নদীর পাড়ে পাড়ে রাস্তায় রাস্তায়। ভোরে সূর্য ওঠার আগেই আলো বন্ধ করে দেওয়ায় রাস্তাগুলি একটু অন্ধকার দেখছিলাম। মনে ভয় ছিল, বনের মধ্যের রাস্তায় হাঁটতে বেরোলো শেয়ালে তাড়া করতে পারে। ভোরে বেশ ঠাণ্ডা থাকায় একটু দেরী করেই বেরোলাম। তাও সোয়েটার, মাথায় কান ঢাকা টুপী পরে বেরোতে হল। ঠাণ্ডা বেলা নটা পর্যন্ত ছিল।

ওখানে নৌকা ভাড়া করে নদীতে এক ঘন্টা ঘুরে আসা যায়, জানতাম। বিকেলে প্রায় সাড়ে চারটায় সূর্য ডুবে যাবে, তাই পরদিন সকালে আটটা নাগাদ বেরোব ঠিক করলাম। দিবাকরবাবুকে বললেই, নৌকার মাঝিকে উনি ফোনে বলে দেন। সকালে ফেরার জন্য ওদের যে নৌকা এপাড়ে ফিরিয়ে দিয়ে যায়, সেটাতে এলে, দুপুর বারোটার লোকাল ট্রেনে ফিরতে হবে, ব্যাণ্ডেল বা হাওড়া। প্রথমে ভেবেছিলাম তাই করব। সকালে উঠে দেখি হাতে অনেক সময়। আটটার মধ্যে সকলের স্নান সারা হয়ে গেল। তখন চিন্তা করে দেখলাম, যে নৌকায় ঘুরতে বেরোব তাকেই কিছু টাকা বেশী দিলে নিশ্চয়ই ওপারে নামিয়ে দেবে। আমরা সোয়া দশটার ট্রেনে ব্যান্ডেল চলে আসতে পারব। দিবাকর বাবুকে মোবাইলে তাই জানালাম। উনি বললেন, কোন অসুবিধা নেই, শুধু রেস্টুরেন্টে খাওয়ার তৈরী করতে হয়তো সাড়ে আটটা হয়ে যাবে। আমরা ব্যাগ গুছিয়ে নেমে এলাম। একজন রেস্টুরেন্টে তাড়াতাড়ি বেরোনোর খবর দিতে গেলাম। আর এদিকে গিয়ে আপিসে বিল মেটাতে শুরু করলাম। সাড়ে আটটায় সকালের খাওয়ার লুচি আলুর তরকারী, ডিম সেদ্ধ, রসগোল্লা, দেশী ছোট কলা, সব তৈরী। আমাদেরই খেয়ে বেরোতে নটা বেজে গেল। নৌকার মাঝিআর সাথে আগেই কথা বলে নিয়েছি; একপাক ঘোরার জন্য চারশ টাকা আর ওপারে নামিয়ে দেবে, তার জন্য আর দুই 'শ, মোট ছয়' শ টাকা নেবে। সোয়া দশটার ট্রেন ধরতে হলে অন্তত পৌনে দশটায় ঘাটে গিয়ে পৌঁছনো দরকার; এ মাঝির সময় জ্ঞান বেশ ভালো দেখলাম। আমাদের পুরো সবুজ দ্বীপের চারপাশে এক পাক ঘুরিয়ে ঠিক পৌনে দশটায় ঘাটে এনে নামিয়ে দিল। আজ ঘাটেই গোটা তিনেক টোটো থাকলেও ডাকাডাকি করে কোন ড্রাইভার পেলাম না। সেই একশ মিটার হেঁটে আর একটু বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। একটু দেরী করে একটি ফাঁকা টোটো পেলাম। সে আমাদের সোমরাবাজারে পৌঁছে দিল, দশ বারো মিনিটে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ট্রেন এসে গেল। এটা যেহেতু কাটোয়া থেকে আসছে, বসার জায়গা পেতে সমস্যা হবে জানতাম। তাও তিনকে চার করে বসেই এলাম, ব্যান্ডেল পর্যন্ত। এটা আবার নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই ব্যান্ডেল চলে এল। নৈহাটি যাওয়ার ট্রেন এগারোটা বিয়াল্লিশ। এত সময় ব্যান্ডেলে বসে থাকতে হবে। তাই এগারোটা বাইশের ব্যান্ডেল হাওড়া লোকাল ধরে বালি চলে এলাম। কিন্তু এই ট্রেন সাত আট মিনিট দেরী করে চলায়, বালি হল্ট থেকে দমদমের ট্রেন পেলাম না। ওখান থেকে বাসে দক্ষিণেশ্বরে এসে, মেট্রো ধরে দমদম আসতে হল। আমাদের কন্যা অবশ্য তাতে খুশীই হল। ও তো মেট্রো পরিবারের সদস্য; তাই সকলকে, তিনটে ষ্টেশন হলেও, মেট্রোতে চাপিয়ে আনতে পেরে ওর ভালোই লেগেছে। আমাদের অবশ্য ভাড়া দিয়েই আসতে হয়েছে! একদিন সকাল সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে, পরদিন দুপুর একটায় বাড়ী ফিরে এলাম। খুব সংক্ষিপ্ত হলেও সবাই বেশ উপভোগ করেছি এই ভ্রমণটি। WBTDCL এর ওয়েবসাইট এ গিয়ে রুম বুক করতে হবে। ওদের রেস্টুরেন্ট এর খাওয়ার আমাদের বাড়ীর মত, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্না। এটা আমাদের ভালো লাগার একটা বড় কারণ। ওদের ওখানে ম্যানেজার আর তাঁর সহকারী, ট্যুরিজম এর কর্মচারি। বাকী জন তিনেক মাএ লোক, " এজেন্সির লোক" বললেন নিজেদের। কিন্তু সবাই বেশ করিত্‌কর্মা। রেস্টুরেন্ট এর একজনের কাছেই জানলাম, দল বেঁধে গিয়ে , পিকনিকের মত হৈ হৈ করে বিকেলে ফিরে আসে অনেকে। খাওয়ার ওদের রেস্টুরেন্টে খেতে হবে। সম্ভবত ম্যানেজার দিবাকর বাবুকে মোবাইলে ফোন করে ঐ রকম ভাবে যাওয়া যায়। ওয়েবসাইট এ সেরকম কোন খবর আমি দেখিনি। দিবাকরবাবুর ফোন নম্বর, 9874026920. আগেই লিখেছি, গাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। নইলে ব্যান্ডেল কাটোয়া লোকালের যে কোন গাড়ীতে উঠে, সোমরাবাজার চলে যান। স্টেশনের বাইরে অনেক টোটো। সবুজ দ্বীপের ঘাটে যাবো বললে নিয়ে যাবে। ফেরার সময় ট্রেনের সময়, যোগাযোগ ইত্যাদি একটু বিরক্তিকর। অনেকে এই সময় অম্বিকা কালনা গিয়ে ওখানকার মন্দির ইত্যাদি ঘুরে নেন। আমরাও একবার ভেবেছিলাম, ব্যাণ্ডেলে নেমে, একটা টোটো নিয়ে চার্চ দেখ আসব। এদিকে বাড়ী ফিরে, দুপুরে খেয়েই, কলকাতায় একটু বিয়ে বাড়ীর জন্য শাড়ী কেনার ব্যাপার থাকায় এবার আর ব্যান্ডেল চার্চ যাওয়া হয়নি।

এই যে, ফেরার সময় বেশ কবার ট্রেন, বাস, মেট্রো এসব ওঠা নামা করেছি, এটা শুনে কেউ কেউ ভয় পেতে পারেন। কালনার মন্দির দেখে, বিকেলে সরাসরি শিয়ালদার ট্রেন ধরে ফিরতে পারেন। আমরা দমদমে নেমে বাড়ীর দিকে হাঁটার সময় কথা হচ্ছিল সেপ্টেম্বরে আমাদের রাঁচি ভ্রমণ এর কথা। ওখানে প্রথম দিন তিনটি জলপ্রপাত দেখতে আমরা প্রায় সতেরশ সিঁড়ি নেমে আবার উঠেছিলাম। এক শুভানুধ্যায়ী দাদা বলেছিলেন, যতোদিন হাঁটু ঠিক আছে ঘুরে নিতে হবে;

তারপর তো ঘরে বন্দি। ঠিকই; আজ যে এমন দৌড় ঝাঁপ করতে পারলাম, আর পাঁচ সাত বছর পর পারব কি না বলা যায় না। ২৬.১১.২৪.

সিকিম ভ্রমন (প্রথম পর্ব)।

এবার সিকিম বেড়াতে যাওয়ার সব কিছুই ছেলে মেয়ে ঠিক করেছিল। যাওয়ার দিন তিনেক আগেও আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমার যাওয়া হবে কি না। শেষ পর্যন্ত আমার দুই সহকর্মী রাজী হওয়ায় আমিও দুদিন ছুটির সাথে দুদিন অন্যকে ডিউটি করতে বলে , চললাম। শনিবার বিকেলে বেরোনোর সময়ও কলকাতার আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত যেতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে; সেটাই ছাতা ছাড়া যাওয়া যাবে কি না সন্দেহ ছিল। যাই হোক, ঐ পাঁচ মিনিট সময় ই পেয়ে গেলাম। ধর্মতলায় পৌঁছে গেলাম বাস ছাড়ার প্রায় এক ঘন্টা আগে। এই প্রথম আমরা বাসে শুয়ে শিলিগুড়ি গেলাম। ব্যবস্থাটা আমার কাছে খুব একটা সুখকর হবে না, বুঝতেই পারছিলাম।

বাস যাত্রা বেশ ভয়ংকর। যতোই ভালো বাস হোক, এ বাংলার রাস্তার যা অবস্থা তাতে করে ঝাঁকুনি খেতে খেতে তের -চোদ্দ ঘন্টা যাওয়া , অসহ্য। এর থেকে রেলের জেনারেল কামরায় সারা রাত বসে যাওয়া আরামের হবে মনে হয়। সকালে ডালখোলায় নেমে চা খাওয়ার পর বাস চলতে শুরু করতেই আমার বমি হয়ে গেল। শিলিগুড়িতে নেমে একটা হোটেলের ঘর নিয়ে সকলে স্নান করে পাহাড়ে রওনা দেব ভেবেছিলাম, সে রকম হোটেল পাওয়া গেল না। শুধু মুখ হাত ধুয়ে , প্রাতরাশ

করে নিলাম একটা হোটেলে। এরপর গাড়িতে চললাম সিলেরী গাঁও। শিলিগুড়ি থেকে ঘন্টা চারেক। তিন ঘন্টার মত চলার পর এল কালিম্পং শহর। এর আগে কোনদিন কালিম্পং শহরে যাইনি। ড্রাইভারকে বললাম, কোথাও দাড়িয়ে চা খেয়ে যাই। কিন্তু এত ঘিঞ্জি শহর গাড়ী পার্কিং এর

জায়গা পাওয়া গেল না। আরও মিনিট পনের এগিয়ে একটি ছোট দোকানে দাড়ানো গেল। এক কাপ করে কফি খেয়ে আবার চলা। কিন্তু ঐ টুকু সময়েই ওদের পোষা কুকুর দুটি আমাদের খুব কাছের হয়ে গেল। শিলেরি গাঁও পৌঁছতে দেড়টা বেজে গেল। পাকা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রায় পাঁচ কিলমিটার এবড়ো খেবড়ো পাথুরে রাস্তা।

শিলারী গাঁও ছোট্ট একটা গ্রাম। হোমস্টের সামনের দিকে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। ওদের পিছনে কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখতে পাওয়ার কথা, কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় আমরা দেখতে পাই নি। দূরে সবুজ পাহাড়ের ওপর দুটি শহর দেখা গেল, দূরের শহরটি গ্যাংটক। এ ছাড়া একটা পাহাড়ের মাথায় একটা ফুটবল মাঠের মত খোলা জায়গা; ওটা সিকিমের একমাত্র বিমান ওঠা নামার জায়গা। সারাদিনে একটা বিমানও দেখিনি।

পরদিন সকালে বৃষ্টি বন্ধ হলেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেল না। ঠিক আটটায় ড্রাইভার এসে গেলেও গাড়ী হোম স্টে পর্যন্ত আনতে পারল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একশ ফুট দূরে গাড়ীতে উঠতে হল। এবার সেই পাথুরে রাস্তা দিয়ে ফিরে চললাম। এবার আর কালিম্পং শহরে না গিয়ে উল্টো দিকে চলল গাড়ী।   মাইল চারেক যাওয়ার পর পেডং নামে একটা ছোট শহরে দাঁড়ানো হল। কিছু জেরক্স করা হল। এখানে বলে রাখি, সিকিমের বহু জায়গায় যেতে হলে পার্মিট লাগে। এজন্য ভোটার কার্ড লাগবে, আধার কার্ড দিয়ে হবে না।

পাহাড়ের পাকদণ্ড রাস্তা দিয়ে এবার একটু একটু করে নেমে চললাম। উল্টো দিকের সবুজ পাহাড়ের নানান দৃশ্য দেখা গেল। একটা জায়গা থেকে উল্টো দিকের পাহাড়ে একটা সোনালী মন্দিরের চুড়া দেখিয়ে ড্রাইভার বলল, ঐ মন্দিরের সামনে দিয়ে যাব। নামতে নামতে একেবারে ঋষি খোলা নদীর কাছে চলে এলাম। এখানে সিকিমে ঢোকার চেক পোষ্ট। কিছু সময় দাঁড়াতে হল। নদীর সেতুর ওপর উঠে দেখলাম দুদিক থেকে দুটি নদী এসে কেমন করে ঋষি নদী তৈরী হয়েছে। নদী পেরিয়ে আবার পাহাড়ী রাস্তায় ওঠা শুরু হল। মিনিট কুড়ি পরে পৌছালাম সেই সোনালী মন্দিরের সামনে। বিশ্ব বিনায়ক মন্দির। গণেশের মন্দির। নতুন মন্দির। অনেক রকমের গণেশ মূর্তি দিয়ে সাজানো। আরও আধ ঘন্টা পর এল রংলি শহর। বেশ ঘিঞ্জি বাজার এলাকায় গাড়ী পার্কিং এর সমস্যা। কোন রকমে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, পারমিট এর কিছু কপি প্রিন্ট করা হল। আরও মিনিট কুড়ি পরে একটা সুন্দর ঝর্নার কাছে দাঁড়িয়ে কিছু ফোটো তোলা হল। এর পর ক্রমশ পাহাড়ী রাস্তায় উঠে চলা। তখনও বেশ ঝক ঝকে রোদ। এক জায়গা থেকে অনেক উপরে মেঘে ঢাকা পাহাড় দেখিয়ে ড্রাইভার বলল, জুলুক্ এর আবহাওয়া ঐ রকম হবে। একে একে নিমাচেন, পদম চেন পেরিয়ে উঠে চললাম। জুলুকে ওঠার কয়েক মাইল আগে শুরু হল লোয়ার জিগজ্যাগ, পাকদন্ডি । ড্রাইভার জানাল এই লোয়ার জিগজ্যাগ এ অনেক গাছ আছে, তাই অক্সিজেন কম পড়ে না। কিন্তু আপার জিগজ্যাগ এ গাছ না থাকায় কারো কারো শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমাদের কারো কোন সময় কোন অসুবিধা হয় নি। বেলা দেড়টা নাগাদ জুলুক্ পৌছালাম, তখন বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের হোটেলের সামনে যে সবুজ পাহাড় সেটা প্রায় মেঘে ঢাকা। পরদিন সকাল পর্যন্ত একটু একটু বৃষ্টি পড়ে চলল।   সিকিম ভ্রমন (২ য় পর্ব)।

সকালে টিপটিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ই বেরিয়ে পড়লাম। খুব সকালে একবার একটু বৃষ্টি থেমেছিল। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত নীল সবুজ পাহাড়ের ঢেউ খেলানো সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখতে পাই নি। জুল্যুক আসলে একটা মিলিটারী ক্যাম্প। একটা মাঠে কয়েক ডজন মিলিটারী ট্রাক দেখলাম, তাদের পাশে রেখে রাস্তা ক্রমশ উপরে উঠে চলল। ঘন্টা

খানেক চলার পর এল আপার জিগজ্যাগ। একটা ভিউ পয়েন্টে দাড়ানো হল। ওপর থেকে জিগজ্যাগ এর অনেক ছবি তোলা হল। মাঝে মাঝে সাদা মেঘ এসে পাহাড় ঢেকে দিচ্ছিল। আমরা থাকতে থাকতেই পরে আরও দু তিন টি দল এল। তারা মেঘের জন্য জিগজ্যাগ দেখতে পায় নি। ওখানে গোটা দুই চায়ের দোকান আছে। আমরা একটা দোকানে বসে কফি খেলাম। আবার গাড়ী পাকদন্দি বেয়ে উঠে চলল। এবার এল থাম্বি ভিউ পয়েন্ট। এখানে থেমে অনেক ছবি তোলা হল। মেঘ না থাকলে এখান থেকে কাঞ্চজঙ্ঘা খুব ভালো দেখা যায়। এরপর যেখানে থামলাম, সেখান থেকে নিচে সুন্দর একটা উপত্যকা। কিছু ঘরবাড়ী আছে। বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠে অনেক চমরী গরু চরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। কয়েক মিনিট পর সাদা মেঘ এসে গোটা উপত্যকা ঢেকে দিল।

পাহাড়ী পথে আরও আধ ঘন্টা চলে পৌঁছলাম বাবা মন্দির। এটা পুরনো বাবা মন্দির। ১৯৬২ সালের চিনা আক্রমণের সময় হরভজন সিং শহীদ হন। তাঁকে নিয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচারিত আছে।

জুতো খুলে, কিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠে মন্দির দেখা হল। কালো মেঘ এসে গোটা এলাকা ঢেকে দিলেও বৃষ্টি হচ্ছিল না। ওখান থেকে আবার আধ ঘন্টা মত চলে পৌঁছলাম কুপুক এলিফ্যান্ট লেক। লেকের কাছে যাওয়ার অনুমতি নেই। ওপরের রাস্তা থেকেই দেখতে হয়। রাস্তায় মেঘ না থাকলে ও, লেকের উপর মেঘ থাকায় ভালো দেখা যাচ্ছিল না। মিনিট দশেক পর মেঘ সরে গেল। ওখানেও কয়েকটা চমরি গরু চরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। কয়েকটা ছবি তোলার পর ফেরার রাস্তা ধরলাম। ওই রাস্তা ছাঙ্গু লেক হয়ে গাংট ক চলে যায়। আমরা জুল্যুক্ ফিরে এলাম। ফেরার সময় প্রায় গোটা রাস্তাই মেঘে ঢাকা পেলাম। হোটেলে ঢুকলাম ছাতা মাথায়।

সেই যে বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা পরদিন ফেরা পর্যন্ত আর থামলই না। রাত্রে প্রচণ্ড গোঁ গোঁ করে বৃষ্টি পড়ে ই গেল। সকালে আটটায় ড্রাইভার এসে খবর দিল, ফেরার পথে পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে, রাস্তা বন্ধ। রাস্তা খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দেওয়া হয় সাধারণত। প্রায় এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সামনে আর একটা গাড়ী অন্য কোন হোটেল থেকে বেরিয়ে আগে আগে চলল। পাঁচ কিমি মত নেমে একটা জায়গায় দেখি ধ্বসে রাস্তা বন্ধ। দুই গাড়ীর ড্রাইভার নেমে দেখতে গেল। পরে আরও একটা গাড়ী পিছনে এসে দাঁড়াল। ওরা মিনিট দশেক পর জানালো এই ধ্বস পেরোনোর কোন উপায় নেই। সোজা নিচে জিগজ্যাগ এর তিন জায়গায় রাস্তা বন্ধ। একটু পিছিয়ে, পাহাড় জঙ্গল হেঁটে এক মাইল মত নামতে পারলে ধ্বস পেরোনোর উপায় হয়। আমরা এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। নিচের থেকে গাড়ী এসে আমাদের ঋষিখোলা পৌঁছে দেবে। তার জন্য যে ফোনাফুনি করতে হল তাতেই সমস্যা। মোবাইলের সিগনাল খুব সামান্য একটু পাওয়া যাচ্ছিল। খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েই কিছুটা পিছনে ফিরে এলাম। রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে নামার জায়গাটা ড্রাইভার নিমা খুঁজে বের করল। গাছের ডাল ভেঙ্গে লাঠি বানানো হল। পায়ের মোজা খুলে নিতে বলল নিমা। আমাদের সবথেকে বড় ট্রলি ব্যাগটি কাঁধে নিয়ে নিমা আগে আগে চলল। ঘাস ঝোপ জঙ্গলে সাবধানে পা ফেলে এগোতে থাকলাম। এক জায়গায় কিছু পাইন গাছ কেটে ফেলে রাখা ছিল। খুব সাবধানে পেরোতে হল। আমার স্ত্রীর পক্ষে বেশ কঠিন ছিল জায়গাটা। একটা পায়ে চলার রাস্তা মত মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সেই পাথুরে রাস্তা দিয়ে একটা ঝর্ণা মত বয়ে যাচ্ছিল, তাই পাথরে পা না ফেলে পাশের ঘাসে ঘাসে পা দিয়ে চলতে হচ্ছিল। অনেক টা নেমে এস এস বি ক্যাম্প এর গেটে পৌঁছলাম। ওদের পোষা কুকুর আছে, নিমা তাই নিয়ে বেশ টেনশনে ছিল। জওয়ানরা গেট খুলে দিল। নিমা বারবার কুকুর সামলে রাখতে বলল। দুটি নিরীহ কুকুর দেখতে পেলাম। ওরাই আমাদের মিছিল দেখে দূরে সরে গেল। ক্যাম্প থেকে নিচে বড় রাস্তায় নেমে এলাম। ঐ রাস্তা থেকে আবার একটা সুন্দর পাইনের জঙ্গলে নামলাম। নিচ থেকে কয়েকজন লোক কাঁধে মোটা মোটা কেবল নিয়ে উঠে আসছে দেখে আমরাও ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে নামতে শুরু করলাম।

প্রথম কিছুটা সুন্দর একটা পার্কের মত। ওখানে বসার জন্য লোহার বেঞ্চও আছে কয়েকটা। পার্ক এর থেকে নামার সময়ই পায়ে শেকড় জড়িয়ে আমার স্ত্রী দুবার আছাড় খেয়ে পড়ল। আরও একশ গজ ঝোপ ঝাড় পেরিয়ে নামার পর আসল বিপদের জায়গায় পৌঁছলাম। নিচে রাস্তা তৈরীর কাজ চলছে। সোজা জঙ্গল থেকে দশ ফুট নিচে কাদা পাথরের ওপর নামতে হবে। আমি ওপরের ডাল পালা ধরে ঝুলে নেমে গেলাম। নিমা এক এক করে বড় বোঝা আমার হাতে নামিয়ে দিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ওখান থেকে আমার স্ত্রী নামতে পারবে না। নিমা তাকে পিঠে নিয়ে নামিয়ে দিল। নিচের রাস্তায় নামার পর আবার বৃষ্টি নামল, ছাতা মাথায় নিয়ে দাঁড়াতে হল। যারা রাস্তার কাজ করছিল জানাল যে কিছুটা নিচে হেঁটে নামলে একটা দাঁড়ানোর জায়গা আছে। গাড়ী আসতে সময় লাগবে, তাই নিচের দিকে নামতে শুরু করলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা টিনের ছাউনি পেলাম। নিচের গাড়ীর ড্রাইভার এর সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা মুশকিল হয়ে গেল। তার ভেতর নতুন সমস্যা হল, এই নতুন ড্রাইভারের কাছে পারমিট এর কপি নেই। অনেক কসরত করে গাড়ীর এজেন্ট ওকে পার্মিট পাঠাল।

আধ ঘন্টা পর গাড়ী এসে গেল। নিমা কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। এজেন্টের কাছ থেকে কোন নির্দেশ আসে কিনা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। নতুন ড্রাইভার ওকে কোন খবর দিতে পারল না। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে গাড়ী নিয়ে উপরের দিকে উঠে গেল। মিনিট দশেক পর গাড়ী নেমে এলে আমরা উঠলাম। নতুন ড্রাইভার জানাল , নিমাকে যতোটা সম্ভব এগিয়ে দিয়ে এসেছে। শেষে নীমাকে একটা ধন্যবাদ ও দেওয়া হল না। ওখান থেকে ঋষিখোলা 53 কিলো মিটার। ড্রাইভার বলল, এক ঘন্টা মত লাগবে। ওঠার সময় কয়েক জায়গায় থেমে গেছলাম, প্রায় ঘন্টা তিনেক লেগেছিল। ফেরার সময় গোটা রাস্তায় প্রায় কোন গাড়ী দেখিনি। ঘন্টা খানেকে ঋষিখোলা পৌঁছে গেলাম। সাড়ে তিনটার পর দুপুরের খাবার খেলাম। নদীর পাড়ে ছোট্ট হোটেল, সারা সময় গোঁ গোঁ করে নদীর শব্দ শুনলাম। হোটেলটি সুন্দর হলেও ব্যবস্থা খুব বাজে। টিভি আছে, কিন্তু চলে না। এদিকে কলকাতায় বসে আমার বন্ধুরা টিভি দেখে আমাদের জন্য খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। কয়েকজন ফোন করল। গুগলে দেখলাম, লাভা গরুবাথান হয়ে ফেরার রাস্তা আছে। আমার ছেলে এজেন্টের সাথে কথা বলে ঠিক করল, ভোর সাড়ে চারটায় রওনা দিয়ে বাগডোগরা ফেরার চেষ্টা হবে।

ঋষি খোলা পৌঁছে মনে হচ্ছিল, বিপদটা পেরিয়ে এসেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে নামতে গিয়ে আমাদের তিনজনকে জোঁক ধরেছিল। আমার বাম হাতের পাতায় একটা জোঁক বসেছিল, রক্ত বের করার আগেই দেখতে পাই, আমার মেয়ে টেনে তুলে নেয়। হোটেলে পৌঁছে জুতো খোলার পর মেয়ে দেখল তার পায়ের গোড়ালির কাছে রক্ত বের হচ্ছে। জোঁক খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রায় এক ঘন্টা পর আমার স্ত্রীর একটা পায়ে, হাঁটুর নিচে রক্ত বের হচ্ছে দেখা গেল। এখানেও জোঁক খুঁজে পাওয়া গেল না।

ভোরে উঠে বেরতে হবে, সেই চিন্তায় রাত্রে ভাল ঘুম হল না। আমরা সাড়ে চারটার আগেই তৈরী হয়ে গেলাম। পাঁচটার আগে গাড়ী এসে গেল। মিনিট দশেক এর মধ্যে চেক পোষ্ট এ পৌঁছে গেলাম। ড্রাইভার নেমে অফিসে গেল। ভাবলাম গেট খুলে দেবে। কিন্তু ড্রাইভার দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে নদীর সেতুর দিকে চলে গেল। এক এক করে আমরা দুজন নামলাম। এবার দেখি সামনের রাস্তায় পনের ফুট উঁচু পাথর পড়ে আছে। এবার চেক পোষ্ট এর পুলিশ এগিয়ে এসে বলল, ওপারে আরও দু জায়গায় রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আগামী দু দিন লাগবে রাস্তা খুলতে। এবার সত্যিই চাপে পড়ে গেলাম। ড্রাইভার এসে বলল, উঠুন, রংপো ঘুরে যেতে হবে। কোথায় রংপো, কত ঘুরতে হবে কিছুই জানিনা।সিকিম ভ্রমন (৩য় পর্ব)। গাড়ী ঘুরে আবার পিছন দিকে উঠে চলল। আস্তে আস্তে আকাশ ফরসা হয়ে এল। রাস্তায় এক দুজন করে লোক দেখতে পেলাম। বৃষ্টি নেই। সকালের মনোরম পরিবেশে গাড়ী ছুটছে। মাইলের পর মাইল পথ চলার পর একটা জায়গায় দেখি সামনের দিকে একটু নিচের দিকে রাস্তা নেমে যাচ্ছে, পাথুরে রাস্তা। নামার মুখেই ডান পাশে একটা ট্রাক দাড়িয়ে আছে, বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। নিচের দিক থেকে একজন বয়স্ক মহিলা উঠে আসোছিল। ড্রাইভার নিজেদের ভাষায় তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করল, উত্তরে মহিলা মাথা নেড়ে না জানাল। ড্রাইভার নেমে রাস্তা ধরে নেমে গেল। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে গাড়িতে বসল। এবার আর এক বিপদ, গাড়ী স্টার্ট নিচ্ছে না। ব্যাটারিতে একটু ঠোকাঠুকি করার পর স্টার্ট নীল। সেই লরির পাশ কাটিয়ে, প্রায় ধ্বসে পড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ী নিয়ে এগিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর রংপো পৌঁছে গেলাম। একটা মোড় ঘুরতেই সামনে তিস্তা নদী। নদীর পাড় ধরে চওড়া রাস্তা, NH 10. শিলিগুড়ি 77 কিমি দূরে। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ। আমাদের গাড়ী বামদিকে সরু রাস্তা ধরে খাড়া পাহাড়ে উঠল I আবার পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে উঠেই চললাম। এই ড্রাইভার পুষ্পা মাঝে মাঝেই মোবাইলে কার সাথে কথা বলে চলেছে। রং পো থেকে ঘন্টা দেড়েক চলার পর উল্টো দিকের থেকে আসা একটি গাড়ী আমাদের গাড়ীর পিছনে দাঁড়াল। এবার পুষ্পা র গাড়ী থেকে আমাদের মাল পত্র নতুন গাড়ীতে তুলে রওনা হলাম। এই নতুন ড্রাইভার জানাল সে ভোরে ঋষিখোলার দু কিমি দূরে গিয়ে পৌঁছেছিল। আমাদের এবার লাভা গরুবাথান হয়ে রাস্তা। মাঝে একটা রাস্তা গাছ পড়ে বন্ধ হয়ে যায়, তাই তার আসতে দেরী হল। আপনাদের ফ্লাইট ধরতে একটার মধ্যে বাগডোগরা পৌঁছতে হবে জেনে ড্রাইভার জানাল, হয়ে যাবে।

সকলেই সকালে শুধু চা খেয়ে বেড়িয়েছি। ড্রাইভারকে বললাম, লাভায় দাঁড়ান, ব্রেকফাষ্ট করে নেব। ড্রাইভার বলল, আর একটু নিচের দিকে নেমে দাঁড়াব। লাভা লেলেগাও এর নাম অনেক শুনেছি, এবার বিপদে পড়ে লাভা দেখা হল। প্রচুর মেঘ থাকায় রাস্তার পাশের পাহাড় প্রায় কিছুই দেখা হল না। প্রায় ন টা নাগাদ , অনেক নিচে নেমে, রাস্তার পাশের একটা ছোট দোকানে দাড়ানো গেল। ওখানে সকলে ম্যাগী আর চা খেয়ে রওনা হলাম। এবার ক্রমশ নেমে চলা। আধ ঘন্টার মধ্যে গরুবাথান চলে এলাম। তার কয়েক মাইল আগে থেকেই রাস্তার পাশে সুন্দর চা বাগান। অন্য সময় হলে নেমে ছবি তোলা হত। এখন আর সে কথা মনেই আসেনি। গরুবাথান বাজারের মধ্যে একটু জ্যাম এ পড়লাম। বাজার পেরিয়েই একেবারে সমতলে চলে এলাম। চওড়া সোজা রাস্তায় গাড়ী প্রচণ্ড জোরে ছুটল। রাস্তার বাম দিকে মাইলের পর মাইল চা বাগান। মাল বাজারের কাছে আর একটা বড় হাইওয়েতে পড়ে গাড়ী ডান দিকে চলল। একটু পরেই ওদলাবাড়ী মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে সেবকে এসে গেলাম। সেবক থেকে শিলিগুড়ি গাড়ী আস্তে চালাতে হয়। শিলিগুড়ি শহরে ঢোকার পর তো রাস্তার গাড়ীর

জটলায় এগোনই কঠিন। শিলিগুড়ি শহরে পৌঁছে ড্রাইভারকে বললাম, একটা রাস্তার পাশের হোটেলে খেয়ে নেব। একেবারে বাগডোগরা Airport এর দুশো গজ দূরে একটা হোটেলে ঢুকলাম। পাঁচ দিন পর মাছ ভাত খাওয়া হল। এখানে বলে রাখি; সিকিমের সব হোটেল বা হোম স্টেতে একই রকম খাওয়া। দুপুরে ডিম ভাত, রাত্রে মুরগী মাংস দিয়ে রুটি বা ভাত। আলু ছাড়া আর কোন সবজী নেই।

এবারের অভিজ্ঞতায় দেখলাম, সিকিমের ড্রাইভার কিন্তু গুগুলের দাদা। এদের নিজেদের মধ্যে এত ভাল যোগাযোগ থাকে যে সব খবর ওরা সবার আগে পায়। পাহাড়ে বেড়াতে গেলে একটু আধটু হাঁটাহাঁটি করতে হবে। আর একেবারে গোড়ার কথা, বর্ষায় পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাববেনই না।

টিকিট

টিকিট কাটা হয়েছে প্রায় সাড়ে তিনমাস আগেই। আর দিন কুড়িও বাকি নেই, সব রকম টাকা পয়সাও দেওয়া হয়ে গেছে। এবার ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া। এই হল মোটামুটি একটা ভ্রমনের স্বাভাবিক গতি। এবার অবশ্য টিকিট কাটা হয়েছে এরোপ্লেনের। এ টিকিট যতো আগে কাটাযায় ততোই সস্তা। এরও কতোই উন্নতি দেখলাম গত বছর কুড়িতে। তখন টিকিট কাটার জন্য পকেটে করে টাকা নিয়ে শহরের মধ্যে এয়ারলাইন্সের আপিসে যেতে হত; সেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এবার যে টিকিট কাটা হল, সবই অন লাইনে, ঘরে বসেই।

শুধু ঘরে বসে একটা কোম্পানির টিকিট কাটাযায় তাই নয়। আরও চারটে কোম্পানি, কে কত দাম নিচ্ছে, কখন পৌছবে, সব এক জায়গায় বসেই দেখে নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়াগেল। বাড়ীর সবাই একসাথে বসে। হয়তো রাত দশটার পর।এই ঘরে বসে টিকিট কাটার অন লাইন ব্যবস্থায় সবথেকে বেশী সুবিধা হয়েছে রেল যাত্রার জন্য। বছর তিনেক হল নিয়মিত এই ই টিকিট কেটেই দুরপাল্লার ট্রেনে চাপছি। আগের দিনের ব্যবস্থাটা ভাবলে এখনও ভয় লাগে। একটা রেলের টিকিটের জন্য শিয়ালদা, হাওড়া বা ফেয়ারলিতে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হত।

শুধু কাজের সময়, মানে অফিস টাইমে, একটা লোকের কয়েক ঘন্টা টিকিটের লাইনে কাটানো, এমন করে কত হাজার ঘন্টা নষ্ট হয়েছে ভেবে দেখুন। বছর ছয়েক আগে একবার শিলিগুড়িতে বলতে গেলাম। ওনারা ট্রেনের টিকিট কেটে ক্যুরিয়ারে পাঠালেন। আর গত বছর ফারাক্কা গেলাম; টিকিট অন লাইনে কেটে জয়ন্তবাবু আমার মোবাইলে পাঠিয়ে দিলেন।

গত বছর ঔরঙ্গাবাদে হোটেলে বসে হিসেব করলাম, পরদিন বিকেল পর্যন্ত বসে থাকা বিরক্তিকর, তাছাড়া হোটেলও ছাড়তে হবে সকাল আটটায়। মোবাইলেই দুপুরের ট্রেনের টিকিট কেটে ফেললাম। এছাড়াও টিকিট কাটার সাথে সাথেই রিটায়ারিং রুমও বুক করি আজকাল। ষ্টেশনের রিটায়ারিং রুমে থাকতে পারলে আর শহরের হোটেল খোঁজা বা যাতায়াত করতে হয় না। মনে আছে, বছর পাঁচেক আগে একবার শিলিগুড়িতে রাত্রে থাকার জন্য ষ্টেষনে রিটায়ারিং রুম নেওয়ার কত ঝকমারি। প্লাটফর্মের আপিস থেকে লিখে নিয়ে বাইরে টিকিট কাউন্টারে গিয়ে টাকা জমা দিতে হয়েছিল।

রেলের টিকিটের জন্য চূড়ান্ত হেনস্থা হতে হয়েছিল রেলেরই ভুলে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে রায়গঞ্জের থেকে কলকাতা আসব। তখন রায়গঞ্জে কলকাতার ট্রেন যেত না। মালদা থেকে ট্রেন ধরতে হত। রায়গঞ্জে রেল ষ্টেষনে চারটি টিকিট কাটলাম। গাড়ী করে মালদায় এসে ট্রেন ধরলাম। গাড়ী ছাড়ার দশ মিনিট আগে অন্য লোক এসে টিকিট দেখাল, ঐ সব বার্থ ওদেরও দেওয়া হয়েছে। ছুটলাম ষ্টেষন মাষ্টারের কাছে। উনি জানালেন, রায়গঞ্জের কোটা দুমাস উঠে গেছে, ওরা ভুল করে টিকিট দিয়েছে। ট্রেনে কন্ডাক্টারকে সব বলে, মেঝেতে ছেলেকে শুইয়ে কলকাতায় এলাম। ঐ কন্ডাক্টার পয়সা নিয়ে অন্য দুজনকে বার্থ বিক্রী করল দেখলাম। ঐ যে রেলের কর্মচারিগণের ওপর ঘৃণা জন্মাল, আজও তার থেকে মুক্তি পাইনি।

ঐ সময়ও রায়গঞ্জে পুরনো কাঠের মত ছোট টিকিট ছিল। কিন্তু কম্পিউটার রিজার্ভেশন করা টিকিট একটু বড় পোষ্টকার্ড সাইজের হত। এই বড় টিকিট এখনও আছে। কিন্তু নেট থেকে টিকিট করলে আর ওসব টিকিটের দরকারই হয়না। তবে যদি কাগজে প্রিন্ট নিতে হয়, সেক্ষেত্রে তো বড় একটা কাগজই লাগে। ট্রেনে যাতাযাতে কোন কাগজের টিকিট না হলেও চলে। কিন্তু যদি রিটায়ারিং রুম নেওয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ওটা কাগজে প্রিন্ট নেওয়াই ভালো। কেননা ওসবের দায়িত্ব সাধারণত কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের ওপর থাকে, ওরা কাগজই দেখতে চায়।

অনেকদিন পর্যন্ত রেলের মান্থলি টিকিট হলদে রঙের একটু শক্ত কাগজের হত। কবে যে ওটাও সাধারণ টিকিটের মত হয়ে গেল খেয়ালই করিনি। শহরতলীর ট্রেনে চাপার জন্য এই মান্থলি বা কোয়ার্টারলি টিকিট খুব সুবিধাজনক। আমরা যারা সবদিনই একবার বা দুবার ট্রেনে চড়ি, তাদের জন্য আদর্শ। ভাড়া কম লাগার থেকেও বড় কথা হল, রোজ রোজ টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়াতে হয় না। শুধু এই লাইনে দাঁড়াতে গিয় কত হাজার লোক যে গাড়ী ফেল করে তার ঠিক নেই। মাঝে মাঝে যারা ট্রেনে চড়ে, তাদেরও লাইনে দাঁড়াতে যাতে না হয় তার ব্যবস্থা হয়েছে। কার্ড একটা কেনা থাকলে টিকিট ভেন্ডিং মেসিনে টিকিট কাটা যায়। শুধু টাকা ঢুকিয়ে টিকিট কাটার মেসিনও আছে বড় ষ্টেষনগুলিতে। আমি বছর পাঁচেক হল কার্ড ব্যবহার করছি। তবুও দরকারের সময় মেসিন কাজ করছে না, এমনও হয়েছে।

একবার বর্ধমান হয়ে ভাতারের এক অনুষ্ঠানে যেতে গিয়ে বিশ্রী কান্ড হয়েছিল। সকালের ট্রেনে দমদম থেকে উঠে বর্ধমান যাব। মিনিট পনের আগে ষ্টেশনে গিয়ে দেখি, পঞ্চাশজন করে লোক এক একটা লাইনে। সবকটা মেসিনও খারাপ। ঐ ট্রেন না ধরলে দেড় দু ঘন্টা দেরী হয়ে যাবে। ভাতারের অনুষ্ঠানে শ তিনেক লোক আমার জন্য বসে

থাকবে। আমার মান্থলি আছে ইছাপুর পর্যন্ত। দরকার হলে বিনা টিকিটেও যাব ঠিক করলাম। প্লাটফর্মে উঠে তিন চার জনকে ফোন করলাম। গ্রীষ্মকাল হলেও, সকালে ফোন বেজে গেল। বারাকপুরের দীনেশবাবু ধরলেন। ওনাকে ব্যাপারটা বোঝাতে উনি বললেন, বারাকপুর থেকে বর্ধমানের টিকিট কাটার চেষ্টা করছেন। মিনিট কুড়ি সময় পাওয়ায় উনি টিকিট কেটেও নিলেন। প্লাটফর্মে এসে আমাকে টিকিট দিয়ে গেলেন। এই যে একটা টিকিট কাটার জন্য একজন বাহাত্তর বছরের যুবককে সকাল ছটায় দৌড়তে হল, এটা কিন্তু রেলের লোকেরা জানলই না। আর জানানো হল না ভাতারের ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ তিনেক মানুষকে। অন্তত বারো ঘন্টা আগে(এখানে একবার থামতে হল) এসব টিকিট কাটার একটা ব্যবস্থা থাকলে অনেক ঝামেলা এড়ানো যায়। এখন অবশ্য মোবাইলে টিকিট কাটার একটা ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু আমি একদিনও ওটা কাজে লাগাতে পারিনি। ট্রেনের টিকিট কাটা আর না কাটা নিয়েই অনেক গল্প আছে। সেসব শেষ করা যাবেনা লিখে। পরশুদিনই সৌম্য স্যারের রাত্রের ট্রেনের টিকিট কনফার্ম হল না। ও জেনেছে ঘন্টাখানেক আগে। অগত্যা রাতের বাসেই যেতে হল। বাসেও টিকিট দিলেও, বসার জায়গা নিশ্চিত ছিল না।

বাসের টিকিট কয়েকটা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া এখনও, বাসে উঠেই কাটতে হয়। বাসের টিকিট আগের থেকে কেটে বসার জায়গা নিশ্চিত করা যায় কিছু কিছু দূরপাল্লার বাসে আর ট্যুরিস্ট বাসে। যে সব বাসে ওঠার পর টিকিট কাটা হয়, সেখানে আবার নানান অনিয়ম। একটু দূরের বাস হলেই কন্ডাক্টর চুরি করার চেষ্টা করে। কিছু কম ভাড়া নিয়ে, টিকিটটা না দেওয়ার চেষ্টা করে। আর কলকাতার বাসের মত মারাত্মক ভীড়ের বাসে অনেক সময়েই কন্ডাক্টর দরজা ছেড়ে ভেতরে ঢোকেনা। নামার সময় গুতোগুতিতে অনেক সময় টিকিট কাটাই হয় না। বিশেষ করে ছেলে ছোকরার দল অনেক সময়ই টিকিট ফাঁকি দেওয়াটা একটা খেলার মত মনে করে।

ট্রামতো কলকাতা থেকে প্রায় উঠেই গেল। এক সময় ট্রামের মান্থলি টিকিট ছিল, এখনও আছে কিনা জানিনা। এছাড়া জলপথ পরিবহনের টিকিট হয়। কলকাতা আর শহরতলির বিভিন্ন ঘাটে লঞ্চে চড়তে হলে টিকিট কাটতে হয়। অটো টোটো বা ট্যাক্সি কোনদিন টিকিট দেয় না। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট গাড়ী চলে, তারাও কখনওই টিকিট দেয় না। এতো গেল পরিবহনের টিকিট। এছাড়া আর কোথায় কোথায় টিকিট লাগে একটু দেখা যাক। এক সময় সিনেমার টিকিট নিয়ে কি সব কান্ড হয়েছে। টিকিট ব্ল্যাকার বলে একটা পেশাই ছিল তখন। বড় বড় হলের বাইরে ওরকম দু চারটে মস্তান মত লোক থাকত। নামি নায়ক নায়িকার সিনেমা এলে ওরাই টিকিট কাউন্টারে ভীড় করে অনেক টিকিট কেটে নিত। ভদ্রলোকদের তিন টাকার টিকিট দশটাকা কুড়ি টাকায় কিনতে হত ওদের কাছে। সত্যি বলতে কি এই একটি অশ্লীল ব্যাপারের জন্যই বয়স কালে আমার সিনেমা সম্বন্ধে একটা বাজে ধারনা তৈরী হয়েছিল। সিনেমা সম্বন্ধে কেউ কোন ভালো কথা বললেও এখনও সে আলোচনা এড়িয়ে চলি। সিনেমার মত থিয়েটার আর যাত্রারও টিকিট বিক্রী হয়। থিয়েটার, বিশেষ করে কোলকাতার পেশাদার মঞ্চের কিছু বিখ্যাত নাটক আমি টিকিট কেটে দেখেছি।

আমাদের ছোটবেলায় গ্রামেরদিকে কলকাতার বড় দলের যাত্রা হলে, তাকে " টিকিট সেল যাত্রা " বলা হত। শেষ যে টিকিট সেল যাত্রা দেখেছিলাম তার অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি। তখন বাঁকুড়া থেকে গড়বেতায় আসতাম প্রতি শনিবার, ষ্টেষনের পাশে নবীন সংঘে চোখের রুগী দেখতে। ওদেরই আয়োজনে ঐ দিন সন্ধ্যায় বিখ্যাত দলের যাত্রা। ওরা থেকেযেতে বলল। সন্ধের পর ওদের টিকিট বিক্রীর ঘরটাতে বসে জন সমুদ্র দেখলাম। হৈ হৈ করে টিকিট বিক্রী হল। বিস্কুটের টিনে টাকা রাখা হচ্ছে দেখলাম। এক সময়ের অতি বিখ্যাত নায়কের অভিনয় দেখতে হাজার হাজার লোক এসেছে দেখলাম। কিন্তু যাত্রা পালাটি ভালোলাগেনি লোকের। ঘন্টাখানেক চলার পর লোকে ইট পাটকেল ছুড়ে ভন্ডুল করে দিল।

টিকিট না পাওয়ার জন্য, মেদিনীপুরে নাথবতী দেখা হলনা। আর কোনদিন দেখার সুযোগ হয়নি। এখন তো অনেক সময় লোকে বাড়ীতে টিকিট রেখে গেলেও আর যাওয়া হয়না।

আর একটা ব্যাপারে টিকিট নিয়ে হাজার লোকের "হাহাকার " দেখলে আমি অবাক হয়েযাই। খেলা দেখার জন্য উন্মাদনা থাকতেই পারে। কিন্তু ঐ "হাহাকার " শব্দটির অপব্যবহার এক এক সময় অশ্লীল মনে হয়। ভেবে দেখুন, বাস নদীতে পড়ে বিয়াল্লিশ জন মানুষ মারা গেল। হতভাগ্য মানুষগুলির আপনজন হাহাকার করছে। আবার ইডেনের একটা টিকিটের জন্য হাহাকার। কাগজওয়ালারা কেমন করে বাংলা ভাষাকে ধর্ষণ করে এ তার প্রকট উদাহরণ। একটি টিকিটের জন্য বহু লোক লালায়িত, এ কথা লেখার সাহসই নেই।

এবার বলি আমাদের দৈনিক বিড়ম্বনার টিকিটের কথা। সরকারী হাসপাতালের দু টাকার টিকিট কাটতে একজন মানুষকে দুঘন্টাও লাইনে দাঁড়াতে হয় কখনও। এমনকি ঐ টিকিট কেটে দেওয়ার জন্য দালাল ও ধরতে হয় কখনও। অবাক লাগে যখন বাজারী কাগজওয়ালারা বা টিভির সেন্টেড পেইন্টেড উপস্থাপিকা অবহেলায় বলেদেন, সরকারী হাসপাতালে লোকে যায় না। আচ্ছা, প্রতিদিন যে হাজারে হাজারে প্রাণী ঐ দু টাকার টিকিটে ডাক্তার দেখিয়ে যাচ্ছে, তারা কি মানুষই নয়!

দীনেশবাবুর কথা লিখতে গিয়ে একবার থামতে হয়েছিল। ঐ সময় ওনার স্ত্রীর শেষ সংবাদটা দিলেন একজন। একেও আমরা বলি পুস্পক রথের টিকিট কনফার্ম হওয়া।

আর একটা টিকিটের কথা আমাদের দিন রাত ভাবতে হয়। সেটা হল ভর্তি রুগীর টিকিট। আমরা ইংরেজীতে বলি বি এইচ টি, অর্থাৎ বেড হেড টিকিট।

সরকারী হাসপাতালের টিকিট কাটতে বড়ই অনিহা। ওদিকে ইকোপার্ক, নিক্কোপার্ক, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া সব জায়গায়ই কয়েকশো লোকের টিকিটের জন্য লাইন দিতে কোন কষ্ট নাই। আর বড় বড় ক্লাব বা পাঁচতারা হোটেলে যে সব ডিনার পার্টির টিকিট বিক্রী হয়, সেসব কেনার লোকেরও অভাব নেই। আর দক্ষিন ভারতের মন্দিরে ছোট লাইনে ঢোকার জন্য আমি নিজে ২৫০ টাকার টিকিট কেটেছি। লোকে পাঁচশ হাজার টাকার টিকিটও কাটে শুনেছি। সভয়ে বলি,ঐ লোকগুলি কিন্তু দুশো টাকা ডাক্তারের ফি দিলে, বাজে খরচ বলে হাহুতাশ করে। ট্রেনে চোদ্দ বছরের ছেলের জন্য হাফ টিকিট কেটে টিটির সাথে তর্ক করে। আর বাসে উঠে ছ টাকার টিকিটও ফাঁকি দেয়।

তবে যে টিকিট আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকা দাম শোনাযায়, তার কথা না বললে তো টিকিট পূরাণ শেষই হবে না। না, লটারির টিকিটের কথা বলছি না। অবশ্য ও টিকিট পাওয়া লটারি পাওয়ার থেকেও দামি। ভোটের দিন ঘোষনার আগে থেকেই তেনারা একটা টিকিটের জন্য হত্যা দেন। পেয়ে গেলেই কেল্লা ফতে। মানুষের সেবা করার এমন মহৎ সুযোগ তো পাঁচ বছরে একবারই মাত্র আসে। কত সাধ্য সাধনা করে একটা টিকিট জোগাড় করতে হয়,বোকা জনগন বুঝলই না।

তুমি বিদেশিনী

বাঁকুড়ার বিপদতারণবাবু আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। উনি জানিয়েছেন, ওনার কলেজ জীবনে, ১৯৮৭ সালে, এক বৃদ্ধা মেমসাহেব ওনাদের বাঁকুড়ার হোষ্টেলে এসেছিলেন। এত বছর পরে তাঁর নামটা মনে নেই।

এরকম কত লোকইতো আসেন, যান। কে বা সকলকে মনে রাখে? একজন বিদেশিনী এসেছিলেন, তাঁর জন্মস্থানটা একবার দেখে যেতে। অন্তত আমাদের এই বিপদতারণবাবু বা তাঁর মত, তৎকালীন কলেজ পড়ুয়াদের কাছে, অন্তত তখন, এটাকে কোন খবরই মনে হয়নি।

অথচ ওরও অন্তত পাঁচ বছর আগে, ঐ বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজে, বাঁকুড়ার একজন আবৃত্তি শিল্পি, পার্থ কুন্ডু মশাই আবৃত্তি করেছিলেন, " কলকাতার যীশু ", আমার আজও মনে আছে।

বিপদতারণবাবুর ফেসবুকে লেখা থেকেই জেনেছি, " ১৯৮৭ সালে এক মেমসাহেব এসেছিলেন, বাঁকুড়ায়। ওনার বাবা ছিলেন বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ঐ মেমসাহেব আমাদের এই বাঁকুড়াতেই জন্মেছিলেন।" বাবা ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ায় উনি আর ওনার ভাই, গডফ্রে ব্রাউন, ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান।

আচ্ছা,এই যে ফিরে যান কথাটা লিখলাম, এটা কি ঠিক লিখলাম? একজন শিশু জন্মের পর চোখ খুলে দেখল বাঁকুড়ার আকাশ। তার জীবনের প্রথম প্রশ্বাস এল বাঁকুড়ার বাতাস থেকে। সেই শিশুকন্যাকে হাতে ধরে হাঁটা শেখালেন তার মা, সেও বাঁকুড়ার মাটিতে। তার বাবার চাকরীর জারগায় একটা বড় পুকুর। তার বাবা কি তাকে আর তার ভাইকে ঐ পুকুরে নামিয়ে সাঁতার শিখিয়েছিলেন? হয়তো ঠিক তাই। কিন্তু আজ আর সে খবরটা আমাদের জানানোর জন্য কেউ নেই। না, এদেশ ওদেশ কোন দেশেই নেই। থাকবে কি করে; সে যে একশ বছরেরও বেশি পুরনো খবর। ১৯৮৭ সালে ঐ শিশুকন্যা যখন তাঁর জন্মস্থানটা একবার দেখেযেতে আসেন বাঁকুড়ায়,তখন তাঁরই বয়স প্রায় পঁচাত্তর।

ষাট বছর বড্ড বেশিই সময়। উনি শৈশব কৈশোরের স্মৃতিমাখা স্বপ্নময় বাঁকুড়ার মাঠ ঘাট লালমাটির রাস্তা ছেড়ে যাওয়ার পর ঘটেগেছে অনেক ইতিহাস। বিশাল বিধ্বংসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর স্মৃতির থেকেও বড় ঘটনা ঘটেছে ওনার জীবনে। ওনার সুখস্মৃতি মাখা জন্মভূমি হয়ে গেল বিদেশ।

এর আগে উনি আর ওনার ভাই ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকের মাঠে পৌছে দিয়েছেন, বাঁকুড়ার লালমাটি। উনি পেয়েছেন রৌপ্য পদক। ওনার ভাই পেয়েছেন স্বর্ণ পদক। কিন্তু ওনাদের জন্মভূমি সে খবর মনে রাখেনি।

কেন যেন মনে পড়ল শিশুপাঠ্য গল্পের সেই অমর বাক্যটি; " বন থেকে জানোয়ার তুলে আনাযায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলেফেলা যায় না"।

এই যে একজন বৃদ্ধা বিদেশিনী, প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়সে নিজের জন্মভূমিকে একবার শেষ দেখা দেখে যেতে এলেন, এর মূল্যায়ণ কে করবে? উনি প্রায় নীরবেই এসে ঘুরে গেলেন। এমনকি যে সব কলেজ পড়ুয়াদের সাথে উনি কথা বলেগেছেন, তাদের কাছেও প্রকাশ করেননি যে, উনি একজন অলিম্পিক পদক বিজেতা। আসলে ওনার কাছে, নিজের জন্মভূমিকে একবার ছুঁয়ে দেখার আনন্দ হয়তো একটা অলিম্পিক পদক জয়ের থেকেও বেশী মনে হয়েছে।

এই বিদেশ হয়ে যাওয়া জন্মভূমিকে একবার অন্তত ছুয়ে দেখার যে গভীর গোপন মর্মভেদী তাৎপর্য, সেটা বোঝার মত মানুষ আজ আর নেই প্রায়। একমাত্র শীর্ষেন্দুবাবু ছাড়া আর তেমন কারও কথা মনে পড়ছে না। কদিন আগেই চলে গেলেন এক প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার, মৃনাল সেন মশাই। সুনীলবাবু চলে গেছেন অনেক আগেই। শেষ দুজনকে ওনাদের সৌভাগ্যের জন্য ঈর্ষা করা যায়। তবে নাট্যকার মনোজ মিত্র মশাইয়ের ফিরে দেখার অভিজ্ঞতা সম্ভবত সুখের হয়নি। উনি বিদেশ হয়ে যাওয়া জন্মভূমিকে ছুয়েও দেখেছেন। কিন্তু শৈশব কৈশোরের স্বপ্নময় জন্মভূমিকে বার্ধক্যের হেজে যাওয়া মন নিয়ে দেখতে গিয়ে হতাশ হয়েছিলেন।

এসব কথা ভাবতে গেলেই আমার নিজের জীবনের এক দুঃখজনক ইতিহাস ভেতরে ভেতরে আমাকে দগ্ধ করে। প্রায় বৈষ্ণব সন্যাসির মত নির্লিপ্ত জীবন কাটিয়ে গেছেন, আমার বাবা। দেশ ভাগের আগেই, চাকরীসূত্রে জন্মভূমি মাহিলারা গ্রাম ছেড়ে আসতে হয়েছিল তাঁদের। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের মত, ওপাড়ের ফেলে আসা সামান্য ভু সম্পত্তি নিয়ে কোন আফশোষ করতে শুনিনি কোনদিন। কিন্তু একাত্তরে ও দেশটা "স্বাধীন " হয়েছে শোনার পর, একবার

জন্মভূমিকে ছুয়ে আসার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন। মূলত আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় সে সময় বাবার আর যাওয়া হয়নি। পরে ছেলে মেয়েরা স্বচ্ছল হলেও, বার্ধক্যের কারনে ওসব চিন্তাই আর করতে পারেন নি। এখন আমাকে যখন বাংলাদেশে কোন সম্মেলনে যাওয়ার কথা বলেন ওদেশের প্রখ্যাত অধ্যাপক আবুল ফৈজ স্যার, বাবার অপ্রাপ্তির কথাই আগে মনেপড়ে। ঐ এক আফশোষ আর কোনদিন মিটবে না।

হয়তো কোনদিন যেতেও পারি। কিন্তু সেটা হবে আমার একটা " বিদেশ" ভ্রমণ। শীর্ষেন্দুবাবুর পার্থিব উপন্যাসের পন্ডিত মানুষটির মত, বাবার জন্য একটি আম্রপল্লব বয়ে আনবার কোন তাগিদ অনুভব করব না। কেউ তো নেই ঐ অকিঞ্চিৎকর এক শুকিয়ে যাওয়া আম্রপল্লবকে অশ্রুবারি সিঞ্চন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

কদিন আগে বাঁকুড়ায় গিয়ে দেখে এলাম ব্রাউন হষ্টেলের বাড়ীটা। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রাউন হষ্টেলের দক্ষিণদিকে এখনও টলটলে জলে ভরা সেই পুকুর। পুকুরের উত্তর পাড়ে এখনও টিকে আছে ইঁট বাঁধানো ঘাটলা। যদিও সে ঘাটলা এখন খুবই অযত্নে পড়ে আছে ; কিন্তু তার উপরেই স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাচীন বর্ষণবৃক্ষ। মিঠা শিরিশ গাছের এই নামটা শুনতাম শুধু বাবার কাছে। ব্রাউন সাহেবের বাড়ীর উঠানে এই গাছটি কে লাগিয়েছিল আমাদের জানা নেই। ১৯৮৭ সালে কন্যা অড্রে ব্রাউন বাঁকুড়ায় আসার সময়, বাবা রেভারেন্ড এ ই ব্রাউন সাহেব বেঁচে থাকলে হয়তো জানতে চাইতেন, আমাদের সেই রেইন ট্রীটা কি এখনও আছে?

বিপদতারনবাবু জানিয়েছেন, বৃদ্ধা মেমসাহেব বহুক্ষণ ঐ ঘাটলায় বসেছিলেন চুপচাপ। তাঁর চোখের কোনা দুটি চিকচিক করছিল কি? সে খবরটা নিয়ে তখন আদৌ ভাবেনি কেউ। তেমনই কেউ খোজ রাখেনি, বৃদ্ধা মেমসাহেব ঐ প্রকান্ড বর্ষণবৃক্ষের একটি ছোট্ট শাখা বয়ে নিয়ে গিয়েছেন কি না, ওনার ভাই গডফ্রেকে দেখানোর জন্য।

কে বলতে পারে, আজও হয়তো ব্রাউন পরিবারের সুসজ্জিত শোকেসে ,পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রাখা আছে, একটি বিশাল বর্ষণবৃক্ষের ক্ষুদ্র একটি শাখা। একেবারে অলিম্পিকের একটি সোনার আর দুটি রৌপ্য পদকের পাশেই; সমান মর্যাদায়!

তৈল মর্দনের বিড়ম্বনা

প্রথমেই বলে রাখি; এটা কিন্তু সোজা বাংলায়, গায়ে তেল মাখতে গিয়ে আমি কি বিড়ম্বনায় পড়েছিলাম , তারই গল্প। অন্যান্য যে সব কথা, সেগুলি গল্পে বৈঠকী মেজাজ আনার চেষ্টা।

তৈল মর্দনের ব্যাপারটি বহু প্রাচীন একটি প্রথা। দেশে দেশে এই কর্মটি করেই বহু কাজ হাসিল হয়েছে। কোন কোন মানুষ এই বিশেষ কাজটিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আর মহাজনেরা বলেন, রজগুণী মানুষ মাত্রই তৈল মর্দনের গুণগ্রাহী। আবার হিসেব করে দেখেছি, অন্তত আমার পরিচিত মানুষজন প্রায় সবাই সত্তর থেকে আশি ভাগই রজগুণী। এদের মধ্যে যাদের ঐ বাকী কুড়ি পঁচিশ ভাগ তমো গুণ, আমরা তাঁদের একটু নীচু চোখে দেখি। আর যাদের ঐ বাকি কুড়ি তিরিশ ভাগ সত্বগুণ, তাঁদেরই আমরা মহান মানুষ মনে করি। আসলে একশ শতাংশ সত্বগুণী যাঁরা, তাঁদের মানুষ না বলে দেবতা বলা হয়। আর একেবারেই নব্বই শতাংশ তমোগুন যাদের, তাদের আমরা গাড়ল বা গোদা বুদ্ধির লোক বলি। অর্থাৎ আমাদের আশেপাশের প্রায় সব মানুষই তৈল মর্দনের পক্ষে। তা সেটা কাজ হাসিলের জন্য একটু আধটু তেল দিতে খুব একটা আপত্তি নেই ; কিংবা কেউ যদি মাত্রা রেখে একটু আধটু তেল দিতে চায়? দিক, দিক , বুঝতে তো পারছি তেল দিচ্ছে; এরজন্য একেবারেই ঘর থেকে বের করে দিয়ে, " হিরো" সাজার দরকার নেই। এই মানসিকতার মানুষগুলিকে " মধ্যবিত্ত" বললে আমরা ভালো বুঝি। ঐ রজোগুণী না কি সব , ওসব কঠিন ব্যাপার স্যাপার এর মধ্যে নাই বা গেলাম। আসলে আমি কিন্তু আজ আক্ষরিক অর্থেই তেল মাখা নিয়ে কিছু লিখতে চাইছি। কদিন আগে ঐ ত্রিগুন নিয়ে এই সুন্দর, সহজ সরল ব্যাখ্যা শুনলাম। তাই প্রচলিত অর্থে তৈল মর্দনের সাথে ঐ তিনরকম ব্যক্তিত্বের মানুষের সম্পর্কে একটু লিখে রাখলাম। এবার আসি গায়ে তেল মাখা নিয়ে কিছু কথায়। আমি শুধুই শীতকালে গায়ে তেল মাখি। খুব ছোট বেলায়, প্রায় সারা বছরই পুকুরে স্নান করতে নামার আগে গায়ে বেশকরে সর্ষের তেল মেখে নিতাম। তবুও, বিশেষ করে গ্রীষ্ম কালে ঘন্টা দেড়েক পুকুরে দাপাদাপি করে যখন উঠে আসতাম, গায়ে খড়ি ফুটে যেত। শীতের মাস দুই ছাড়া গায়ে তেল মেখেছি শেষ কবে, ভুলেই গেছি। আর মাথায়? যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৯ সালে বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজের পুরাতন হোস্টেলে থাকার সময়, একদিন মাথায় দিয়েছিলাম একটি আয়ুর্বেদিক তিল তেল। আমার মাকে দেখতাম ঐ " রাধা কৃষ্ণ ছাপ ত্রিগুণ তৈল " সারা বছরই মাথায় দিতে। ওতে নাকি মাথা ঠাণ্ডা থাকে। বাঁকুড়ার চাঁদি ফাটানো গরমে যদি একটু সুবিধা হয়, এই ভেবে একটি ত্রিগুন তেল কিনেছিলাম। একদিন মাথায় দিয়েছিলাম; আমার সর্দি হয়ে গেল। আর কোনোদিন মাথায় তেল দিয়ে স্নান করিনি। এদিকে প্রায় বরিষ্ঠ নাগরীক হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অনেকেই বলত, তুমি মাথার চুলে কলপ দিয়েছ। একটা গোপন কথা ফাঁস করি। কলপ করা তো দূরের কথা, এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত মেট্রোর বরিষ্ঠ নাগরিকদের সিটে বসলে চিন্তায় থাকতাম; কেউ এসে না উঠে যেতে বলে। আজকাল অবশ্য আমারও কিছু চুল পেকেছে। এই ব্যাপারে, একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও, আমার চিন্তা ভাবনা কি, একটু বলি। মাথার চুল বয়স হলে সাদা হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। উল্টে আমার মনে হয়, চুল পাকলেই যেন একটু পরিণত হয়েছি বোধ করি। পেয়ারা ছাড়া আর কোন ফল যেমন ডাঁসা ভালো লাগে না; আমার তেমনি কলপ করা চুল দেখলে ' ডাঁসা ' বয়েস মনে হয়।

অনেক গৌরচন্দ্রিকা হল। এবার আমার বিড়ম্বনার কথাটি জানাই। গত সপ্তাহ থেকেই , দুপুরে স্নান করার আগে, গায়ে একটু নারকেল তেল মাখা শুরু করেছি। আর আমি একটু শীত কাতুরে, একথা তো আগেও বলেছি কয়েকবার। স্নান করার কিছু সময় আগে , জল গরম করার জন্য গিজার অন করে, গায়ে তেল মাখতে শুরু করি। গতকাল দুপুরে কি একটা কাজে একটু দেরি করে মনে পড়ল, গিজার অন করার কথা। কোনার বারান্দায় শীতকালে লোভনীয় রোদ পড়ে। কম্পিউটারে বসে নানান কাজে ব্যস্ত থাকি; ঐ রোদে বসা হয় না। এই গায়ে তেল মাখার সময় দুই চার মিনিট, বারান্দার রোদে বসার চেষ্টা করি। যাঁরা এখনও কাজের মধ্যে আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মনে মনে এই বরিষ্ঠ নাগরীককে গালাগাল দিতে শুরু করেছেন। লোকে নাকে মুখে দু'মুঠো ভরে দৌড় দিতে সময় পায় না; আর এ লোকটা দুপুরের মিঠে রোদে বসে, আরামে তেল মাখার গল্প শোনাচ্ছে! সত্যি বলতে কি; চাকরী থেকে অবসর নিয়ে, এই যে, সকাল থেকে দুপুর গোটা সময়টাই " আমার নিজের", এই পাওয়াটার জন্যেই যেন আমি শেষের দিকে বছর তিনেক, দাঁত কামড়ে চাকরী করে গেলাম। কারো কাছে কোন দায় নেই, রাত্রে বিছানায় যাওয়ার সময় পরদিন সকালে উঠে ক' টায় কাজে বেরোতে হবে সেই চিন্তা নেই; এই সময়ের স্বাধীনতা জিনিসটা অবশ্য বেশ চেষ্টা করে অর্জন করতে হয়েছে। পঁচাত্তর আশি বছর বয়সেও নিয়ম করে কাজে যেতে হয় যাদের, তাঁদের জন্য আমার কষ্ট হয়। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনি নিশ্চিত এক বুড়ো মানুষের পাল্লায় পড়েছেন। বক বক করতে পারলে, বুড়ো মানুষগুলির আর কিছু চাই না। তো, সেই গায়ে তেল মাখা তো হল। কিন্তু গিজার অন করতে দেরী হয়েছে, তাই একটু সময় অপেক্ষা করে ঢুকব ভাবছি। এই মিনিট পাঁচেক সময়ে একটা কিছু ছোট কাজ করে নেবো ভাবছি, এমন সময় টং করে বেল বাজল। কে আবার এল? অনেক সময় আমাদের কন্যা আপিসে বসে কিছু একটা অনলাইনে অর্ডার করে। সবসময় মাকে বলে যেতে ভুলে যায়। দরজা খুলে, কলাপসিবল গেটের বাইরে দেখি,

ডেলিভারি বয় দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সবসময়ই ব্যস্ত থাকে। একবার মেয়ের নামটা বলেই, গেটের ফাঁক দিয়ে প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দেয়। বড় প্যাকেট হলে, দরজার বাইরে রাখা টুলের উপর রেখেই ফেরার রাস্তা ধরে। ও টি পি দেওয়ার থাকলে, মেয়ে তার মাকে আগেই জানিয়ে রাখে। সেই রকম কোন ছেলে এসেছে ভেবেই দরজা খুলে দেখি, আমার প্রতিবেশী, উপরের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে ঐ রকম গ্রামের চাষীর মত গামছা পরিহিত অবস্থায় দেখে , উনিও বোধহয় একটু থমকে গেলেন। কিন্তু দরকারটা এমনই যে, অন্য কোন ভদ্রতার কথা না বলে , সরাসরিই বললেন, ওনার পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মহিলা পড়ে গিয়ে কপাল কেটেছেন। "একবার একটু চলুন তো!" উনি খুবই ধীর স্থির ভাবেই বললেন। কিন্তু গত প্রায় চল্লিশ বছরের অভ্যেস, মাত্র সাত আট মাসে যাওয়ার কথা নয়। আমার ভেতরের কল কব্জা, যেন রেডি, অন ইওর মার্ক হয়েই ছিল ; শুধু " গো" বলার অপেক্ষা। কিন্তু সেকেন্ডের ভগ্নাংশে মনে পড়ল, আমি গামছা পরে দরজা খুলেছি। তাও হয়তো একটা গেঞ্জি বা টি শার্ট পরে দৌড় দেওয়া যেত। গায়ে যে বেশ করে তেল মাখা আছে। ঐ সামান্য সময়ে ওনাকে শুধু জিজ্ঞেশ করলাম, অজ্ঞান হয়ে আছেন না কি? উনি বললেন, না, খুব ব্যথা বলেছেন। বোঁ করে পিছন ফিরে ভেতরের ঘরে চলে এলাম। আমার স্ত্রী যেন একবার বলল, ওনাকে দরজা খুলে বসাও। সে কথা শোনার থেকেও, একটা ব্যথার ট্যাবলেটে বের করে ওনার হাতে দেওয়াটা অনেক বেশী জরুরী মনে হল তখন। কেউ কেউ ভাবছেন, ডাক্তার এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে না কি! আমরা যারা খুবই বাজে কর্মফল ভোগ করতে, প্রায় তিরিশ বছর সরকারী হাসপতালে চাকরী করেছি, তাদের এক এক সময় কি ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে, সে একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করার সময় কয়েকবার দেখেছি, আমার সহকর্মী, ডাক্তার মন্ডল , লুঙ্গি পরে কোয়ার্টার থেকে হাসপাতালের দিকে দৌড়চ্ছেন I মুর্শিদাবাদের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার পায়খানা করতে বসেছিলেন; সে সময় একটি বিষ খাওয়া রুগী এসে হাজির হয়েছিল। ডাক্তার বাবুর রুগী দেখতে চার পাঁচ মিনিট দেরী হযেছিল, সেই অপরাধে জনগণ তাকে পিটিয়ে হাসপতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল। সে যাই হোক, আমি ট্যাবলেটটি ওনার হাতে দিতে দিতেই বললাম, এটা খাইয়ে দিন, আমি তেল মেখেছি, স্নান করেই আসছি। মিনিট তিনেক এর মধ্যে গায়ের তেল ধুয়ে নিয়ে, গা মুছতে মুছতে ভেবে নিলাম, কি করতে পারি আপাতত। আমার কাছে এখনও চোখ অপারেশনের জন্য ব্যাণ্ডেজ, টেপ ইত্যাদি রাখা আছে। কয়েক সেকেন্ডে সে সব কাঠের আলমারি খুলে বের করে নিয়ে ছুটলাম উপরের তলার দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পাচ্ছিলাম, ভদ্র মহিলা কান্নাকাটি করছেন। আশ্চর্য, ওদের ফ্ল্যাটে তালা বন্ধ। পাশের ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটেও তালা বন্ধ। অথচ সবার কথা শুনতে পাচ্ছি। বুঝলাম, ওনারা লিফটে নামছেন। আমি সিঁড়ি দিয়ে তিন তলা নেমে এলাম। ততক্ষণে ওরা নীচে নেমে, ভদ্রমহিলাকে একটি চেয়ারে বসিয়েছেন। নামার সময়ই দেখেছি, ওনার স্বামী বড় গেট দিয়ে, মোবাইলে কথা বলতে বলতে হন হন করে ঢুকছেন। মহিলার ডান চোখের উপরে কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। উনি রুমাল দিয়ে চোখ আর কপাল চেপে ধরে ছিলেন। রুমাল সরাতে দেখলাম, কপালে গোটা তিনেক ব্যান্ডেড লাগিয়েছেন। তাতে যে রক্ত বন্ধ হবে না, সেটা আন্দাজে বুঝেই, ব্যাণ্ডেজ এর সরঞ্জাম নিয়ে নেমেছিলাম। একবার শুধু দেখে নিলাম, চোখে আঘাত পেয়েছেন কি না। মিনিট খানেক লাগল ব্যাণ্ডেজ করে দিতে। এর মধ্যেই দেখি, উপরের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক গাড়ীর চাবি নিয়ে নেমেছেন। আমাদের সিকিউরিটি লোকটি ফোন করে একজন ড্রাইভার ডাকছিলেন। এদিকে এই ভদ্রলোক গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করার চেষ্টা করছেন দেখলাম। কয়েক মিনিটেই পাড়ার কোন ড্রাইভার এসে হাজির হলেন। ওনাকে গাড়ী বের করতে বলে আমরা গাড়ী বেরোনোর রাস্তায় এগিয়ে গেলাম। পিছনের সিটে এদের স্বামী স্ত্রীকে তুলে, সামনের সিটে উঠলেন গাড়ীর মালিক ভদ্রলোক। দুপুর বেলা বলেই দমদম রোডে গাড়ী একটু চালানো যায়। ওনারা তাড়াতাড়িই একটি নার্সিং হোম এ পৌঁছে গেছলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী শিয়ালদা থেকে আসার সময়ই পরিচিত কারো সাথে মোবাইলে কথা বলে, ঐ নার্সিং হোম এর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন। কয়েকটা সেলাই করে, সাথে সাথেই ফিরে এসেছিলেন, ঐ গাড়ীতে করেই। পরে জানলাম, উপরের ফ্ল্যাটের যে ভদ্রলোক আমাকে ডাকতে এসেছিলেন, উনিও বাজারের দিকে ছিলেন, ওনার স্ত্রীও বি আর সিং হাসপতালে ওষুধ আনতে গেছিলেন। ওদের ফ্ল্যাটও তালা বন্ধ ছিল। এই ভদ্রমহিলার কিশোরী কন্যা স্নান করতে ঢুকেছিল। বেরিয়ে দেখে মা রান্না ঘরের মেঝেতে পড়ে গিয়ে কপাল কেটেছেন। ও সম্ভবত সবার আগে বাবাকে ফোন করেছিল। বাবার কথা মত নিচে নেমে, সিকিউরিটি লোকটিকে বলেছে। ঠিক সেই সময় আমার উপরের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ভদ্রলোক বাজার থেকে ফিরছিলেন। আমার ঐ তেল মাখা, গামছা পরিহিত মূর্তি দেখে, উনিই ব্যাণ্ডেড দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ওনার গাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ড্রাইভার ডাকতে বলে, আমার খোঁজে এসেছিলেন। ভদ্রমহিলা পড়ে যাওয়া থেকে, গাড়ীতে রওনা হওয়া পর্যন্ত অন্তত মিনিট কুড়ি নিশ্চয়ই লেগেছে। এটুকু সময় ওনার স্বামীর শিয়ালদা থেকে আসতে লাগার কথা।

আমার উপরের ভদ্রলোক বোধহয় গতকাল দুপুরে আর স্নান করতে পারেন নি। বাড়ী ফিরে দুপুরের খাবার খেতে সাড়ে চারটা বেজেছে। মনে পড়ল তিরিশ বত্রিশ বছর আগের কথা। এক সকালে গাড়ী চালিয়ে চেম্বারে যাচ্ছিলাম। আমার

চেম্বারের ঠিক উল্টো দিকের বাড়ীতে থাকত আমার কলেজের এক ভাই। গলিতে ঢোকার সময়ই দেখেছি, ওদের দরজার বাইরে একটা জটলা। আমি পৌঁছতেই ঐ ডাক্তার ভাই ছুটে এসে বলল, দাদা, আমার শ্বাশুড়ি মা পুড়ে গেছেন, তোমার গাড়ীতে একটু হাসপাতাল এ নিয়ে চল। আমার ছোট্ট প্রিমিয়ার পদ্মিনী গাড়ীতে কোন রকমে তোলা হল , পুড়ে যাওয়া ভদ্র মহিলাকে। আমি নিজেই গাড়ী চালাতাম তখন। সামনের সিটে ঐ ভাই আর ওর শ্বশুর মশাই বসেছিলেন সম্ভবত। এতদিন পরে সে সব আর মনে নেই। প্রায় নব্বই শতাংশ পুড়ে যাওয়া ভদ্র মহিলা বিকেলেই মারা গেলেন। আমার গাড়ীতে ওনার পোড়া চামড়ার কয়েকটি টুকরো পেয়েছিলাম, দুপুরে বাড়ী ফিরে। পরিষ্কার করতে দশ মিনিট সময় লেগেছিল। এ ছাড়া আর ভালো মন্দ কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু ভদ্র মহিলা মারা গেছেন জানার পর, আমার কিছু হিতাকাঙ্খী (বিদ্যাসাগরের মেদিনীপুরের) বলেছিলেন, এসব রুগী গাড়ীতে নিয়ে না গেলেই ভালো করতেন। এবার থানা পুলিশের ঝামেলা হবে। না, কিছুই হয়নি। গতকাল বিকেলে মনে হচ্ছিল, আমার উপরের ঐ ভদ্রলোক কি আর এক " নবকুমার?" যাঁরা চিরকালই বলে এসেছেন, " তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?" ২০.১১.২৪.

দিদা কুকুরের দীর্ঘ জীবন

আমার এই লেখাটা ঐ দিদা কুকুরের কথা বলতে, না কি, মানুষের দীর্ঘ জীবন নিয়ে , এখনই বলতে পারছি না। আমরা বছর ছয় সাত হল ভোরে উঠে, পাড়ার মধ্যেই হেঁটে ঘুরে আসি, মিনিট পঞ্চাশ হবে। যে রাস্তায় আমরা হাঁটি, সেটা এক দেড় কিমি হবে। মোটামুটি দুই পাক হলে, বাড়ী ফিরে আসি। এই রাস্তায় অন্তত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি কুকুরের সাথে আমাদের দেখা হয়। কেউ একাই থাকে। আবার কোন কোন দলে চার পাঁচ জনও। আমাদের সাথে ওদের বেশ আলাপ হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন আমাদের ধমক দিয়ে " ঘেউ" পর্যন্ত করেনি। কেউ কেউ তো আমাদের একেবারে পোষা মনে হবে। ওর নির্দিষ্ট এলাকায় পরপর দু তিন দিন ওকে না দেখলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়; কালোটা আবার কোথায় গেল? কিংবা সাদা বুড়িটা কি অসুস্থ হল না কি? আজ লেজবাকাটা সামনে এল না কেন? এই রকম, ওরা আমাদের একরকম প্রতিবেশী। অনেকের ধারণা, কুকুরেরা শুধু খাওয়ার পেলেই লেজ নাড়ে; কিংবা শুধু খাওয়ার পাওয়ার জন্যই মানুষের কাছে আসে। একেবারেই ভুল ধারণা। আমাদের সাথে ঐ দেড় কিমি মত রাস্তা একবার হেঁটে দেখলেই আমার এই সিদ্ধান্ত কেন , পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। আমরা প্রায় প্রথম দু বছর, হাঁটার সময় কোন খাওয়ার নিয়ে বের হতাম না। একটা ছোট্ট চেহারার কালো মত কুকুর ছিল, আমাদের দেখলেই ছুটে কাছে আসতো। হয়তো রাস্তা থেকে একটু ভেতরে কোথাও ঘুমিয়ে ছিল; আমরা ওর এলাকা পেরিয়ে যাওয়ার পর, পিছন থেকে ছুট্টে এসে এমন ভাব করতো, যেন বলতে চাইতো, কেমন? ধরে ফেললাম তো! আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছিলে তো বেশ? একবার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে দিলেই খুব খুশী। ওর এসব ছেলে মানুষি দেখে, আমার স্ত্রী বলল, ওর জন্য একটা বিস্কুট আনতে হবে। সেই থেকেই, হাঁটতে বেরোনোর সময়, পকেটে একটাই বিস্কুট নিয়ে বের হওয়া শুরু। তিন বছরের বেশী হল, এই অভ্যেস। এখন কোনদিন, কোন কারণে বিস্কুট নিতে ভুলে গেলে, নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। মানুষের অত্যাচারে , এক কালী পূজার রাত্রে সেই ছোট্ট মনাটা পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। এই পাড়া ছেড়ে যাওয়ার ব্যপারটা আমরা কয়েক বছর ধরেই লক্ষ করেছি। এই কালী পূজার দিনটি ওদের কাছে বিভীষিকার মত। ওদের নিজের নিজের এলাকায় বাজীর অত্যাচারে অনেকেই এদিকে ওদিকে দৌড় দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। তাই করতে গিয়ে দু'চারজন আর পুরনো পাড়ায় ফিরতেই পারে না। আমাদের ঐ মনা কুকুরটি তার আগের বছরেও এভাবে পাড়া ছেড়ে গেছল। প্রায় মাসখানেক আমরা ওকে না দেখে যখন ধরে নিয়েছি যে, ওটা বোধহয় মরে ধরে গেছে, হঠাৎ একদিন সকালে এসে হাজির। প্রবল লেজ নাড়ার সাথে মুখে অদ্ভুত কুঁই কুঁই একটা শব্দ করে বোঝাতে চেয়েছে, নিজের জায়গায় , আপনজনদের পেয়ে খুব খুশী হয়েছে। এরকম যে তিনচারজন আমাদের একেবারেই নিজের লোক মনে করে, তাদের নিয়ে একটা সমস্যা আছে। বেশী খুশী হলে , সামনের দুই পা আমার পেটে উঠিয়ে আমার মুখের কাছে আসতে চায়। শুকনোর দিনে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হল রাস্তায় কাদা থাকলে; আমার প্যান্ট জামায় ওদের থাবার দাগ পড়ে যায়। এবার বলি ঐ একটি মাত্র বিস্কুটের কথা। আগেই বলেছি, আমাদের প্রতিবেশী এই বিশেষ প্রানীদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশজন। তাহলে মাত্র একটি বিস্কুট দিয়ে কি হবে? আসলে ওদের এই বিস্কুটের উপর কোন আগ্রহই নেই। এখনও এক এক দিন অর্ধেকটা বিস্কুট পকেটেই থেকে যায়। সেই মনা কুকুরটি চলে যাওয়ার পর আর এক জায়গায় দু একজনও আমাদের দেওয়া বিস্কুট খেয়েছে। এরা দলে তিনজন ছিল। সবথেকে ছোট, আর সেটাই বয়সেও ছোট ছিল , লালচে বাদামী আর কালো মেশানো সুন্দর একটি রং ছিল ওটার। লেজ এতোই বাঁকানো ছিল যে , লেজ নাড়তে পারত না। কিন্তু খুশীর প্রকাশ করতে চাইলে গোটা কোমর সহ শরীরটাকে সুন্দর করে নাচাত। প্রথম দিকে এই বাঁকা লেজের ছোটটাই আমাদের দেখে আগে ছুটে আসতো। পরে পরে দলের সবাই মিলে এসে , আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেত। সবথেকে জওয়ান ছেলেটা কালো রঙের ছিল। আর ছিল, সাদা রঙের দিদা কুকুরটি। প্রায় আমাদের পাড়ার মধ্যেই একটি সুন্দর করে বাঁধানো পুকুর আছে। এদের তিনজনের এলাকা ছিল ঐ পুকুরের চার ধার। একটি বিস্কুটই ভেঙ্গে তিনজনকে দিয়েছি, এরকম হয়েছে অনেকদিন। সবদিন তিনজনই এক সাথে আসত এমন কোন কথা ছিল না। দুজন আগে এসেছে, আর একজন কোথায় লুকিয়ে আছে দেখতেই পেলাম না, এমনও হয়েছে। প্রায় মাস ছয়েক, বড় দুজন একটু ভেতরে একটি বাড়ির দরজার বাইরে ঘুমিয়ে থাকত। আমরা রাস্তা থেকে ওদের ডেকে আনতাম। তার আগেই , কদিন ধরে খুব রোগা হতে হতে , সবথেকে ছোটজনই সবার আগে চলে গেল। ওকে অসুস্থ হয়ে রাস্তার পাশে শুয়ে থাকতে দেখতাম। কি অসুখ হয়েছিল, জানিনা। হয়তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে, আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারত। আমাদের সাথে কয়েক বছর এর পরিচয় হলেও, একটা রাস্তার কুকুরকে তুলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার মত মহত্ব দেখাতে পারিনি। মাসখানেক আগে , সবথেকে জোয়ান কালো কুকুরটাও হঠাতই উধাও হয়ে গেল। কোমরের ডান দিকে একটা গভীর ক্ষত চিহ্ন নিয়ে ঘুরছিল কদিন। কিন্তু ছোটটার মতো রাস্তার পাশে শুয়ে থাকতে দেখিনি। এখন আছে শুধু বেশ বয়স্ক, সাদা রঙের দিদা কুকুরটি। একে প্রায় বছর তিনেক থেকেই এরকম রুগ্ন, ঘাড় কাত করে একটু ধীরে ধীরে চলতে দেখছি। ওদের পারিবারিক কোন সম্পর্ক ছিল কি না, আমরা জানিনা। কিন্তু সাদাটা ছোট্টটার থেকে বয়সে এতটাই বেশি মনে হত যে,

ওটাকে আমি ছোটটার দিদা বা ঠাকুমা বলে মনে করি। ওর থেকে বয়সে এত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে চলে গেল। ওর এই কর্মফল ভোগ আর কতদিন চলবে, জানিনা।
এই কর্মফল ভোগ ব্যাপারটি কিন্তু সম্পূর্ন হিন্দু দর্শনের ব্যাপার। পুনর্জন্ম আর প্রারব্ধ ফল এই জিনিস দুটি শুধুই হিন্দু দর্শনে আছে। মিশনের শ্রদ্ধেয় মহারাজ সমর্পনানন্দ ওনার ইউটিউবে বলা একটি ক্লাশে একটি ঘটনার কথা বলেছেন। হরিদ্বার আশ্রমে একটি পোষা কুকুর ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যা আরতীর সময়, ঐ পোষা কুকুরটি একমনে বসে আরতী দেখত। একবার মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ ওখানে গেছেন; ঐ কুকুরটিকে ওভাবে বসে আরতী দেখতে দেখে, মহারাজ বেশ খুশী হলেন। ওর মাথায় হাত দিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলেন, বাঃ, তুমিও আরতী দেখছ! কুকুরটি কি বুঝল, ঘ্যাক করে মহারাজের হাত কামড়ে দিল। এই ঘটনাকে , আমাদের কাছে একটি জন্মান্তরবাদের উদাহরণ হিসেবে বোঝালেন, মহারাজ। কে জানে, হয়তো কোন শাপগ্রস্ত মহাত্মা, এ জন্মে কুকুর হয়ে জন্মেছেন। ওর কর্মফল ওকে দিয়ে এমন একটি অনভিপ্রেত কাজ করালো। সত্যি বলতে কি, মহারাজের ক্লাশে ঐ কুকুর এর জন্মান্তরের কথা শোনার পর থেকেই আমি , এই রকম রাস্তার কুকুরদের দেখলে ভাবি, উনি আগের জন্মে কে বা কি ছিলেন। আজ যদি ওনাকে মনুষ্যেতর প্রাণী বলে ওনার ওপর কোন অন্যায় অত্যাচার করি , পরের জন্মে উনিই হয়তো মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে, আমার অধোযোণী প্রাপ্ত জীবনে সেই অত্যাচার ফিরিয়ে দেবেন। এই চিন্তাটিকে আরও দৃঢ় করেছে, রামায়ণ এর এক কুকুরের কাহিনী। সে কথা অন্যত্র লিখেছি। সংক্ষেপে ব্যাপারটি হল, একজন ব্রাহ্মণ অন্যায় ভাবে এক পথ কুকুরকে আঘাত করেছিলেন। সেই কুকুর প্রজাবৎসল রাজা রামচন্দ্রের কাছে বিচার চাইতে এসেছিলেন। বিচারে ব্রাহ্মণ দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে কি সাজা দেওয়া যায়, সেই কুকুরকেই জিজ্ঞেশ করেন রাজা রামচন্দ্র। কুকুর এক অদ্ভুত সাজার কথা বলেন। ঐ ব্রাহ্মণকে কোন এক সংস্থার প্রধান করে দিতে বলেন। আসলে ঐ সংস্থা বা আশ্রমের প্রধান হয়ে, পূর্ব জন্মে, কিছু অন্যায় করেছিলেন , এই কুকুর। তাই তাঁর অধোগতি হয়েছে।
আমি বহু বছর আগে থেকেই, অতি বৃদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকা ব্যাপারটিকে , ভীষণ একটা শাস্তি মনে করি। শুধু মনে করাই নয়, এটা আমার প্রায় ধর্ম বিশ্বাসের মত। জানিনা এই দিদা কুকুরটির এই দীর্ঘ জীবন এর শাস্তি ভোগ , পূর্ব জন্মে করে থাকা কোন পাপের ফল কি না! অতি বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যতোটা না শারীরিক কষ্টে ভোগে , তারথেকে অনেক বেশি কষ্ট পায় মানসিক ভাবে। শুধুই নতুন প্রজন্মের অবহেলা নয়, বয়সে অনেক ছোট প্রিয়জন এক এক করে পরলোকে চলে যেতে থাকে; এটাই তো একটা বিরাট শাস্তি। এরপর আছে, পিতামহ ভীষ্মের মত দীর্ঘ জীবন ধরে বেঁচে থেকে, চোখের সামনে সব রকম অন্যায় দেখেও চুপ করে থাকার শাস্তি। এই মানসিক শাস্তি ভোগ থেকে নিজের মা, রাজমাতা সত্যবতীকে বনবাসে নিয়ে গেছেলন, তৃকালদর্শি ব্যাসদেব। উনি সেই সময়, মাকে যে শ্লোকটি বলেছিলেন, সেটি মহাভারতের একটি বিখ্যাত উক্তি। “ অতিক্রান্তা সুখা কালা, পৃথিবী গতযৌবনা!” মাগো, সুখের দিন শেষ, পৃথিবী আমাদের কাছে পুরনো হয়ে গেছে। আমাদের দিদা কুকুরের মুখের কাছে অর্ধেক বিস্কুট ধরলে, আস্তে করে মুখে নিয়ে , সময় ধরে খেতে থাকে। কোন সময় হাত থেকে বিস্কুট মাটিতে পড়ে গেলে, বেশ কষ্ট করেই মাটি থেকে মুখে তুলতে দেখি ওকে। হে ঈশ্বর, অন্য কেউ আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে, সেরকম চরম শাস্তি ভোগ করতে যেন না হয় আমাকে। ১২.১১.২০২৪.

দৃশ্য দূষণের ইতিহাস

পরিবেশ দূষণ, জল দূষণ, শব্দ দূষণের মত , দৃশ্য দূষণ কথাটাও আজকাল বেশ শোনা যায়। গত পরশু দিন মহামান্য কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় একটি আদেশে, বিধাননগর পৌর এলাকার তিনশ এর উপর বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং দু দিনের মধ্যে সরিয়ে দিতে বলেছেন। এই হোর্ডিং লাগানো নিয়েই কতো কেলেঙ্কারি আমরা আগেও শুনেছি। এমনকি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং আড়াল করে বলে, শহর আর শহরতলীর বিরাট বিরাট মহীরুহ মেরে ফেলা হয়েছে, এমন খবরও আমরা শুনেছি। দৃশ্যও দূষিত হতে পারে, এই চিন্তাটা আমাদের মাথায় খুব বেশিদিন আসেনি। আমার যতোটা মনে পড়ে, ডাক্তারী পড়ার সময়, আমাদের " Preventive and Social Medicine" নামে যে বিষয়ে পড়ানো হত (বর্তমানে সেই বিষয়ের নতুন নাম হয়েছে, কমিউনিটি মেডিসিন), সেখানে পরিবেশ দূষণ, জল দূষণ, এমনকি শব্দ দূষণ নিয়ে আলোচনা থাকলেও, দৃশ্য দূষণ নিয়ে আমরা তখন (১৯৮০ এর দশকে) পড়িনি।

এই যে চোখে খারাপ দৃশ্য দেখা, এর গভীর অভিঘাত পড়ে আমাদের মনে। যদি একেবারে চরম একটা খারাপ দৃশ্যের কথা দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যায়, তাহলে বোধহয় বুঝতে সুবিধা হবে। কোন শিশু যদি চোখের সামনে তার মা কিংবা বাবাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করছে দেখে? তার মনে আজীবন কেমন স্মৃতি থেকে যাবে? এতোটা চরম দৃশ্য তো দিন দিন চোখে পড়ে না। একটু একটু করেই দূষণের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর পড়ে। পরিবেশ দূষণ এর ফলে কত যে রোগ দিন দিন বেড়েই চলেছে। জল দূষণের জন্য নানান জল বাহিত রোগ যেমন আন্ত্রিক রোগ, কলেরা, টাইফয়েড, এমনকি জন্ডিস হয়ে থাকে। শব্দ দূষণ আমাদের কানের শ্রবণ ক্ষমতা শুধু কমায় তাই না, একটু পরোক্ষ ভাবে হলেও হার্টের রোগ, মাথার যন্ত্রণা, এমনকি কিছু মানসিক সমস্যাও বাড়িয়ে দেয়। আধুনিক ভাবনায় আমরা সাধারনত শরীরের অসুখ নিয়েই বেশি চিন্তিত। কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় মানুষের আত্মিক উন্নতির কথাই বেশী ভাবা হয়েছে।

তিনটি মহান (wise) বাঁদরের কাহিনী আমরা সবাই জানি। ওনারা একজন চোখে দু'হাত দিয়ে ঢাকা দিয়ে দুই চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। আর একজন দুই কান দুই হাতে চেপে বন্ধ করে রেখেছেন। আর একজন নিজের মুখ হাত দিয়ে বন্ধ করেছেন। যথাক্রমে এনাদের নাম, মি - জারু, কিকা - জারু আর আইয়া - জ্বারু। এগুলি জাপানী ভাষার কথা। মানে বোঝায়, দেখব না, শুনব না আর বলব না। তাহলে কি অন্ধ, কালা, বোবা হয়ে থাকতে বলা হয়েছে? না, বলা হয়েছে, খারাপ জিনিস দেখব না, খারাপ কথা শুনবো না, আর বাজে কথা বলবো না। এটা চার পাঁচ শত বছর আগের, জাপানী তত্ব কথা। ইন্টারনেটে খুঁজে পেলাম, এই জাপানী শাস্ত্রকথা ষোড়শ শতাব্দীর (16th Century)। বেশ পুরাতন মনে হচ্ছে। আসলে কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য অর্থাৎ বেদ উপনিষদ এর তুলনায় খুবই নতুন। এই দৃশ্য দূষণ নিয়ে উপনিষদের একটি সুন্দর শ্লোকের আলোচনা শুনেছি, রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় মহারাজ ঈশাত্মানন্দজীর ইউটিউব বক্তৃতায়। কানে শুনেছি, তাই পুরো সংস্কৃত শ্লোকটি আমার মনে নেই। শ্লোকটির মধ্যে কয়েকটি শব্দের ধ্বনি মাধুর্যের জন্যই বেশ আকর্ষণীয় লাগে। যতদূর মনে পড়ে, " মীন, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, ভৃঙ্গ " এরকম ভাবে সাজানো শব্দগুলি।

শ্রদ্ধেয় মহারাজ কিন্তু একবারও এই " শব্দ দূষণ" বাক্যগুলি বলেননি। উনি শাস্ত্রজ্ঞ সন্যাসী। প্রাচীণ ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমাদের " আহার" নিয়ে যে ব্যাপক ভুল ধারণা আছে, তাই নিয়ে বলেছিলেন। এই সময় বলে রাখি, জাপানী তত্ব কথায়, মুখ বন্ধ করে রাখতে বলা হয়েছে, শুধু বাজে কথা না বলতে। আমাদের মুখের আর একটা জরুরি কাজও তো আছে। আমরা মুখ দিয়ে খাদ্য খাই। প্রাণ ধারণ করতে খাদ্য খেতেও হয়। সাধারণ মানুষের কাছে আহার মানে এই খাদ্য খাওয়া। কিন্তু মহারাজ বুঝিয়েছেন, শুধু মুখ দিয়ে নয়, মানুষ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা কিছু " আহরণ করে" সবই আহার।

আহার নিয়ে আজকের পৃথিবীতে বিশাল বিতর্ক। আমিষ আহার না নিরামিষ আহার? সে এক বিরাট সমস্যা। সত্যিই কি তাই? মহারাজের যুক্তিতে, আতপ চাল সেদ্ধ, একটু ঘী আর আলু সেদ্ধ দিয়ে খেয়ে ভাবছি, আমি স্বত্তিক আহার করলাম। এদিকে মনে হাজার কুটিল চিন্তা, একে মারবো, তার কি ক্ষতি করতে পারি, এই নিয়ে সারাক্ষণ ভাবছি। সে আহার আদৌ কোন কাজে লাগবে না। মনটাকে শুদ্ধ করে রাখতে হবে। তার জন্যই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আতপ চালের ভাত খেয়ে বসে গেলাম হিন্দি সিনেমার মারামারি কাটাকাটি দেখতে! তাতে মন শুদ্ধ হবে কি? মানুষের বিরাট সমস্যা। ঈশ্বর মানুষকে বাইরের পৃথিবী থেকে নানান জিনিস আহরণের জন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েছেন। মিন অর্থাৎ মাছ, মাত্র একটি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে মরে। তার যতো দুর্বলতা খাওয়ার দেখলে। টোপ দেখলেই গিলে মরে। আমরা মুখ দিয়ে যে খাদ্য খাই, জিহ্বা তার স্বাদ নেয়, ভালো স্বাদ হলে আরো আরো খেতে ইচ্ছা করে। যে কোন খাওয়ার অতিরিক্ত খাওয়া শরীরের জন্য খারাপ, এটা আজকাল সকলেই জানে। কুরঙ্গ বা হরিণ সুরের টানে এগিয়ে আসে ব্যাধের কাছে। মাতঙ্গ অর্থাৎ হাতি স্পর্শ সুখের জন্য পোষা কুনকি হাতির সাথে সাথে জঙ্গলে পাতা ফাঁদে আটকা পড়ে। ভ্রমর বা পতঙ্গের দুর্বলতা সুন্দরের প্রতি। আগুনকেও সুন্দর দেখে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পতঙ্গ। মানুষ এই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা আর ত্বক পাঁচ

ইন্দ্রয় নিয়েই জন্মায়। এই পাঁচটিকে নিয়ন্ত্রণ কি সোজা ব্যাপার? তার উপর আছে আমাদের মন। সে তো এক বিরাট সমস্যা! এই পাঁচ ইন্দ্রিয় যা কিছু আহরণ করে, সবই তো শেষ পর্যন্ত মনের কাছে গিয়ে হাজির হয়। ওরে বাবা, শুরু করলো দৃশ্য দূষণ দিয়ে; আর এনে ফেলল গভীর জীবন দর্শন এর খাদে। না, সেরকম বদ মতলব লেখার শুরুতে ছিল না। ফুল চন্দন ঘাঁটতে ঘাঁটতে হাতে একটু সুগন্ধ তো লেগেই যায়।
মহাভারতে কত আধুনিক পরিবেশ ভাবনার কথা আছে, আগে কোথাও লিখেছি। এখানে একটু আভাস দিয়ে রাখি। বনবাসের সময় এক বনে কয়েক মাস থাকার সময়, ভীম অর্জুন শিকার করতে করতে বনের হরিণ প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। সে সময় এক জ্ঞানী হরিণ এসে যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়েছিলেন , এক বনে লাগাতার বহুদিন থাকার বিপদ। যুধিষ্ঠির সহজেই বুঝে যান। সেই থেকে বনবাসের সময় পাণ্ডবরা বনে বনে ঘুরে ঘুরে থেকেছেন। কুরুক্ষেত্রের মহা যুদ্ধের আগে, মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, তুমি যদি নিজের চোখে এই যুদ্ধ দেখতে চাও আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দিচ্ছি। মহাজ্ঞানী ধৃতরাষ্ট্রে রাজী হলেন না। অন্ধ মানুষ চোখে দেখার সুযোগ পেলে তো হাতে স্বর্গ পেয়েছে ভাবার কথা। কিন্তু উনি ঠিকই বুঝেছিলেন, আগত মহা যুদ্ধ যে বিরাট বিভৎস দৃশ্য দূষণ সৃষ্টি করবে তা দেখার থেকে অন্ধ থাকাই ভালো।
আগের নিবন্ধে লিখেছি, গয়া শহরের নোংরা পথ ঘাট, এবড়ো খেবড়ো সিমেন্ট বাঁধানো মন্দির চত্বর, ঐ তীর্থ স্থান সম্বন্ধে আমার মনে এতটুকু শ্রদ্ধা জাগাতে পারেনি। দাশগুপ্তবাবুও জানিয়েছেন, গয়া ওনার মনে শ্রদ্ধা জাগাতে পারেনি। কিন্তু উনি স্বর্ণ মন্দির দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সাধু সন্তেরা দূর্গম হিমালয়ের গুহায় বসে জীবন কাটাতে চাইতেন কেন? পরিবেশ দূষণ, শব্দ দূষণ আর দৃশ্য দূষণ থেকে দূরে সরে থেকে, মনকে প্রফুল্ল রেখে, একাগ্র চিত্তে স্মরণ মনন করার জন্যেই ওনারা এত কৃচ্ছ সাধন করতেন। আমরা চরম দূষিত পরিবেশে, দূষিত খাদ্য আহার করে, পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সের পর রোগে ভুগে ভুগে আশির আগে মরে যেতে পারলে বেঁচে যাই। তাই ওনারা কেউ কেউ তিনশ চারশ বছর বেঁচে থেকে তপস্যা করছেন শুনলে, গালগল্প ভাবি। ২৩.১১.২৪.

ধর্ম সংকট ও পরোপকার

একজন মহারাজ মহাভারত পাঠের সময় এথিক্যাল ডাইলেমা বা ধর্ম সংকট নিয়ে বলছিলেন। প্রসঙ্গটি এসেছিল নহুষ যুধিষ্ঠির কথার সময়। মহারাজ একটি বিদেশী ঘটনার কথা বলেছেন । কোথায় শুনেছেন, বা পড়েছেন, মনে করতে পারেননি।

ঘটনাটি এরকম; এক উচ্চ পদস্থ মহিলা একদিন রেস্তোরায় ঢুকতে গিয়ে দেখেন, একটি ভিখারিকে রেস্তোরার দারোয়ান অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। ভদ্র মহিলা ভিখারী টিকে চিনতে পারেন। নিজের দায়িত্বে ভিখারীকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। এরপর মহিলা ঐ ভিখারী কে জানান যে দশ বছর আগে একদিন ঐ ভিখারী এই ভদ্র মহিলার উপকার করেছিলেন। সেদিন এই মহিলা বেকার ছিলেন, এক দেড় দিন না খেয়ে ছিলেন, একটি চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে ক্ষিদায় মাথা ঘুরছিল। একটি রেস্তোরায় ঢুকে এক কর্মচারীকে নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে কিছু খাওয়াতে অনুরোধ করেন। ঐ কর্মচারী লুকিয়ে একটি বার্গার খাইয়েছিলেন এই মহিলাকে। সেই কর্মচারী আজকের এই ভিখারী। সম্ভবত ঐ রকম পরোপকারের বাতিকের জন্য তার চাকরী চলে যায়। এরপর মহারাজ জানিয়েছেন, খুব একটা জোর দিয়ে কিন্তু বলেননি, এই ভদ্র মহিলা ঐ ভিখারীর কোন কাজের ব্যবস্থা করে দেন।

আমার এক প্রিয়জনকে আজও দেখছি, এই পরোপকারের বতিকের জন্য স্ত্রী কন্যা ছেড়ে চলে গেছেন। এর একটি মাথা গোঁজার ফ্ল্যাট আছে, তাই ঐ বিদেশীর মত ভিখারী হয়ে যাননি। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে বেশ বিপাকেই আছেন।

পুনশ্চ: এই লেখাটি লেখার বছর দুই পরে, আমার ঐ দাদা অত্যন্ত অনভিপ্রেত পরিবেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমিও ওর বদান্যতায় আজ নিজেকে ডাক্তার হিসেবে সমাজে দেখতে পাচ্ছি। দাদার শেষ পরিণতি আমার জীবনে একটি জঘন্যতম ব্যর্থতা। সে কথা সভ্য সমাজে বলার মত নয়।

২৪ না ৩২?

পৃথিবীর প্রথম এটম বোম পরীক্ষার পরই , সেই বিস্ফোরণ এর প্রবল অভিঘাত লক্ষ করে মহাবিজ্ঞানী ওপেনহাইমার একটি কবিতার মত শ্লোক আবৃত্তি করেন। পাশে থাকা বিজ্ঞানী তাঁকে জানতে চান, ওটা কি গ্রীক কবিতার লাইন বললেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, না , সংস্কৃত! নারায়ণ সান্যাল মশাই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস , বিশ্বাসঘাতক এ এখানে একটি " নাকি" ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সান্যাল মশাই এর মতে, " ওপেনহেইমার সাহেব নাকি গীতার একটি শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন।" সান্যাল মশাই এর ডজন খানেক বই পড়ে এটুকু বুঝেছি, উনি ব্যাপক গবেষণা না করে কোন তথ্য কোথাও লেখেন না। যেমন, নেতাজী রহস্য সন্ধানে বইতে, নেতাজীর বিবাহ, স্ত্রী কন্যা নিয়ে একটি কথাও লেখেনি। তার " কৈফিয়ৎ" এ লিখেছেন, এ নিয়ে কোথাও কোন প্রমান পাননি, তাই কিছুই লেখেননি। সে যাই হোক, বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার হয়তো সেই অভূতপূর্ব, মহা বিস্ময়কর বিস্ফোরণের প্রচণ্ড অভিঘাত বর্ণনার জন্য কিছু একটা আবৃত্তি করেছিলেন। আমার সীমাবদ্ধতার কথা আগেও অনেক বার লিখেছি; আমি এই সমস্ত সাহিত্যের বই বেশ দেরি করে পড়তে শুরু করেছিলাম, পঞ্চাশ বছর বয়সের পর। আমার প্রিয় ডাক্তার ভাই গোপীনাথ এই বই পড়েছে স্কুলে পড়ার সময়। অনেক বছর আগে গোপী এই প্রসঙ্গে বলেছিল, ওপেনহাইমার গীতার শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন। খবরটা একজন ভারতীয় হিসেবে অবশ্যই শ্লাঘার। সান্যাল মশাই এর বই পড়ার বেশ কয়েক বছর পরে, রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় মহারাজদের ভাষণে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ শুনেছি।

"কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥"

গীতার একাদশ অধ্যায় এর এই বত্রিশ নম্বর শ্লোকের আলোচনার সময় , একজন মহারাজ এই বিজ্ঞানীর শ্লোক আবৃত্তি করার কথাটা বলেছেন।

সান্যাল মশাই তাঁর বইতে কিন্তু অন্য শ্লোকের কথা লিখেছেন,

"নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥২৪॥"

অর্থাৎ, গীতার একাদশ অধ্যায় এর চব্বিশ নং শ্লোক।

আমার বিভ্রান্তি দূর করতে Meta AI search করে দেখলাম, ৩২ নং শ্লোকের কথা লিখেছে। এবার সোজা বাংলায় এই দুটি শ্লোকের মানে কি দেখা যাক। ২৪ নং শ্লোকের মানে দাঁড়ায়, " তোমার আকাশস্পর্শী, তেজময়, বিবিধ বর্ণযুক্ত, বিস্তৃত মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল আয়ত চক্ষুবিশিষ্ট তোমাকে দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য ও শম অবলম্বন করতে পারছি না।"

আর ৩২নং শ্লোকের মানে দাঁড়ায়, "(শ্রীভগবান বললেন)- আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এই সমস্ত লোক সংহার করতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমরা (পাণ্ডবেরা) ছাড়া উভয় পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধারাই নিহত হবে।"

তাহলে বিজ্ঞানী কোন শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন? নিউ মেক্সিকোর মরুভূমির মধ্যে যেখানে পরমাণু বোমাটি পরীক্ষার জন্যে রাখা হয়েছিল, তার থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে ছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানতেন কী ভীষণ ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। একটু মাটির গর্তে, কানে তুলো দিয়ে, বিশেষ ভাবে তৈরী গগলস চোখে দিয়ে, তাঁরা সকলে শুয়ে ছিলেন। কয়েক মিনিট আগে থেকে কাউন্ট ডাউন শুরু হয়। মাত্র তিন সেকেন্ড বাকী থাকতে, বিজ্ঞানী ফাইনম্যান উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান। পরে উনি সেই মহা বিস্ময়কর বিস্ফোরণের বর্ণনা দিয়েছেন। চোখ বন্ধ আর গগলস এর নীচে থাকলেও, " সহস্র সূর্যের" আলোর মত উজ্জ্বল সাদা আলো ওনার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মাথা আর চোখে যন্ত্রণা শুরু হয়। সাদা আলোর ঝলকানি একটু কমলে উনি চোখ খুলে দেখেন, একটা কমলা রঙের ধোঁয়া আকাশে উঠে যাচ্ছে। সেই কমলা রঙের ধোঁয়া একটা সিঁদুরে রঙের আগুনে ঘেরা। এই বর্ণনার সাথে ২৪ নং শ্লোকের বর্ণনার মিল পাওয়া যায়। ওদিকে ৩২নং শ্লোকের একটা অদ্ভুত ইংরেজী অনুবাদ আছে , " I am become death, destroyer of worlds!" পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে যে ব্যাপক ধ্বংসের কথা বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার জানতেন, সেটা প্রত্যক্ষ করেই উনি ঐ মহাকালের কথা বলেছিলেন।

এবার আসি আমার মূল খটকার কথায়। বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার কি সংস্কৃতে শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন? উনি একটি বিজাতীয় ভাষায় আবৃত্তি করেছিলেন এটা বোঝা যায়,পাশের বিজ্ঞানীর প্রশ্ন থেকে। কিন্তু ভাষাটি কি ছিল? একজন মহারাজ বলেছেন, মূল সংস্কৃতে নয়, সম্ভবত জার্মান বা ঐরকম কোন ভাষায় অনুবাদ থেকে আবৃত্তি করেছিলেন। মহারাজের আর একটা কথা ঠিক বুঝলাম না। উনি বলছেন, হাজার সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল, কিন্তু চোখ ঝলসে যায় না। ওদিকে শ্রেষ্ঠতম ভক্ত অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভগবানের ভয়ংকর বিশ্বরূপ সম্বরণ করার জন্য স্তুতি শুরু করেছিলেন। দিনের বেলা একটি সূর্যের দিকেই সরাসরি তাকানো যায় না, হাজার সূর্যের জ্যোতি চোখ ধাঁধানো হবেনা কেন? ২৭.৯.২৪

Clean shaved সান্তা
ভোরে হাঁটতে বেরিয়ে রাস্তায় একটা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেলাম। আমার সংস্কার মতে, সাধারণত টাকা পড়ে থাকতে দেখলে কুড়াই না। আজ কি মনে হল, তুলে নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, কোথায় ভিখারি পাওয়া যাবে। আজ সবার ছুটির দিন হলেও আমাকে কাজে বেরোতে হবে। স্টেশন এ নিশ্চয়ই ভিখারি পাবো, এই ভেবে সোয়েটারের পকেটে ওটা নিয়ে বেরোলাম। দমদম স্টেশন এ নিচে না নামলে ভিখারি দেখা যায় না সাধারণত। ট্রেনও এসে গেল। চলে এলাম শিয়ালদা। শিয়ালদা স্টেশন টুরিষ্ট এর ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি অবস্থা। @(দয়াল) হাতে সময় ছিল, ভিড় কাটিয়ে একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওদিকে ও ভালোই লোক চলাচল আছে। তার মধ্যেই ভিখারি খুঁজতে খুঁজতে সাউথ স্টেশন এর দিকে এগোলাম। দু তিনজন এখনও নোংরা কম্বল গায়ে ঘুমাচ্ছে। ডেকে জাগিয়ে ভিক্ষা দেওয়ার বুদ্ধিটা ভালো মনে হল না। কিছুটা এগিয়ে, ভিড়ের রাস্তা থেকে সরে , এক বুড়িমা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে দেখে এগিয়ে গেলাম। ওর কম্বলটা আবার একটু কম নোংরা দেখে একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি একটা টাকা নেবে? ধীরে সুস্থে কম্বল থেকে হাতটা বের করতে টাকাটা ওর হাতে দিয়ে দায় মুক্ত হলাম।
ওর কাছে কি অযাচিত এই লোকটা আজ সান্তা ক্লজ হয়ে এসেছিল! এরকম একটি অভাজন অবিশ্বাসী লোককে দিয়েই কি সান্তা ক্লজ তাঁর কাজ করিয়ে নিলেন? (২৫.১২.২০২৩)

এক ডাকাতির গল্প

আমার বন্ধু সেই ভোলাদার কথা বলতে গেলে একটা বই লেখা যায়। আগে সংক্ষেপে ওনার কথা কিছু লিখেছি। ওনার সেই পঞ্চায়েতির গল্প। সেই রকম এক মোষ তাড়ানোর কাজে গেছলাম, আমরা দুজন। ওনার স্কুটার নিয়ে। বিকেলের দিকে ফিরছিলাম, কেশপুরের দিক থেকে মেদিনীপুর শহরে। মাঝে একটা বাজার মত আছে, জামতলা। ওখান থেকে গ্রামের ভেতরে একটা মোরাম রাস্তা চলে গেছে। মাইল খানেক ভেতরে আমার দিদির বাড়ী। কিছুটা আগে ওনাকে বললাম, এই গ্রামের ভেতরে আমার দিদির বাড়ী। শুনে কেমন যেন একটু অবাক হলেন। আসলে সেই গ্রামের একটা বদনাম আছে। আমি হালকা আগ্রহ প্রকাশ করতেই উনি সেই মোরাম রাস্তায় স্কুটার নিয়ে ঢুকে পড়লেন। সরাসরি স্কুটার নিয়ে দিদির বাড়ী যেতে হলে একটু ঘুরে যেতে হয়। আমরা খেলার মাঠে স্কুটার রেখে, মাঠের আল ধরে ঢুকলাম। আমার জামাইবাবু , দিদি , ভাগ্নে এখন আর কেউ নেই। ভাগ্নের স্ত্রী এখনও সেই বাড়ী আগলে পড়ে আছে। আজ থেকে তিরিশ বত্রিশ বছর আগে, তখন ওরা সবাই ছিল। জামাইবাবু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হলেও একটু সোজা সোজা মানুষ ছিলেন। আমরা যখন পৌঁছলাম, জামাইবাবু উঠানে মাটি নিয়ে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা একেবারেই ধূমকেতুর মতো হাজির হওয়ায় , হত চকিত হয়ে গেলেন। হাতে পায়ে কাদা মাটি মাখা। বিস্ময়ে, খুশীতে হাউ মাউ করে কি যেন বলেছিলেন। দিদি বেরিয়ে এসে মেদিনীপুরের ভোলা রায়কে দেখে চমকে গেলেন। দুটি মোড়া বা ঐরকম কিছুতে বসতে বললেন। আমরা আধ ঘন্টা মতো থেকে বেরিয়ে এলাম। আসার পথে ভোলাদা বার দশেক বোধহয় বললেন, এমন বিপজ্জনক জায়গায়, মেয়েগুলোকে নিয়ে ওরা আছেন কি করে? শহরে ফিরে আমরা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

মাসখানেক পর একদিন সকালে আমি চেম্বারে বসে ছিলাম; বড় ভাগ্নী এসে ঢুকল। কোন রকমে বলল, কাল রাতে ডাকাত দল এসে বাবাকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। আমি কিছু সময় কোন কথা বলা তো দূরের ব্যাপার, কিছু ভাবতেই পারলাম না। ঐ হাড় জিরজিরে লোকটাকে ডাকাতে মারার পরও বেঁচে আছে, সেটাই ভাবতে পারছিলাম না। কোন রকমে বললাম, ভোলাদার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখত আছে কি না; আমি আসছি। পাঁচ মিনিট পর গিয়ে শুনলাম, দাদা নার্সিং হোমে গেছেন। গেলাম সেখানে। উনি বললেন, আমি তো এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। ভাগ্নীকে কোতোয়ালি থানায় পাঠিয়েছি, মেজ বাবুর সাথে কথা হয়েছে। উনি দেখছেন। একটু পরে খবর পেলাম, পুলিশ গাড়ি নিয়ে দিদির বাড়ীর গ্রামে চলে গেছে। এসব কথা যে সময়ের , সে সময় মোবাইল ফোন ছিল না। পরে জেনেছি, মেজবাবু সাথে সাথেই ভাগ্নীকে থানার গাড়ীতে নিয়ে ওদের বাড়ী চলে যান। জামাইবাবুকে তুলে এনে হাসপতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মেজোবাবু ওদের বলেন, ঐ গ্রামের সব ডাকাতকে আমরা জানি, ভয় নেই। পরের দিন দুই রাত্রে গিয়ে জন সাত আট ডাকাতকে ধরে আনেন। পরে দিদির কাছে শুনেছি , সবকটা ডাকাতকে মেরে হাতগুলি প্রায় অকেজো করে দিয়েছে। ডাকাতরা গ্রামে ফিরে বলছে, এদের কোন আত্মীয় একটা বড় নেতা। পুলিশ ওদের পেটানোর সময় বার বার বলেছে, তোরা ভোলাবাবুর জামাইবাবুকে মেরেছিস, তোদের সবকটার হাত ভেঙ্গে দেব। সেই ডাকাতি তো এভাবে সমাধান হল। কিন্তু তারপর যা হয়েছে, সেটা রূপকথার গল্পের মত।

সেই প্রথম দিন ভোলাদা ওদের দেখেই যেমন ভয় পেয়েছিলেন, থানার মেজবাবুও মেয়েগুলিকে দেখে ওদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। উনিই বড় ভাগ্নীকে একদিন বললেন, পুলিশে চাকরী করবি? ভাগ্নী মাধ্যমিক পাশ করেছিল। কিন্তু কোনোদিন খেলার মাঠে নেমেছে বলে শুনিনি। মেজবাবু ওকে বলেছিলেন, মাঠে নেমে দৌড় ঝাঁপ করে দেখাতে পারলে চাকরী পেয়ে যাবি। কদিন মাঠে নেমে দৌড় ঝাঁপ প্র্যাকটিস করা শুরু করলো। এ কিন্তু আজকের সিভিক পুলিশ নয়; একেবারে কনস্টেবল এর চাকরী। ঐ মেজবাবুই বড় কর্তাদের ধরে ওর চাকরিটা করে দিলেন। আলা ভোলা জামাইবাবু স্বপ্নেও ভাবেনি। ছোট ভাগ্নী খেলাধুলায় চৌকস ছিল। সেও একদিন চাকরী পেয়ে গেল। এই নিয়ে দুই বোন মাঝে মাঝেই ঝগড়া করে। বড় বলে আমি সাহেবদের ধরে তোর চাকরী করে দিয়েছি। ছোট বলে, আমি মাঠে নেমে সবার থেকে ভালো দৌড় ঝাঁপ করে চাকরী পেয়েছি। যেভাবেই হোক, দুই মেয়ের চাকরী দেখেই দিদি জামাইবাবু নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করেছেন। সব কিছুর জন্যে সেই ভোলামামা। এমন একটা মামা কজনের ভাগ্যে জোটে! ১১.১০.২৪.

সামান্য ফলের বিপুল সম্ভাবনা
সকালে উঠে পাড়ার মধ্যেই হেঁটে ঘুরে আসি , মাইল দুই হবে। সে প্রায় বছর পাঁচ ছয় হবে। বছরে যদি মোটামুটি সাড়ে তিন'শ দিন হাঁটা হয় , পাঁচ বছরে সাড়ে সতেরশত বার এই গাছটার নিচে দিয়ে আমরা হেঁটেছি। এতদিন খেয়াল করিনি, এর তলায় এত ফল পড়ে থাকে। এর থেকে পঁচিশ তিরিশ গজ এগোলেই একটা বিরাট ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছ আছে; সেটার তলায় প্রায় সারা বছরই কিছু ফল পড়ে থাকতে দেখি। আর এই অশ্বত্থ গাছের ঠিক পশ্চিমে, পঞ্চাশ গজ দূরে, আমাদের সেই খুব চেনা হরবড়ই গাছটি। এই হর্বড়ই গাছ, আর এর ফল নিয়ে আগে লিখেছি। এই সবকটি ফলের মধ্যে এই বট গাছের ফল সবথেকে সুন্দর। কিন্তু গাছ থেকে পড়ে থাকা অবস্থায় অক্ষত বটের ফল প্রায় দেখাই যায় না। কদিন ধরে দেখছি, এই পুকুর পাড়ের বট গাছের নিচের রাস্তায় অসংখ্য ফল পড়ে থেঁতলে আছে। পড়ার সময় হয়তো সবকটা ফল ফেটে যায় না, কিন্তু রাস্তাটা বেশ ব্যস্ত। গোটা ফল পড়লেও মানুষের পায়ের চাপে, গাড়ী আর রিক্সার চাকায় থেঁতলে যায়। আজই, দ্বিতীয় বার ওখান দিয়ে হাঁটার সময় দেখলাম, রাস্তার পাশের দিকে , দুই একটা গোটা ফল পড়ে আছে। আসলে বটের ফল কেউ খায় না (?), বা এই ফল নিয়ে কোন কাজে লাগানো যায়, এমন খবর আমার জানা নেই। সে জন্যেই, যতো সুন্দর দেখতেই হোক , কেউ বটের ফল কুড়িয়ে নিয়ে যায় না। সুন্দর দেখতে বলেই একটা লাল টুকটুকে ফল কুড়িয়ে নিলাম। হাতে নিয়ে দেখলাম, বেশ নরম, একটু চাপ পড়লেই ফেটে যেতে পারে। একটু সাবধানেই বাড়ীতে আনতে হল। সাবধানে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেখি, এটা আরও সুন্দর লাগছে।
গাছের তলায় অত্যন্ত অবহেলায়, মানুষের পায়ের চাপে থেঁতলে পড়ে থাকতে দেখে, মনে কতগুলি ভাবনা এসে জড়ো হয়েছে। এই একটি লাল ফলের মধ্যে প্রায় শ খানেক হলুদ বীজ। সাধারণ সর্ষে দানার থেকেও ছোট এক একটি বীজের মধ্যে কী বিশাল বিপুল একটি মহীরুহের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। ব্যতিক্রমী, ইতিহাস হয়ে যাওয়া গাছগুলির কথা ছেড়েই দিলাম, এদিক ওদিক হেলায় দাঁড়িয়ে থাকা এক একটি বট গাছের কী বিশাল চেহারা। কোন একটা দিন এই সকল বট গাছের ইতিহাসও শুরু হয়েছে এই রকম একটি সর্ষে দানার মত ক্ষুদ্র বীজের থেকেই। কিন্তু এত এত হাজার লক্ষ বীজ তো প্রতিটা বট গাছের ছায়ায় হেলায় পরে থাকে; তাহলে হাজার হাজার বট গাছ আমরা দেখতে পাই না কেন? বটের বীজ শুনলেই কেমন যেন একটা " ধংসের" বীজ মনে হয় আমার। কেন এমন ধারণা? পুরোনো বাড়ী, মন্দির বা ধ্বসে পড়ার মত কোন সৌধ লক্ষ্য করে দেখবেন, দেওয়াল ফাটিয়ে মোটা মোটা বট বা অশ্বত্থ গাছের শিকড় উপর থেকে নিচে নেমে, মাটির গভীরে ঢুকে গেছে। এরকম দৃশ্য আপনারা সকলেই দেখেছেন। একবার একটু পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখুন; ঐ ধংসাত্মক শিকরগুলির শুরু কিভাবে হয়েছে? একটি সামান্য সর্ষে দানার মত একটি বীজ; কোন সুদূর অতীত কালে, ঐ মন্দির বা সৌধের উপর এসে পড়েছিল। আজও সেই কালের নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। আজও আমরা প্রায়ই দেখি, বাড়ীর ছাদে, দেওয়ালের গায়ে, জলের নলের পাশে, কবে যেন গজিয়ে উঠেছে একটি ছোট্ট বটের চারা। ছোট্ট চারা অবস্থায়ই একেবারে শিকড় সমেত উপড়ে না ফেললে, কয়েক বছরে ওই ছোট্ট চারা শিকড় নামিয়ে দেবে , তিন চার তলার উপর থেকে একেবারে মাটি পর্যন্ত। তখন তাকে সমূলে উৎপাটন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে গিয়ে রস দ্বীপে গেছলাম; সকল যাত্রীই যায় একবার। একসময় ঐ রস দ্বীপেই ছিল আন্দামানের প্রধান শহর। এই তো সেদিন, জাপানের সহায়তায়, নেতাজী ঐ দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ সরকার এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন, স্বরাজ দ্বীপ। তার কয়েক বছর পরই ঐ স্বরাজ দ্বীপ বা রস আইল্যান্ড একেবারেই পরিত্যক্ত হয়ে গেল। এখন যাত্রীরা বড় লঞ্চে করে ওখানে যান, ঘন্টা দুই এর জন্য ইতিহাসকে দেখে আসার জন্য। পুরনো দিনের প্রায় প্রতিটা বাড়িই ধংসের মুখে। বট অশ্বত্থের শিকড় এক একটি বাড়ির দেওয়ালকে মাকড়সার জালের মতো আঁকড়ে ধরেছে। তাই ভাবছিলাম, একটা ক্ষুদ্র বীজের ধ্বংস করার ক্ষমতা বোধহয় এটম বোমার থেকেও বেশি।
কিন্তু এই বীজের যদি এতই প্রাণশক্তি , চার পাঁচ তলা বাড়ির ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত শিকড় নামিয়ে রসদ সংগ্রহ করে ফেলে; তাহলে আমরা সেই বিপুল সংখ্যায় বট গাছ তো দেখি না! এত এত বীজ গাছের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিটা বট গাছের আশেপাশে তো অনেক চারা গাছ দেখা যায় না। আমি নিশ্চিত নই, খুব সম্ভবত কোন কোন পাখী ফল খাওয়ার পর, মল ত্যাগ করে ঐ বীজের অঙ্কুরোদগম এ সহায়তা করে। পাখীর শরীরের ভেতরে ঢুকে পরিপাক না হলে, ঐ বীজ থেকে চারা তৈরি হয় না। এই ভাবনার পিছনে একটি প্রাণীর এই রকম একটি ভূমিকার কথা শুনেছি। ভাম বিড়াল বা পাম সিভেট এই রকম একটি বিশেষ গাছের বংশ বিস্তার করতে জরুরী। এই মুহূর্তে ঐ গাছটির নাম মনে পড়ছে না। ঐ গাছের বীজ সরাসরি মাটিতে পুঁতে দেখা গেছে, চারা বেরোচ্ছে না। একমাত্র ভামের মলের থেকে পাওয়া বীজেই চারা গাছ করা যায়।
আচ্ছা, ঐ যে এক জায়গায় কেউ এই ফল খায় কি না , তাই নিয়ে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি, খেয়াল করেছেন? সাধারণভাবে এই বটের ফল মানুষ খায়, এমন খবর আমার জানা ছিল না। কিন্তু একটি অত্যন্ত তথ্য বহুল একটি বই পড়ে

জেনেছি, ভগবানজী নামের এক রহস্যময় সাধু প্রচণ্ড দুর্দিনে, বটের ফল সেদ্ধ করে একটু নুন দিয়ে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন। সাধু সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করে, গাছের পাতা খেয়ে, দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে পারেন; আমরা ভারতীয়রা সেটাকে ঐ মহাত্মাদের বিশেষ বা প্রায় অলৌকিক ক্ষমতা বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু যদি জানতে পারি, পূর্বাশ্রমে এই মানুষটিই দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য জীবন পণ করেছিলেন? যদি এত বছর পরও প্রমাণিত হয় ঐ সাধুর বেশধারী মানুষটিকে আজও আপামর ভারতবাসী দেবতার মত শ্রদ্ধা করে? তখন কি নিজেকে অপরাধী মনে হয় না ? ঐ বইতে কিন্তু কয়েকশ তথ্য প্রমাণ হাজির করা হয়েছে ; প্রমাণ করা হয়েছে, পরবর্তী কালে কিছুদিন বটের ফল সিদ্ধ করে খেয়ে প্রাণ ধারণ করা মানুষটিই আমার প্রাণের দেবতা। শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন। আজও সেই মানুষটির শেষ জীবনের কথা ভাবলে বুক ভার হয়ে যায়, গলার কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে পড়ে কণ্ঠ রুদ্ধ করে আনে। না; একটি সামান্য বট ফলের কথা বলতে বলতে এমন হৃদয়ে মোচড় দেওয়া স্মৃতি এসে পড়বে, লেখা শুরুর সময় ভাবিনি।
১৭.১১.২৪.

এখন রেডিও শোনা

আজ সন্ধ্যেয় আকাশবাণী কলকাতায় আমার একটা সাক্ষ্যাৎকার বাজবে। শোনা হবে না। ঐ সময় আমি ট্রেনে করে টিটাগড়ে যাবো। টিটিগড়ে নেমেও শোনার সম্ভাবনা নেই। মোবাইলে এফ এম শোনাগেলেও,কলকাতা ক শোনা যায় না।

এবারই আকাশবাণীর কৌশিকবাবু জানিয়েছেন, সেট টপ বক্সে এখন রেডিও শোনার একটা ব্যবস্থা আছে। বাড়ী এসে, ও যন্ত্রটার কার্যকৌশল নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা হল। ছেলে মেয়ে ওসব বোঝে ভাল; ওরাও হার মানল। অগত্যা আদি অকৃত্রিম বন্ধু, আমার রেডিও সেট। কিন্তু এখন তো একটা প্রমান সাইজের ট্রানজিস্টার সেট আমার বাড়ীতে আছে। ওটা নিয়ে রাস্তায় বেরলে,কুকুরে তাড়া করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

মনে পড়েযায় আমার পুরনো ভালোবাসার মারফি বেবি ডিলাক্সকে। কলেজে ভর্তি হয়ে, বোধহয় বছরখানেক পর থেকে ঐ একটা ছোট্ট রেডিওয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। আমাদের ক্লাশের মানসের একটা বেবি ডিলাক্স ছিল। ওটা দেখেই শেষের শুরুটা হয়েছিল। ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে একদিন মানসকে বলেছিলাম; ও যদি ওর পুরনো রেডিওটা বাতিল করে কখনো, আমি কিনতে চাই। ও খুবই বিরক্ত হয়েছিল ঐ কথায়। ওটা যে ওরও কতো ভালোবাসার জিনিস, সেদিন একটু আন্দাজ পেয়েছিলাম। কারো, কোন জিনিসের ওপর কতোটা ভালোবাসা থাকে, কেউ কি কোনদিন বুঝতে পারে?

তখনও ডাক্তারী পড়ার শেষ এগারো মাস বাকী। দাদাকে ঐ একটা রেডিও কিনে দেওয়ার আব্দার করেছিলাম। সেই অপরাধে আমার পড়া বন্ধ করার নির্দেশ এল, বৌদির কাছ থেকে। ভয়ংকর সিদ্ধান্তটা আমাকে জানতে হল অসহায়, দিশাহারা,একশো পঁচিশ টাকা পেনশন পাওয়া বাবার পাঠানো, মানি অর্ডার পেয়ে। জীবনের মতো দুই ভাইকে বিচ্ছিন্ন করেদিল, এক মহিলার অশ্লীল জেদ। তারপর মাতৃসমা মেজ বৌদির গয়না ব্যঙ্কে রেখে টাকা ধার নিতে হল, আমার পড়া সম্পূর্ণ করার থেকেও; দিশাহারা বৃদ্ধ বাবার রাতের ঘুমটুকু ফিরিয়ে আনতে। বৈষ্ণব সন্যাসির মত বাবা, হয়তো মহিলাকে ক্ষমা করে গেছেন। আমি তো আজও সেই গুপ্ত হত্যার নির্দেশকে ভুলতে পারি না। এ হয়তো বৈষ্ণব বাবার উত্তরাধীকারকে অপমান, তবুও এ আমার চরম অক্ষমতা।

" মন কি বাত" লিখতে শুরু করেছি প্রায় আড়াই মাস হল। আমার মনের কথা, দু চারজন সম মনস্ক মানুষ পড়ছেন। তাঁদেরও নানা জনের নানান প্রতিক্রিয়া। কাউকে খুশী করার, কাউকে আঘাত দেওয়ার কোন অভিপ্রায় নেই। এই ধরনীর ধুলীমাখা পথে সাতান্ন বছর ধরে হাঁটছি। পায়ে ধুলো লেগেছে, বারবার ধুয়েও ফেলেছি। কেউ ঐ ধুলোকে," বৈষ্ণব ভক্তজনের পদরেণু" ভেবে গড়াগড়ী দিচ্ছেন। কেই আবার নাকে মুখোশ পরছেন। কারুর ওতে হাঁচি হয়; কেউ আবার পরম শ্রদ্ধায় কপালে তিলক লাগান। এমনকি চিভে লাগানোর মানুষেরও অভাব নেই। ধুলোকে ধুলো বলতে, আমার অন্তত কোন অপরাধ বোধ নেই।

রেডিওর গল্প বলতে গিয়ে কোথায় নিয়ে এলাম আপনাদের! ঐ স্বপ্নের বেবীডিলাক্স কিনতে পেরেছিলাম,বাঁকুড়ায়যখন আমি জুনিয়ার ডাক্তার। এখন জুনিয়াররা পয়সা জমিয়ে মোটর বাইক কেনে। তখন ঐ একটা শ দেড়েক টাকার রেডিও কিনতেও অনেক কষ্ট করে টাকা জমাতে হয়েছিল। অনেক বছর ঐ ছোট রেডিওটা আমার সাথে সাথে ঘুরেছে। মনে আছে, একদিন আজহারউদ্দিনের সেনচুরী শুনেছিলাম,বম্বে রোডে ট্রাফিক জ্যামে পড়েও। সেও ঐ বেবীডিলাক্সেই। আর সেই মস্কো অলিম্পিকের হকি ফাইনাল। গ্রামের বাড়ীতে, সন্ধেবেলা, একা একা শুনছিলাম। শেষের দিকে ক্রমশ শব্দ ক্ষিণ হয়ে আসছিল। আমি কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরে,মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের একটা মাটির বাড়ীতে বসে, চোখ বন্ধ করে দেখতে পাচ্ছি,অলিম্পিক স্টেডিয়ামের," কোনে কোনে মে, ভারতকা তেরঙ্গা লহরতে হুয়ে!" টান টান উত্তেজনার খেলা। শেষ মিনিটেও দেশ জিতছে চার তিনে। এবার ইংরেজীর ধারাভাষ্যকার উত্তেজনায় ফুটছেন। শেষ দশ সেকেন্ড বাকী; উনি শুরু করলেন কাউন্ট ডাউন। নাইন,এইট, সেভেন,সিক্স, ফাইব..... গোল্ড! ঐ শেষ দশ সেকেন্ডে আমার হৃদকম্পন কতোতে উঠেছিল জানিনা। ওনার পাঁচ গোনার পর আর রেডিওর শব্দ কানে এসেছিল কিনা জানি না; তখন বুকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দই কানে আসছিল। বয়সটা নেহাতই বছর চব্বিশ ছিল; আজকের বয়স হলে নিশ্চিত হার্ট আটাক হতো।

সেই বেবীডিলাক্সও কবে যেন আমাকে ছেড়ে গেল। কিন্তু রেডিও শোনার নেশা আজও কাটেনি। আমরা যারা পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের কাছে এসে গেলাম, রেডিও আমাদের রক্তে মিশে আছে। জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই আমাদের দুর্গাপূজা শুরুহত, এক ভোরে, আধো ঘুমে আধো জাগরনে ভদ্রবাবুর অলৌকিক উচ্চারনে, "আশ্বীনের শারদ প্রাতে......."শুনেই। তখন গোটা গ্রামে একটা কি দুটো রেডিও। মিত্রামাসির ঢাউস রেডিওটা ঐ দিন রাত্রে আমাদের বাড়ীতেই থাকতো।

বহুবছর পরেও, বাঁকুড়ার হস্টেলের থেকে, ঐদিন ভোরে একদল ছেলে বেরিয়ে পড়েছি। ঘোষালের হাতে একটা বড় রেডিও। কয়েকজনের হাতে টর্চ। হাসপাতাল, নার্শিংহোস্টেল ছাড়িয়ে, ধানক্ষেতের আল ধরে চলেছি দারকেশ্বর নদীর দিকে। উন্মুক্ত প্রান্তরে ঐ ব্রাম্ভমুহুর্তে দশদিক আমোদিত করে ছড়িয়ে পড়ছে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের পবিত্র শ্লোক উচ্চারন, " ইয়া দেবী, সর্বভূতেসু শক্তিরূপেন সংস্থিতা"। শব্দ, ব্রম্ভ কিনা জানিনা। কিন্তু শব্দ যে একটা শক্তি, এতো সাধারন শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই জানেন। ঐ সকল টি ভি, মোবাইল, ইন্টারনেট বিহীন সময়ে, একটা রেডিও সেটের মাধ্যমে যে প্রবল মর্মভেদী শব্দ আমাদের চেতনাকে উজ্জিবিত করতো,আজকের বধির করা ডি জে শব্দে উদ্দাম নৃত্যকরা প্রজন্ম তার মর্ম কখনোই বুঝবে না। ১৬.৭.২০১৭.

কবির স্বাধীনতা, কবির কল্পনা।

মহাভারত মহাকাব্যের এক উপেক্ষিতা নায়িকা হিরিম্বা। সেই জতুগৃহ থেকে বেঁচে পালিয়ে বন জঙ্গলে পড়ে থাকার সময়, ভীমের সাথে বিয়ে হয়ে গেল রাক্ষসী হিরিম্বার I এর একটা মহাকাব্যিক অভিসন্ধি ছিল। বহু বছর পরে, এই অদ্ভুত বিবাহজাত পুত্র ঘটোৎকচ , কুরুক্ষেত্রের মহা যুদ্ধে , কর্ণের একাঘ্নী বানে নিজের জীবন দিয়ে, মহা বীর অর্জুন এর জীবন বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু পুত্র জন্মের পর, ভীমকে মা আর অন্য ভাইদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে, ছেলের হাত ধরে সেই যে উত্তর দিকে চলে গেলেন, গোটা মহাভারতে আর তাঁর কোন উল্লেখ নেই। মহাবীর পুত্র ঘটোৎকচের প্রসঙ্গে আর দুই একবার তার মায়ের কথা কোনভাবে ছুঁয়ে গেছেন মহাকবি।
এই যে ছেলের হাত ধরে চলে গেলেন, তারপর ছেলেকে মানুষ করে রাজা করলেন, এর সাথে আমি ভারতের আদি মাতা শকুন্তলার অনেক মিল পাই। অভিজ্ঞান হারিয়ে গেল, রাজা দুষ্মন্ত স্ত্রী শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না। রাজাকে তিরস্কার করে ছেলে ভরতের হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন মা শকুন্তলার। সেই ছেলে ভরতের নামে আমাদের দেশের নাম ভারত। একা মায়ের এই বিশাল কৃতিত্বের কথা আমরা ভুলে যাই। এই মহিয়সী মা হিড়িম্বা কিন্তু আমাদের মনে “রাক্ষসী” হয়েই থেকে যাবেন। আমাদের নিজেদের ঘরের মহা কবি কাশীরাম দাস এটা মেনে নিতে পারেননি। তিনি কবির স্বাধীনতা দিয়ে , পাণ্ডবদের বাড়ীর প্রথম কুলবধুকে মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ বাড়ীতে মহারানী রাজমাতার মর্যাদায় এনে দেখিয়েছেন।
অবশ্য তারও অনেক অনেক আগে , প্রায় দেড় হাজার বছরের বেশী আগে , আর এক মহাকবি, নাট্যকার ভাস , ভীম হিরিম্বার মিলন দেখিয়েছেন। সেই যে বনবাসের সময় ভীমের সাথে পুত্র ঘটোৎকচের দেখা; ভীম বলেছিলেন, “ যদি তে শক্তিরস্তি বলাৎকারেন মাং নয়!” কবিদের এই কল্পনার স্বাধীনতা তো আমাদেরকে দেখিয়েছেন, আমাদের ঘরের কবি মাইকেল মধুসূদন আর রবীন্দ্রনাথও। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা, কর্ণ, কুন্তি এদের নিয়ে আমাদের কবির কাব্য নাটক আমরা সবাই জানি।
মহাভারতের অমৃৎসমান কথা বাঙালির ঘরে ঘরে বিতরণ করলেন যে মহাকবি, সেই কাশীরাম দাস কিন্তু হিরিমবাকে নিয়ে আমাদের ভুল ভাঙ্গাতে চেয়েছেন। রামায়ণের রাবণ মেঘনাদ যেমন আদৌ মানুষখেকো রাক্ষস ছিলেন না, আমাদের কুরু পাণ্ডব বাড়ীর বড় বউটিও তেমনি কুরূপা রাক্ষসী ছিলেন না।
মহাভারতের মহাকবি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এ, অর্জুনের অন্য দুই স্ত্রী উলুপী চিত্রাঙ্গদা দুজনকে রাণীর মর্যাদায় এনেছেন। আমাদের বাঙালির কবি রাজমাতা হিরিম্বাকে রাণীর মর্যাদায় এনেছেন ইন্দ্রপ্রস্থ রাজবাড়ীতে। রাজা ঘটোৎকচ হাতীর পিঠে চেপে এসেছেন। এনেছেন অনেক সোনাদানা উপঢৌকন। অভ্যর্থনা কমিটির প্রধান , সহদেব তাঁকে মহারাজ যুধিষ্ঠির এর কাছে নিয়ে গেলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর পাশেই বসালেন। সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, বংশের বড় ছেলে বলে। সহদেবকে বললেন, ওর মাকে ভিতরে নিয়ে যাও, রানীদের কাছে। সহদেব তাই করলেন। বড় বৌমা চিনতেন শুধু শাশুরি মা কুন্তিকে; তাঁকে প্রণাম করলেন। কুন্তি আশীর্বাদ করে তাঁকে রানীদের কাছে গিয়ে বসতে বললেন। মহিলা মহলে এই গ্ল্যামারাস মহিলাকে নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হল। যাকে আমরা রাক্ষসী বলে জেনে এসেছি , বাংলার কাশী কবি তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন কেমন করে, দেখুন, dayalbm@gmail.com
“ কেহ বলে, হবে বুঝি মদন - মোহিনী।
কেহ বলে ,হবে বুঝি নগেন্দ্রনন্দিনী।।
কেহ বলে, মেঘে ছাড়ি হইয়া মানিনী।
ভূমিতলে আসি দেখা দিলা সৌদামিনী।।”
কিন্তু বাঙালির কবি মহাকাব্য লিখতে বসলেও, বাঙালি ঘরের মহিলাদের স্বভাব সুলভ কুট কচালী ভুলতে পারেননি। পাট রানী দ্রৌপদী এই নবাগতা মহিলার ব্যক্তিত্ব দেখে টেরা বাঁকা কথা বলতে শুরু করলেন। হিরিম্বাও মুখের উপর উত্তর দিয়েছেন। আর আমাদের কবি তাঁর কল্পনার স্বাধীনতা ভালোমতই নিয়েছেন। মহাভারতের প্রামাণ্য ঘটনা উল্লেখ করে হিরীম্বা দ্রৌপদীকে একেবারে পেড়ে ফেলেছেন। সবকিছুর উপর আমার কাছে হিরিমবা কিন্তু মহিয়সী নারী। চিত্রাঙ্গদা অনেক বেশি প্রচার পেয়েছেন। কিন্তু বাবা জ্যাঠার ধর্ম যুদ্ধে ছেলেকে পাঠাননি চিত্রাঙ্গদা। মহাভারতের মহাকাব্যিক অভিসন্ধি অনুসারে হিরিম্বা কিন্তু ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। এখানেই রাক্ষসী থেকে দেবীতে উঠে গেলেন পাণ্ডব কুলবধু হিরিম্বা। দেবী শুনে কি একটু চমকে গেলেন? মানালীর পাহাড়ের ভেতরে আজও আছে একটি হিরিম্বা দেবীর মন্দির।
২৮.৯.২৪.

ভেন্ডার কামরায়

কলকাতার শহরতলীতে আমার প্রায় পঁচিশ বছর থাকা হয়ে গেল। এই পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বার শহরতলীর লোকাল ট্রেনে চড়েছি। আরও আগে, সেই 1976 সাল থেকেই এই সব লোকাল ট্রেনে আমার যাতায়াত। তবে কিনা, এই সব ট্রেনে যে আলাদা করে একটি বা দুটি ভেন্ডার কামরা থাকে, সেটা ঠিকঠাক বুঝেছি এই শেষ বছর পঁচিশ আগে। ভেন্ডার কামরা মানে , মাল পত্র নিয়ে ওঠার জন্য নির্দিষ্ট একটি ট্রেনের কামরা। এই কামরায় ওঠার বিশেষ কিছু নিয়ম বা আইন থাকলেও সে আইন আমার জানা নেই। আর শহরতলীর ট্রেনে সেসব আইন না মানাটাই আইন। বিশেষ করে অফিস টাইমের ট্রেন বলে এক ভয়ংকর ভিড়ে ঠাসা ব্যাপার আছে; সেই সময় কোন বিশেষ আইন বা নিয়ম কেউ মানেও না, মানা সম্ভবও হয় না। অফিস টাইমের ট্রেন বলতে মোটামুটি যা বোঝায় , তা হল কলকাতায় সরকারী অফিস খোলার সময় সেই অফিসে কাজ করতে আসা কর্মচারীরা কলকাতার দিকে যে ট্রেনে করে আসে ,আর আপিস ছুটির সময় যে সব ট্রেন কলকাতার দিক থেকে বাইরের দিকে যায়। বাস্তবে কয়েক বছর আগে থেকেই দেখছি, এই আপিস টাইম ব্যাপারটা আর সরকারী অফিস এর উপর নির্ভর করছে না। সরকারী অফিস ছাড়াও হাজারো কাজ কর্মে লোকে শহরের বাইরে থেকে শহরের দিকে আসে। তাই সকালের দিকে কলকাতামুখি আর বিকেলের দিকে উল্টো দিকের ট্রেন মানেই ঐ দম বন্ধ করে দেওয়া ভিড়। ঐ সময়গুলিতে আজকাল আর ভেন্ডার কামরা বলে আলাদা কিছু বোঝার উপায় নেই। সব কামরাতেই গাদাগাদি লোকের ভিড়। এই সময়গুলোতে ভেন্ডার কামরায়ও মালপত্র নিয়ে ওঠার সুযোগই থাকে না। এই যে ' মালপত্র ' কথাটা বারবার বলছি, এটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। আপনি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন, সাথে একটি বড় ট্রলি ব্যাগ, আরও ছোটখাট দু' একটা ব্যাগ বা পোটলা থাকতেই পারে ; এগুলি কিন্তু ঐ ভেন্ডার কামরায় নেওয়ার মালপত্র বলতে যা বোঝায় , সেই জিনিস নয়। সম্ভবত রেলের নিয়মে, যে সব ব্যবসায়িক বড় বোঝা নিয়ে রেলে যাতায়াত করতে হলে আলাদা করে ' মালের জন্য ভাড়া ' দিতে হয় , সেই সব ভাড়া দেওয়া মালপত্রই বৈধ ভাবে ঐ ভেন্ডার কামরায় নেওয়ার কথা। মাঝে মাঝে শুনি, সাধারণ যাত্রী টিকেট নিয়ে ভেন্ডার কামরায় ওঠা বেআইনী। ব্যাপারটা আমার ঠিক জানা নেই। আমি সচেতন ভাবে কখনও ভেন্ডার কামরায় উঠতে চাই না। কিন্তু এক এক সময় পরিস্থিতি এমনই হয় যে, প্লাটফর্মে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক সেই জায়গায় ভেন্ডার কামরা পড়ে গেল; প্লাটফর্মে প্রচণ্ড ভিড় থাকলে, পরের দরজায় যাওয়ার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিতে পারে। সে রকম ব্যতিক্রমী দুই এক বারই আমি ভেন্ডার কামরায় উঠতে বাধ্য হয়েছি। তার আগে, ঐ যে আইন এর কথা বলছিলাম, সেটা সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা জানাই। অনেক বছর ধরেই শহরতলীর ট্রেন পরিষেবায় , লেডিস স্পেশাল, অর্থাৎ শুধুই মহিলা যাত্রীদের জন্য পুরো ট্রেনই সংরক্ষিত , এরকম কিছু ট্রেন চালু হয়েছে। বিশেষ করে ঐ অফিস টাইমের প্রচণ্ড ভিড়ের সময়ে দুই এক জন পুরুষ যাত্রী ঐ লেডিস স্পেশাল ট্রেনে উঠে পড়েন। সাধারণত বয়স্ক মানুষ হলে, কিংবা ভদ্রলোক বুঝতে না পেরে উঠে পড়েছেন বুঝলে, মহিলারা সেরকম কিছু বলেন না। যারা না বুঝে উঠে পড়েন, তারাও নিজের ভুল বুঝে, পরের স্টেশনেই নেমে যান। কিন্তু বেশ কিছু বছর থেকেই দেখছি। অফিস টাইমে, ঐ লেডিস স্পেশাল ট্রেনের ভেন্ডার কামরায় শুধু পুরুষ যাত্রীরাই যাতায়াত করেন। সাধারণ ভাবে ঐ ভেন্ডার কামরায় পুরুষদের ওঠা ব্যাপারটা যেন আইনসিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে বিশেষ ধরপাকড় হয়; সে সময় লেডিস স্পেশাল ট্রেনে চাপার অপরাধে কিছু পুরুষ যাত্রীকে রেল পুলিশ আটক করে, জরিমানাও করে। সম্ভবত এই ব্যতিক্রমী ব্যাপারটিকে নিয়েই, সাধারণ যাত্রীর ভেন্ডার কামরায় ওঠা বেআইনী, এই কথাটা চালু হয়ে গেছে।

ভেন্ডার কামরার বৈশিষ্ট কি? খালি ট্রেন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়, আমি ভেন্ডার কামরায় উঁকি দিয়ে দেখেছি, অনেকবার। এই কামরার ভেতরে বসার আসনগুলি শুধুই কামরার দেওয়াল ঘেঁসে লম্বালম্বি করে সাজানো। মাঝখানে বড় বড় বোঝা ইত্যাদি রাখার জন্য অনেকটা জায়গা থাকে। বড় বড় বোঝা, ঝুড়ি এমনকি খাট পালঙ্কের এক একটি ভাগ তোলার সুবিধার জন্য দরজার মাঝের লম্বা ধাতব খুঁটি থাকে না। আজকাল অবশ্য কখনও কখনও সাধারণ যাত্রী কামরার বসার আসনও ঐ ভাবে দেওয়াল ঘেঁসে লম্বালম্বি করে সাজানো দেখেছি। ঐ রকম কামরায় উঠতে গিয়েও অনেকে ওটাকে ভেন্ডার কামরা ভেবে অন্য কামরায় চলে যায়। ওঠার পর, কখনও কখনও বাইরে থেকেও একটা পুরনো পচা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগলেই বোঝা যায়, ওটা ভেন্ডার কামরা। আমি যে কয়েকবার নানান কারণে এই ভেন্ডার কামরায় উঠে দুই একটা স্টেশন গিয়েছি, চোখ - কান - নাক খোলা থাকার জন্য, ঐ কামরার ভিন্ন পরিবেশ লক্ষ করেছি। চাপে পড়ে, কিংবা শুধুই বিড়ি সিগারেট খাওয়া নিয়ে কেউ কিছু বলে না তাই,কিছু তথাকথিত ভদ্রলোক ভেন্ডারে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়; কিন্তু ঐ ভেন্ডার কামরায় একটি সম্পূর্ন আলাদা সমাজ ব্যবস্থা। মূলত কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলির ওখানে নিয়মিত যাতায়াত। ওদের নিজেদের কথা বলার ধরণ আলাদা, পোষাক আসাক আলাদা, খাদ্য তালিকায় যাত্রি কামরার লোকেদের থেকে আলাদা রকম সকম। ওদের রসিকতা ঠিক পাশের কামরার মানুষগুলির থেকে আলাদা। ওদের ধুমপান মূলত বিড়ি। অবশ্য সিগারেট খাওয়ার সুযোগ থাকে বলেই, তথাকথিত ভদ্রলোক, বাবু শ্রেণীর মানুষেরা ঐ পচা দুর্গন্ধওয়ালা কামড়ায়

যাতায়াত করেন। ঐ একটি, বা দুই মাথায় অর্ধেক অর্ধেক ভেন্ডার কামরা, যেন গোটা ট্রেনের থেকে আলাদা একটি জগৎ। আমি নিজের তিনটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ জগতের যে সব বিচিত্র রকমের জীবন লক্ষ করেছি, তার বাইরেও ঐ কামরায় নিয়মিত যাতায়াত করেছেন, এমন কিছু মানুষের কাছেও অনেক গল্প কাহিনী শুনেছি। আসলে এই ভেন্ডার কামরা নিয়েই একটি উপন্যাস লেখা যায়। বা ভালো রকমের একটি তথ্য চিত্র তৈরী করা যায়। বারাকপুরের এক ভদ্রলোক এক সময় ঐ কামরায় নিয়মিত যাতায়াত করেছেন। উনি সে সময় বেশ কিছু টাকাপয়সা নিয়ে, কলকাতার বাজারে, ব্যবসার কাজে যেতেন। উনি বলেছিলেন, ঐ কামরার পুরনো যাত্রীরাই ওনাকে প্রায় শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন। ওনারাই ওকে বলেছিলেন, টাকাপয়সা নিয়ে মার্কেটে যাওয়ার সময়, জেনারেল কামরায় যাস না, ওখানে পকেটমার তোর টাকা নিয়ে নেবে। ভেন্ডার কামরায় ভুল করেও কোনো পকেটমার উঠবে না।
এবার আমার দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। বছর দুই আগে, হাসপাতাল থেকে ফেরার সময়, পার্ক সার্কাস ষ্টেশন থেকে ভেন্ডার কামরায় উঠেছিলাম। একটাই ষ্টেশন; ঠিকমত গাড়ী চললে মিনিট সাতেক লাগে। কখনও কখনও একটা সিগন্যাল এ দাঁড়ালে দশ বারো মিনিট। সেদিন ঐ কামরায় তেমন ভিড় ছিল না। আমরা এটুকু রাস্তার জন্য সাধারনত ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতাম না। উঠেই শুনি একজন ফেরিওয়ালা কি একটা নতুন জিনিস বিক্রী করছে। নাম বলছে, " জাঙ্গী হরীতকী।" ট্রেনের ফেরিওয়ালার মার্কামারা ' সাড়ে বত্রিশ রকমের উপকার হবে ' বলে নিজের জিনিস বিক্রী করছে। ঐ যেমন বলে, ক্ষিদা বাড়বে, ঘুম ভালো হবে, চোয়া ঢেকুর কমবে, মেয়েদের গোপন রোগ সারবে, চাই কি লুকানো ক্যান্সার সারিয়ে তুলতে পারে, ইত্যাদী। এসব শুনতে , আমার মত ঐ কামরার প্রায় সবাই অভ্যস্ত। শিয়ালদা স্টেশনে ঢোকার আগে, হাঁটুর উপরে লুঙ্গী তোলা একজন, পরিশ্রমী মানুষ , এই বিশেষ হরীতকী বিক্রেতাকে একটি মোক্ষম প্রশ্ন করে ফেলল। চূড়ান্ত আদি রসাত্মক সেই প্রশ্ন, লোকটি কি অনায়াসে, উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে শুনিয়ে করে ফেলল; একমাত্র ঐ ভেন্ডার কামরায় নিয়মিত যাতায়াত না করলে ভাবাও যাবে না।
আর একবার, সে প্রায় বছর পনের আগে; আমরা চারজন জোয়ান লোক, লোকাল ট্রেনে কৃষ্ণনগর থেকে ফিরছিলাম। আমার সাথে আমার বড় ভাইপো আর আমাদের দুই জামাই। যাওয়ার সময় শিয়ালদা থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ওরা তিনজন বসে এসেছিল; আমি বারাকপুর থেকে উঠে, ওদের সাথে তিনজনের সিটে চার জন বসে গেছলাম। ফেরার সময়, ট্রেন প্লাটফর্মে ঢোকার আগেই দেখেছি, অসম্ভব ভিড়। উঠে সিট পাবো কি না জানিনা। যে যেখানে সিট পাবো বসে পড়তে হবে, এরকম কথা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে আমাদের সামনে ভেন্ডার কামরা পড়ে গেল। ঐ ভিড়ে, অন্য দরজায় যাওয়ার চেষ্টাই করা গেল না। আসলে ঐ জায়গায় ভেন্ডার কামরা পড়ে, এটা ওখান থেকে যারা নিয়মিত ওঠে তারা জানে। তাই ঐ জায়গায় ভিড় একটু কম ছিল। আমরা উঠে ঐ দেওয়াল ঘেঁসে লম্বালম্বি করে সাজানো সিটে বসেও পড়লাম। আর প্রায় কেউ উঠলো না। একটি ছেলে উঠে আমাদের ভালো ভাবেই বলল, এটা ভেন্ডার কামরা, পরের স্টেশনে ছানা উঠবে, এখানে থাকতে পারবেন না, এখানেই নেমে পরের কামরায় চলে যান। আমরা তখন কাজ সেরে ফিরছি, ছানার জলকে আর ভয় কি, এসব ভেবে বসেই থেকে গেলাম। আর তখন নেমে পরের কামরায় গিয়ে, ভিড়ে ঢুকতেই হয়তো পারবো না। নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করলাম, সিটের উপর তো আর ছানা রাখছে না, আমরা বসেই থাকি। পরের স্টেশনে ট্রেন পৌঁছতেই টের পেলাম, ঐ ছেলেটি কেন নেমে যেতে বলেছিল। শ, খানেক লোক, বড় বড় কাপড়ের পোটলা করে ছানা তুলছে তো তুলছেই। আমরা যে সিটে বসে ছিলাম তার উপর প্রায় তিন চার থাক করে ছানা সাজিয়ে ফেলল। তখন সিটে বসে থাকা তো দূরের কথা, দৌড়ে ট্রেন থেকে নামতে নামতেই আমাদের সবার প্যান্ট ছানার জলে ভিজে একাকার। কোন রকমে পরের দরজায় উঠে দাঁড়াতে পারলাম। বারাকপুর পর্যন্ত গোটা রাস্তা চারজনে দাঁড়িয়েই ফিরেছিলাম। ৫.১২.২৪.

আমার ভোলাদা

আমার বন্ধু ভোলাদা, আমার ছেলের ভোলাদা জ্যেঠু। মেদিনীপুরের বিখ্যাত ভোলা রায়। আমাকে শিখিয়েছিলেন, কাজের বাইরে ," পঞ্চায়েতি " করতে। সেই বনের মোষ তাড়ানো পঞ্চায়েতি করতে গিয়েই একদিন অকালে চলে গেলেন। আমি এখনও মোষ তাড়ানোর নেশা থেকে বের হতে পারিনি। আজও মনে আছে সেই প্রথম দিনের কথা। ডাক্তারী পাশ করেছি, সরকারী চাকরীর কোন খবরই নেই। বাড়ীর থেকে টাকা নিয়ে একটা চেম্বার খুলে বসব সেরকম কোন সম্ভাবনা নেই। ১৯৮৭ সালের শেষ দিনটাতে ভোলাদার ল্যাবরেটরিতে আসতে বললেন কলেজের এক দাদা। ল্যাবরেটরির উল্টো দিকে, ঐ দাদার একটা চেম্বার ভাড়া নেওয়া ছিল; সেটার অর্ধেকে আমি বসতে পারি। মনে আছে, মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া ফেরার পুরো ভাড়াও ছিল না। মায়ের কাছে কুড়ি টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। পরের সপ্তাহে মেদিনীপুরে চলে এলাম। চেম্বারের চেয়ার টেবিল এর ব্যবস্থা করে দিলেন ভোলাদা। একটু একটু করে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে হয়েছে। শহরের অনেক পুরনো চোখের ডাক্তারদের পাশে , নতুন আর একটা ডাক্তারের চেম্বারে রুগী আসতেই চায় না। সে সময় ওনার পরিচিত লোকজনকে উনি আমার কাছে পাঠাতেন। মাস দুইয়ের মধ্যে আমার সেই কলেজের দাদার চেম্বারে একটা ঝামেলা হল। ওখানে থাকতে পারলাম না। একটু দুরে শহরের অন্য প্রান্তে চলে গেলাম। দাদার সাথে যোগাযোগ কমে গেল। কিন্তু মেদিনীপুরে চেম্বার করতে হলে রবীন্দ্র নগরেরই কোথাও করতে হবে। মাস দুই পরে এদিকে ফিরে এলাম। এই সময় দাদা একটি পুরোনো বাড়ি কিনে নার্সিং হোম খুললেন। পরে আমার পশার বাড়লে যখন অপারেশন করা শুরু করলাম, সবই প্রায় দাদার রায় নার্সিং হোমেই করতাম। এরকম নার্সিং হোম এর মালিক, আর তার সাথে ডাক্তারদের ভালো সম্পর্ক জেলায় জেলায় প্রচুর আছে। আমার এই দাদা বন্ধুটি একেবারেই ব্যতিক্রম। প্রায় একই সময়ে আমরা দুজন মেদিনীপুর লায়ন্স ক্লাবের সদস্য হই। লায়ন্স ক্লাব বহু বছর আগে থেকেই চোখের ছানি অপারেশনের শিবির করে। আমরা দুজনে যখন ওদের সাথে যুক্ত হয়েছি তার আগে দশ এগারো বছর ধরে ওরা এই অপারেশন শিবির করে আসছেন। আমরা দুজনে বছরে একটার বদলে আট নটা করে শিবির করা শুরু করলাম। শহরের বাইরে, ছোট ছোট গঞ্জ এলাকার স্কুলে শিবির করা শুরু করলাম। একটা শিবির শেষ করে, ওখান থেকেই বাক্স প্যাটরা আর একটা শিবিরে চলে যেত। আমরা মজা করে বলতাম, যাত্রা পার্টি। লায়ন্স ক্লাব চোখের অপারেশন শিবির করে, এটা নতুন কোন খবর নয়। আমরা দুজনে ক্লাবের কর্ম কর্তাদের রাজী করালাম, কুষ্ঠ রোগীদের ছানি অপারেশনের শিবির করা হল। এরও একটা ইতিহাস আছে। একজন অঙ্গ বিকৃত রুগীর ছানি অপারেশনের জন্য কোন নার্সিং হোম পেলাম না। বাধ্য হয়ে শহরের প্রান্তে, একজন ঠিকাদারের কোদাল ঝুড়ি রাখার টালীর চালায় অপারেশন করতে বাধ্য হলাম। এখনকার আইনে অবশ্য এটা করলে আমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ঐ রুগীর ছানি অপারেশনের সময় আমাকে সাহায্য করেছিল, রায় নার্সিং হোমের ম্যানেজার জয়দেব। জয়দেব এর কাছেই প্রথম জানলাম, শহরের বাইরে একটি কুষ্ঠ আশ্রম আছে। ঐ আশ্রম কথাটাও কিন্ত ভোলাদার সৃষ্টি। জয়দেব আমাকে পূজ্যপাদ অরুণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সাথে আলাপ করিয়ে দিল। উনিই কুষ্ঠ আশ্রম এর প্রাণ পুরুষ। ভোলাদা বলতেন, " অরুণ বাবুর মত মানুষরা আছেন বলেই এখনও সূর্য চন্দ্র উঠছে।" আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ মানব দরদী। অরুণ বাবু জানালেন, এরকম কয়েকশ কুষ্ঠ রোগীদের চোখে ছানি অপারেশন করা হচ্ছে না। লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে অরুণ বাবুর আশ্রমে দু বার শিবির করা হয়। দু বারই পঞ্চাশ এর উপরে রুগীর ছানি অপারেশন করা হয়। একবার আমাদের সেই শিবির উদ্বোধন করেন, তৎকালীন রাজ্যপাল , অধুনা প্রয়াত রঘুনাথ রেড্ডি মহাশয়। এই শিবিরে আমার সাথে ছিলেন আমার বন্ধু ডা বিজ্ঞান বেরা। কয়েক মাস পর সরকারী চাকরীর চিঠি পেলাম। যেতে হবে সুদূর উত্তর বঙ্গে। দাদা ভাবলেন রসিকতা করছি। মেদিনীপুর ছেড়ে চলে যেতে পারি, এটা উনি ভাবতেই পারছিলেন না। এক নেতাকে ধরে চেষ্টা করলেন, আমাকে কাছাকাছি কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেখে দিতে। যেদিন পরিবার নিয়ে মেদিনীপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম, সে দিনটার কথা আজীবন ভোলা যাবে না। আমাদের বিদায় জানাতে উনি স্টেশনে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়ার বাঁশী বাজার পর দেখলাম, প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন। আমি চাকরীতে যোগ দিয়েই বুঝলাম, এখানে সিংহ নয় , ভেড়া হয়েই থাকতে হবে। ভোলাদা কিন্তু মেদিনীপুরে সিংহ হয়ে থেকে গেলেন। পরের শীতে আমাকে মেদিনীপুরের শিবিরে আসতেই হল, ঐ দাদার টানেই। চাকরিতে ক্রমশ জড়িয়ে গেলাম। মেদিনীপুরের সাথে যোগাযোগ ক্ষীন হয়ে গেল। কিন্তু দাদার সাথে যোগাযোগ একটা থাকলই। আবার মেদিনীপুরে যাতায়াত শুরু করলাম, কলকাতার দিকে ফিরে এসে। সে সময়ও কেশপুরে যেতে হল, বনের মোষ তাড়ানোর জন্য। এই দিনগুলিতে ও দেখতাম, ভোলাদার সেই পঞ্চায়েতি কাজ চলছেই। নতুন করে মেতেছেন, থ্যালাসেমিয়া সোসাইটির কাজে। লায়ন্স ক্লাব আর কুষ্ঠ আশ্রম তো আছেই।

আমি আবার নতুন একটা কি আকামে মেতেছি, দেখার জন্য একটা অনুষ্ঠানে মেদিনীপুরের গোলগ্রামে এলেন একদিন। ওখানেও আছেন,আমাদের পাগলের দলের আর এক গুরু বিমলবাবু। ওনারা প্রতি বছর ১৬ ই আগষ্ট একটা শিবির করেন। আমাকে বললেন, সাপের কামড় নিয়ে বলতে। আমি তো ল্যাপটপ প্রজেক্টর ছাড়া বলিনা। মেদিনীপুর শহরে

ভোলাদার সাথে যোগাযোগ করতে বললাম। উনি নিজেই গাড়ী নিয়ে, যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে গেলেন। সে সময় লোয়াদায় নদীতে সেতু হয়নি। বাঁশের পাটার উপর দিয়ে গাড়ী নিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, আপনি আবার নতুন কি পঁঞ্চায়েতি শুরু করেছেন, দেখতেই এলাম। শেষ দেখাহল কলকাতায় একটা মিটিংয়ে। লায়ন্স ক্লাবের চোখের হাসপাতাল খোলার জন্য খুব ছোটাছুটি করছেন। আমার এক সহকর্মী চোখের প্রফেসরের একটা পুরোনো মাইক্রোস্কোপ ওনারা কিনে নিতে চাইলেন। চুঁচুড়া শহরে এসে একবার দেখেও গেলেন, এটুকু জানতাম। সেটা আর নিয়ে গেলেন কি না, জানা হয়নি। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, ওনার সেই মোষ তাড়ানোর কাজে বেরিয়ে আর ফেরেননি। লায়ন্স ক্লাবের জন তিনেক একটা গাড়ী করে দিঘার দিকে যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিয়েছিল। অনেক সুকৃতি থাকলে এরকম একটা বন্ধু পাওয়া যায়। পুনর্জন্ম বলে যদি কিছু থাকে, ভোলাদার মত একটা বন্ধু পাওয়ার জন্যই আবার জন্মাতে চাই। ১০.১০.২৪.

হাইওয়ে ধরে চলতে চলতে মাঝে মাঝে বড় সাইন বোর্ড দেখতে পেলাম, লেখা, জঙ্গলের প্রাণীদের পারাপারের জায়গা, গাড়ী আস্তে চালান। ওসব জায়গায় রাস্তার পাশের জঙ্গল বেশ ঘন। এক জায়গায় আমাদের গাড়ী থেমে গেল, ড্রাইভার বাম দিকে মাঠের মধ্যে একটি গণ্ডার দেখাল। সবাই বেশ উত্তেজিত; সকলেই মোবাইলে ছবি তুলেছিলাম। আমাদের সামনের গাড়ীর কয়েকজন নেমে রাস্তার পাশে গিয়ে ছবি তুলল। ওখান থেকে কাজীরাঙ্গা জঙ্গলে ঢোকার মূল রাস্তাটি প্রায় দশ কিলোমিটার। আবার একটু এগোনোর পর বা দিকে মাঠের মধ্যে দুটি হাতি দেখতে পেলাম। তারপর আবার এক জায়গায় একটি বাচ্চা সহ মা গণ্ডার। এসবই বাস রাস্তা থেকে একশ মিটার মত দূরে। পরে পাঁচ শ মিটার মত দূরে আরও দূ একটা গণ্ডার দেখলাম। এই ভাবে কখনও জোরে কখনও আস্তে চলে আমাদের গাড়ী রিসোর্ট এ পৌঁছাল প্রায় বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ। খুব ছড়ানো ছিটানো জায়গা নিয়ে রিসোর্ট এর কটেজ গুলি। আমাদের কটেজ এর চাবি দিয়ে দিল, নিজেরাই এক একটি কটেজ খুলে ঢুকলাম। মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের স্যুটকেস কটেজে পৌঁছে গেল। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই তেলেভাজা আর চা এসেগেল। সন্ধ্যার মুখে আমরা এক এক করে বেরিয়ে রিসর্টের বিরাট এলাকার মধ্যে ঘুরে দেখতে লাগলাম। একটা ফুটবল মাঠের মত জায়গার এক পাশে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে বিহু নাচ এর মহড়া দিচ্ছিল, আমরা দেখলাম। রাত নটার পরই কুণ্ডুর লোক খাওয়ার জায়গায় সকলকে ডেকে নিয়ে গেল। রাতের খাওয়ার সময় ই ম্যানেজার জানিয়ে দিল, পরদিন সকাল আটটায় জঙ্গল সাফারী করার জন্য রিসর্টের সামনে জীপ এ উঠতে হবে।
কাজিরঙ্গা তেও সকালে জল গরম করে স্নান করতে হল। সকালেই টি ভি র খবরে দেখলাম, কলকাতায় তাপপ্রবাহ চলছে। খোলা জিপে জঙ্গলে ঘুরতে হবে বলে কেউ কেউ ছাতা নিয়ে উঠলো, কোথাও ছাতা মাথায় দিতে হয়নি।

জীপে ওঠার আগে মাথাপিছু ছয়শ টাকা করে ম্যানেজারকে দিলাম। প্রতিটা জীপে ছয় জন করে বসার ব্যবস্থা। অন্যান্য জাতীয় অভয়ারণ্যে জীপে একজন করে গাইড থাকে, এখানে ড্রাইভারই গাইড। পরিচয় পত্র ও কেউ দেখতে চাইল না। রিসোর্ট থেকে মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের জীপগুলি চেক পোষ্ট এ পৌঁছে গেল। অন্তত পঁচিশ তিরিশটি জীপের লাইন পড়ল। রাস্তার ডানদিকে নিচে একটা মাঠের মধ্যে গোটা পনের গাড়ী পার্কিং করা আছে দেখলাম। পরে জানলাম যারা হাতীর পিঠে সাফারী করতে গিয়েছে, তাদের গাড়ী ওগুলি। মিনিট দশ পনের লাগল আমাদের দলের কাগপত্রগুলো ঠিক করতে। তার পর জীপ চলল। চেক পোষ্ট এ ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছিল, কারও কাছে কোন খাওয়ার আছে কি না। একশ গজ মত ঢুকেই দেখি বাম দিকের মাঠের থেকে দুটি হাতী আসছে, তাদের পিঠে দুজন যাত্রী আর মাহুত। ওদিকের মাঠেই, রাস্তা থেকে তিন চারশ মিটার দুরে দুটি গণ্ডার চরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ডান দিকে একটা বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম, ওখানে আরও চার পাঁচটি হাতী। লোকজন ঐ প্ল্যাটফর্ম এ সিঁড়ি বেয়ে উঠে, হাতীর পিঠে চাপছে।

আমাদের জিপগুলি মাঠের ভেতরের আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলল। রাস্তার পাশে দু দিকেই মাঠ, জলা জমি। বেশীর ভাগই আট দশ ফুট উঁচু ঘাসের জঙ্গল। বড় গাছের গভীর জঙ্গল খুবই কম। মাঝে মাঝেই জলার ধারে একটি দুটি করে গণ্ডার, হাতী, হরিণ দেখতে থাকলাম। সবাই মোবাইলে ছবি তুলতে থাকলাম। কোথাও কোথাও চার পাঁচটা হাতীর দল, বুনো মহিষের দলও দেখলাম। একটা কাঠের সাঁকো র নিচে একটা বড় শোল মাছ অনেকক্ষণ এক জায়গায় থেকে আমাদের দর্শন দিল। কয়েকটা বুনো শুয়োর, একটা কচ্ছপ আর একটা মাছরাঙা পাখি দেখলাম। এই জঙ্গলে পাখী বিশেষ দেখলাম না। একটা লম্বা জলার এক পাশে, ফাঁকা মাঠে চারটি বাচ্চা নিয়ে চারটি মা হাতী, তাদের কাছেই দুটি গণ্ডার চরতে দেখে প্রায় সবকটি জীপ দাড়িয়ে গেল। আমরা প্রচুর ছবি তুললাম। ঐ জলার উল্টো দিকে একটা ফাঁকা মাঠে একটি ওয়াচ টাওয়ার। অনেকে উঠে দেখছে। আমাদের গাড়ীর একজনও টাওয়ার ঘুরে এলেন। আমার আর নামার ইচ্ছা হল না। আসলে এর মধ্যেই এত বেশী বন্য প্রাণী দেখে নিয়েছি যে নতুন আর কিছু দেখার আগ্রহ ছিল না। জীপ গাড়ী ঘন্টা দুই সময় আমাদের প্রায় আট দশ কিলোমিটার ঘুরিয়ে এনেছে। সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ রিসোর্টে ফিরে এলাম। আমাদের দলের সবাই প্রচুর বন্য প্রাণী দেখে খুব খুশী।

বিকেলে তিনটে নাগাদ আবার মিনি বাসে করে সকলে চললাম, মাইল খানেক দূরের অর্কিড হাউস দেখতে। ওখানে গিয়েও দেখলাম গোটা তিরিশ গাড়ী করে অনেক পর্যটক পৌঁছে গেছেন। দেড়শ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। একটি সবুজ জালে ঘেরা অর্কিড হাউস অসংখ্য অর্কিড এ সাজানো। ওর উল্টো দিকে একটি ছোট মিউজিয়াম। আসামের , বিশেষ করে উপ জাতীয় লোকেদের তৈরী নানান রকমের জিনিষ দিয়ে সাজানো। পাশেই একটি বাড়িতে নানান রকমের বাদ্য যন্ত্র দিয়ে মিউজিয়াম করা হয়েছে। একজন শিল্পী প্রতিটা বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে, গান গেয়ে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একটা মুক্ত মঞ্চ মত চালায় বেশ কিছু শিল্পী বিহু নাচ গান করে দেখলেন। ঐ মঞ্চে সন্ধ্যে সাড়ে ছয় টা থেকে সাড়ে আটটা অনেক অনুষ্ঠান হয়। তার জন্য পরে আবার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়; আমাদের দেখা হয়নি। গেটের বাইরে বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানে নানান রকম স্থানীয় জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমরা কলকাতায় দুষ্প্রাপ্য কালো চাল কিনলাম এক কেজি। মাত্র একশ টাকা দিয়ে।

পরদিন সকালে আবার সবার স্যুটকেশ আগেই বাসে তুলল কুণ্ডুর লোক আর হোটেলের ছেলেরা। আটটা নাগাদ বাস তিনটি ছাড়ল। এবারে আমাদের গন্তব্য সোজা শিলং শহর। ফেরার পথেও রাস্তার পাশের মাঠে সাত আটটা গণ্ডার দেখলাম। আমরা গোটা ছয়েক জাতীয় অভয়ারণ্যে সাফারী করেছি, এত সংখ্যায় বন্য প্রাণী কোথাও দেখিনি। কোলকাতা থেকে প্লেনে বা ট্রেনে গুয়াহাটি পৌঁছে ঐ দিনই আড়াইশ কিমি দূরে কাজিরাংগা চলে যাওয়া যায়। ওখানে অনেক হোটেল। পরদিন সকালে সাফারী করে ঐ দিন ই গুয়াহাটি ফেরা যায়। গুয়াহাটি থেকে জোরহাট অনেক বাস চলে, তাতে করে ও কাজীরাঙ্গা যাওয়া যায়।

কাটা কুটি

কাটা কুটি; কাটাকাটি নয় কিন্তু। অর্থাৎ? কাটাকাটি মারামারির কথা বলতে চাইছি না। কাটাকুটিও যে কত বিচিত্র রকমের হয় ; তাই ভাবছিলাম। আমার মেয়ে সকালে উঠে কোনোকোনো দিন কফি বানিয়ে খায়, কোনোদিন তাও না। আমরা তো সকালের চাও বন্ধ করেছি বছর খানেক হল। এ সবই হল, বুড়ো বয়সের " ফিটনেস বাতিক!" মেয়ে বহুদিন ধরেই সকালের প্রাতরাশের জন্য বেশ কিছু সময় কাটাকুটি করে। একটা সবুজ আপেল কেটে টুকরো টুকরো করে, এটা জানতাম। ঐ সবুজ আপেল সব ফলের দোকানে পাওয়া যায় না; আমি হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে, কলকাতা থেকে কিনে আনতাম। আর কি কি কাটাকুটি করে খুব একটা খোঁজ খবর রাখতাম না। আমার আবার এই সকাল থেকে কাটাকুটির সময় থাকতো না। বিশেষ করে শীতের সকালে ডিউটি থাকলে তো খুব দ্রুত কিছু খেয়ে দৌড় দিতে হত, ট্রেন ধরার জন্য। অবসর পেয়ে গিয়ে এখন তো হাতে যথেষ্ট সময়। সাথে সাথে বয়স হয়েছে, এটা মনেও থাকছে। তাই ঐ খাওয়ার জন্যও একটু বেশি সময় দিতে হচ্ছে। এখন আমিও প্রায় সব দিনই সকালে কাটাকুটি শুরু করেছি। খাদ্য তালিকায় মুড়ি কমে গিয়ে ফলের জায়গা হয়েছে। মেয়ে অবশ্য শুধু ফল নয়, সাথে ডিমও কাটাকুটি করে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, খুব ছোটবেলায় আমরাও কাটা ডিম সেদ্ধ খেতাম। সে ছিল , অভাবের কাটা। গোটা ডিম সবার কপালে জুটত না। মা বা দিদি কি করে ডিমের কুসুমটাকে সমান করে কেটে ফেলত, সেটা কিন্তু একটা রহস্য। আমি কিন্তু এখনও, মেয়ের মত , ডিমটিকে নিয়ে কাটাকুটি করি না। এখনও সেদ্ধ ডিম কাটার জন্য দাঁতের ব্যবহারই করে যাচ্ছি। এই যে ছুরি দিয়ে ফল কাটা, এটা কিন্তু সব সময় চলে না। বিশেষ করে পূজার জন্য যে ফল কাটা হয়; সে সময় কিন্তু ফল কাটার জন্য বটি ব্যবহারই বিধেয়। সে বটিও হতে হবে, পূজার ফল কাটা বিশেষ বটি। যে সে বটি দিয়ে পূজার ফল কেটে ফেললেই তো আর চলবে না। ভুল করেও " আঁশ বটি" ব্যবহার , নৈব নৈব চ! এই আঁশ বটি ব্যবহারও সবার দ্বারা হয় না। সবথেকে পুরাতন মাছ কাটার যে দৃশ্য আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল, সেটা ছিল একটা দশ কেজির বেশি ওজনের কাৎলা মাছ কাটার দৃশ্য। সে কাহিনী নিজেই একটা দিন চাইবে, আমার এই মোবাইল সাহিত্যের কাছে। ব্যাপারটি ছিল এক বন্যার জলে ভাসা পুকুর থেকে ধানের ক্ষেতে চলে আসা মাছ ধরার কাহিনী। সেটাই ছিল আমার দেখা প্রথম বন্যা। তারপর তো পরপর অনেক বছর ধরেই অনেক বন্যা দেখেছি। আমাদের বাড়ীর কাছেই, উত্তর দক্ষিনে চলে যাওয়া বড় রাস্তা জলের তোড়ে ভেঙ্গে গেল। আমরা সে সময় বলতাম " হানা" পড়েছে। সেই হানা দিয়ে পশ্চিম দিকের মাঠে জমে থাকা বন্যার জল পুব দিকে নেমে আসতে থাকল, প্রবল বেগে। ঐ হানার কাছের জলে অনেক বড় বড় মাছ লাফালাফি শুরু করলো। গ্রামের যতো জোয়ান লোক, জাল নিয়ে বন্যার জলে নেমে গেল, মাছ ধরতে। আমার দাদাও সেই খেলায় অংশ নিয়েছিল। একটা জলে ডুবে থাকা ধানের ক্ষেত থেকে ঐ বিশাল বড় কাতলা মাছটি দাদা ধরেছিল। সেই মাছ কাটার মত বড় আঁশ বটি গোটা গ্রামেই ছিল না। আমাদের বাড়ীর সব্জী কাটার বড় বটিতেই সেই মাছ কাটার জন্য ডাকা হল, গ্রামের বিখ্যাত লক্ষী দিদিকে। লক্ষী দিদি সেই বিশাল মাছ কাটাকুটি করলেন। জানিনা, শেষে লক্ষী দিদি তাঁর সেই বিখ্যাত গালাগালটা মাছকেও দিয়েছিলেন কি না। আগেও বলেছি কয়েকবার; আবারও বলি। দিদি বিরক্ত হলেই বলতেন, " অমন মাছের মুয়ে ঝ্যাটা মার!" এই আঁশ (টে) ব্যাপারটাই গোলমেলে। পূজার ফল কাটা নিয়ে যেই আঁশ বটি এসে গেল, গব গেল গণ্ডগোল হয়ে। যাই হোক; এই সময় ছাতা মাথায় দিয়েও বেরোতে হল। টিটাগড়ের চেম্বারে দুজন আসবেন বলে সকালেই নাম লিখিয়েছেন। অগত্যা বেরোতেই হল। এটাও বলে রাখি; এরকম বেশ কয়েকবার হয়েছে, আমি বৃষ্টির মধ্যেও পৌঁছে গেছি। কিন্তু যাদের জন্য যাওয়া তারা আর এলোই না। হয়তো বা সন্টুকে ফোন করে বলে দিল, বৃষ্টি পড়ছে, আজ আর যাচ্ছি না। কিন্তু ডাক্তার যদি কোন কারণে আটকে পড়ে, তখন দুই এর জায়গায় পাঁচটা কথা শুনিয়ে যাবে। থাক ওসব কথা। দমদমের চার নম্বর প্লাটফর্মে পৌঁছনোর পর দেখতে পেলাম, প্ল্যাটফর্মের কালী মন্দিরের সামনে বসে একজন মানুষ পূজার ফল কাটাকুটি করছেন। তাই আবার পূজার ফল কাটাতে ফিরতে পারলাম। বাড়ীতে, আজন্ম মা বা বড় দিদিকে পূজার ফল কাটতে দেখেছি। স্কুলের সরস্বতী পূজার ফল কাটার দায়িত্ব সব সময়ই উঁচু ক্লাশের মেয়েদের ছিল। শহরের যে সব স্কুলে মেয়েরা ছেলেদের সাথে পড়ত না, সেখানে কি ব্যবস্থা হত, আমার জানা নেই। আসলে ঐ ব্যাপারটাতে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। আমাদের বাড়ীতে বড় অনুষ্ঠান বলতে আমরা জানতাম, অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন। পূজার ফল , মা বা ঐ লক্ষী দিদির মত পাড়ার মহিলারাই কাটতেন। কিন্তু ফল কাটা ছাড়াও আর একটা কাটাকুটির ব্যাপার বেশ একটা জমকালো, দেখার মত জিনিস ছিল। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের কিছু মানুষকে খিঁচুড়ি প্রাসাদ খাওয়ানো হত। সামান্য কিছু হলেও, খিঁচুড়ি প্রাসাদ এর সাথে ব্যঞ্জনও থাকত। সেই ব্যঞ্জনের জন্য তরকারি কাটার ব্যাপারটি আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়ে যেত। কম কিছু সব্জী কাটার ব্যাপার থাকলে বাড়ীর মহিলারাই কাটতেন। কিন্তু ব্যাপার বাড়ী হলে তো আর সামান্য সব্জির কাজ ছিল না; তখন পাড়ার দুই চার বাড়ী থেকেও বটি আসত। মহিলা এক দুই জন থাকলেও জোয়ান লোক জনই বেশী কাটাকুটি করছেন, দেখেছি। পূজার ফল কাটা নিয়েও যে কত রকমের জটিলতা দেখা দেয়! আবাসনের কালী পূজার

সময় কে কে ফল কাটবে, আর কে গোঁসা করে নিচে পূজার জায়গায় নামবেই না; সে বড় জটিল অংক। এই সব কাটাকুটির অংক মেলাতে না পেরে; বছর দুই পূজাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এবার আবার পূজা হল। আমার, রেলের ইঞ্জিনিয়ার মেয়ে, মায়ের সাথে ঐ, পূজার ফল কাটাকাটি করতে বসে গেল। কয়েকজন মাতৃ স্থানিয়া মহিলা ওকে নানা রকম নির্দেশ দিতে বসে গেলেন। " মুসম্বি আ-উ- র্গা পিলে কাটো, আপেল সিধা পিলে কাটা উচিত " এই রকম। ঐ যে দুটি প্রায় বিজাতীয় শব্দ ব্যাবহার করলাম; সেটা একটি পুরনো স্মৃতির রোমন্থন। আমার বড় জামাইবাবুর মাকে আমি ছোট বেলায় দেখেছি; বেশ শন সাদা চুলের বৃদ্ধা। উনি নিজের বড় নাতনীর সাথে ঐ রকম এক বিচিত্র ভাষায় কথা বলতেন। সেই নাতনী, মানে আমার বড় ভাগ্নী এখনও মাঝে মাঝে সেই ঠাকুমার কাছে শেখা, বিচিত্র ভাষায় কথা বলে। সেই সব ' ইন্দির ঠাকরুন' ইতিহাসে চলে গেছেন, অর্ধ শতাব্দী আগেই। তাঁদের কিছু কিছু চিহ্ন এই নাতনীদের মধ্যে দেখতে পাই। আমি এখনও বটি ব্যবহারেই বেশী স্বচ্ছন্দ। ফল কাটার জন্য ছুরি ব্যবহার করলেও, সব্জী কাটতে হলে, বটিই বের করি। এখন বাড়ীতে পূজার ফল কাটা বটি একটা আলাদা থাকলেও, আনাজ আর মাছ কাটার একটিই বটি। মাছ কাটার বটি বললাম বটে, বাড়ীতে মাছ কাটার পাট উঠে গেছে , সে বোধ করি বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশ তো হবেই। বাজারে মাছ কাটার জন্যই কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ছোট বড় সব মাছই বাজার থেকে কেটেই আনা হয়। বাজারে এঁচড় কেটে বিক্রী করে, অনেকদিনই লক্ষ করেছি। কোন কোন সব্জী মাসি, কচুর শাক, লতি কেটেকুটে দিচ্ছে , কেউ কেউ কলার মোচা কাটছে,দেখেছি। কিন্তু একটা বাঁধা কপি কিনে রেখে গেছেন, পরে কেউ এসে কেটেকুটে দেবে; এই ঘটনা দেখেই মনে হল, " কাটাকুটি" নিয়েও কিছু লেখা যায়। আসলে কাটাকুটি তো আর শুধু ফল আর সবজিতেই আটকে নেই। এই অধম চোখের ডাক্তার, এক সময় নিয়মিত মানুষের চোখ কাটাকুটি করেছে। সেটা কোন খবর নয়। এই লোকটাই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে, বাড়ীর পোষা গরুদের জন্য " ছানি" কেটেছে; এই খবরটা অনেকের কাছে একটু বাড়াবাড়ি মনে হলেও অবাক হব না। ১.১২.২৪.

প্রকৃত বন্ধুর মত কাজ

প্রায় ৬৪ বছর বয়সে প্রথম পড়লাম, জার্মান ভাষায় লেখা ফ্রানৎস কাফকার লেখার কিছু বাংলা অনুবাদ। এই ৬৪ বছর বয়সে প্রথম পড়লাম, এই কথা থেকেই ঠিক বোঝা যায়, বিশ্ব সাহিত্যের কোন খবরই আমার জানা হয়নি। মনে আছে, মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় একবার দিদির মত কয়েকজন সাহিত্যের শিক্ষিকাকে বলেছিলাম, কতদিনে রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ার সময় হবে জানিনা, এ জীবনে শুধু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এর লেখাগুলিই সব হয়তো পড়া হবে না। পরে অবশ্য ছাপার বইতে না হলেও, পিডি এফ এ কয়েক হাজার পৃষ্ঠা রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ার সময় পেয়েছি।
আমার এক ডাক্তার ভাই প্রচুর বই পড়ে। ওকে নিয়ে আমরা মজা করে বলি, ওর ব্যাগ ভারী থাকে, কারণ ওর ব্যাগে সবসময় এক খন্ড কথামৃত আর কটা বিবেকানন্দ রচনাবলী থাকে। এই ভাইয়ের ছেলে জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে গেছে। ওখানে গিয়ে তার বাবাকে কাফকা পড়তে বলেছে। আমি কাফকা পড়ছি শুনে এই ডাক্তার ভাই বলেছিল, " ওতো বুদ্ধবাবু পড়তেন!" এ কথা শুনে আবছা মনে হচ্ছে, বুদ্ধবাবু কোথায় কোথায় যেন কাফকার নাম উচ্চারণ করেছিলেন। তখন সময় ও ছিল না। আর সম্ভবত তখনও কাফকার কোন বাংলা অনুবাদ ছিল না।
বাংলাদেশের এক কাফকা গবেষকের বাংলা অনুবাদ পড়তে গিয়ে বুঝলাম, এত দেরি করে কাফকা পড়ছি, এটা ভদ্রলোকের কাছে বলাই ঠিক নয়। ঐ বাংলাদেশী গবেষকের লেখা পড়ে জানলাম, ২০১০ সাল পর্যন্ত গোটা বিশ্ব সাহিত্যে কাফকা নিয়ে যত বই লেখা হয়েছে, তার তালিকাটি চারশ পৃষ্ঠার একটি বই। অথচ মজার কথা হল, ১৯২৪ সালে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত , কাফকা মাত্র সাড়ে তিনশ পাতা প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন। মাএ একচল্লিশ বছর বয়সে মারা যাওয়ার কয়েকমাস আগে বুঝতে পেরেছিলেন, বেশিদিন আর নেই। তখন তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে একটি চিঠি লিখে, টেবিলে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রড নানান কাগজের মধ্যে ঐ চিঠিটি খুঁজে পান।
কি ছিল ঐ চিঠিতে? কাফকা তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন, আমার লেখা যা কিছু পড়ে থাকবে, সব পুড়িয়ে ফেলো। আমার পাণ্ডুলিপি, নোট বই, চিঠি যেখানে যা পাবে, সব পুড়িয়ে ফেলো। কাফকার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। সব কাগজ পত্র বন্ধু ম্যাক্স ব্রডের হাতেই ছিল। আর সেটা যে উপযুক্ত লোকের হাতেই পড়েছিল সে তো আমরা তাঁর মৃত্যুর একশ বছর পরও দেখতে পাচ্ছি। ম্যাক্স ব্রডের প্রাণপণ চেষ্টায় কাফকার মৃত্যুর পর প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠা বিভিন্ন বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।
এই কাফকা কোথাকার লোক ছিলেন? বর্তমানের চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরের মানুষ ছিলেন কাফকা। আদতে ওনারা ছিলেন জার্মান ইহুদী। এই ইহুদী কথাটা থেকেই একটা ধারণা করা যায় যে, কী ভয়ংকর পরিবেশে ওনাদের বেড়ে ওঠা। উনি একদিক থেকে ভাগ্যবান ছিলেন বলা যায়; হিটলারের প্রাগ শহর দখলের অনেক আগেই উনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পেরেছেন। বন্ধু ব্রড কিন্তু নাৎসী বাহিনীর অত্যাচারে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে দেশ ছাড়ার সময় ব্রড কিন্তু বন্ধুর লেখা কাগজ পত্র ব্রিফ কেস এ ভরে নিয়ে গিয়েছিলেন। হিটলার জমানার আগে ম্যাক্স ব্রডের প্রাণপণ চেষ্টায় গোটা তিনেক বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারে সেই সব বই জার্মানিতে পড়াটাও অপরাধ বলে গণ্য হত। ইহুদী প্রকাশকরাও জার্মানী ছাড়তে বাধ্য হন।
বন্ধু ম্যাক্স ব্রডের হাতেই যে কাফকার অমূল্য পাণ্ডুলিপি চিঠি ইত্যাদী পড়েছিল সেটা পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্য পাঠকদের সৌভাগ্য। এই সকল পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির দাম কত? ২০১০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কাফকার যে সকল পাণ্ডুলিপি ছিল, তার দাম ধার্য করা হয় দশ কোটি পাউন্ড। অবশ্য ওরা কোন মূল্যেই সেগুলি বিক্রী করবেন না। আমার মত যারা প্রায় কিছুই কাফকার লেখা পড়িনি, তাদের জানলে উৎসাহ বাড়বে এমন কয়েকটি কথা বলি। বত্রিশ জন নোবেল পুরষ্কার প্রাপক সাহিত্যিক বলেছেন যে, তাঁদের লেখাতে কাফকার প্রভাব আছে। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি দশ দিনে একটি করে বই প্রকাশিত হয়েছে, কাফকা নিয়ে। কাফকার মেটামরফসিস বা রূপান্তর গল্পটিকে বিশ্ব সাহিত্যে প্রথম কয়েকটি লেখার মধ্যে ধরা হয়। আজকাল নেটে সার্চ করলেই বাংলা অনুবাদ এ সহজেই পাওয়া যায়। ইউ টিউব এ অন্তত ছয় জনের পাঠ আছে এই রূপান্তর গল্পটি। আমার এই লেখা পড়ে আপনি যদি কাফকার কোন লেখা পড়ার উৎসাহ পান, পড়ে তারপর জানাবেন। ২৪.৯.২০২৪.

কেরানীর কেরামতি

সরকারী আপিসে কোন কাজে গিয়েছেন, দিনের দিন হয়ে গেছে, এমন যদি কখনো হয়ে যায়; বুঝবেন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। সরকারী আপিসে কাজে গিয়ে হতাশ হননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এর কারণ কি? আগে শুনতাম , কর্মচারীরা ঘুষ বা উপরি পাওনা না পেলে কাজ করে না। তারপর তো দুটি প্রজন্ম দেখল, কাজের জায়গায় লোকটি নেই। আছে তাঁর ব্যাগটি বা ছাতাটি। খোঁজ করুন, জানবেন, সমিতির কার্যালয়ে মিটিং এ গেছেন। এই সমিতি, যেটাকে " কো. কমিটি " নামে দেখেছি, সে যে কি বিষম বস্তু, ভুক্তভোগী না হলে বোঝানো যাবে না। আমি দীর্ঘদিন এরকম সরকারী আপিসে কাজ করে এখন অবসর নিয়ে, এরকম হাবি জাবি লিখে সময় কাটাচ্ছি। কি কাজ করতেন জিজ্ঞেশ করলে, বলতে লজ্জা পাই। মুখে যাই বলি না কেন, মনে মনে ভাবি, " আসলে তো সিদকাটি নিয়ে চুরি করতে বেরতাম!" ভেতর থেকে বেয়ারাপনা দেখেছি, তাই ও নিয়ে লিখতে চাই না। আমার পেশা ব্যবহার করতে যে সুযোগ পেতাম, সেখানে ফাঁকি দেওয়া একটু মুশকিল ছিল। আর শেষের দিকে তো যার জন্য বেতন পেতাম , তার বাইরের কাজই বেশী করতাম। কেমন যেন একটা নেশার মতো হয়ে গেল। অবসরের পর ছয় মাস কেটে গেল, এখনও এদিক ওদিক ছুটে যাই। আমি আজ শুধু একটি পুরোনো অভিজ্ঞতার কথা বলব। এখন অবশ্য অনলাইন হয়ে গেছে; আমার বাবার মত চুরানববই বছর বয়সে, পিচ গলা গরমে, ট্রেজারী আপিসে যেতে হবে না।

বাবা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমি ডাক্তারী পড়তে যাওয়ার আগে থেকেই দেখতাম, প্রতি বছর এপ্রিল মাসে , বাবা পঞ্চাশ কিমি দূরে মেদিনীপুর শহরে যেতেন। প্রথম দিকে তো আমাদের গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল হেঁটে গিয়ে বাসে উঠতে হত। বাবার নব্বই বছর বয়সের পর আমি মেদিনীপুর শহরে থাকতে শুরু করি। কয়েক বছর বাবা ঐ ট্রেজারিতে যাওয়ার সময় আমার ভাড়া বাড়ীতে এক আধ দিন থেকে যেতেন। আমি বাঁকুড়ায় থাকার সময় জানতাম, এপ্রিল মে মাসে ওখানে আগুন ছোটানো গরম পড়ত। মেদিনীপুরে থাকার সময় দেখলাম, কুয়ার জল শুকিয়ে যায়। আমি উত্তর বঙ্গে চাকরী করতে চলে গেলাম। এক বছর বোধহয় বাবা নিজেই এপ্রিলে ট্রেজারী আপিসে ঘুরে গেছেন। তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না। একদিন একটি পোস্ট কার্ড পেলাম; বাবা লিখেছেন, তুমি একবার পারলে বাড়ী আসো। আমি মেদিনীপুরে না গেলে পেনশন বন্ধ হয়ে যাবে। দুই এক দিনের মধ্যে বাড়ী এলাম। বাবার শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। বেশ গরমও পড়েছে। দাদা আলাদা করে ডেকে বলল, মেদিনীপুর শহরে এখন যা গরম , বাবা ওখানে গিয়ে আর বেঁচে ফিরতে পারবে না। এদিকে বাবা মায়ের ইচ্ছা, আমি তাঁদের একবার নিয়ে যাই। বাবা বললেন, মেদিনীপুর শহরে পেনশন প্রাপকদের সংগঠন এর সম্পাদক একজন প্রধান শিক্ষক আছেন, আগে তাঁর সাথে দেখা করে কি বলেন জানতে। আমাদের গ্রামে তখন গাড়ী ভাড়া পাওয়া যেত না। কয়েকটা বাস চলত। বাবাকে বাসে নিয়ে যাওয়ার সাহস পেলাম না। আগে গিয়ে একবার সেই হেড স্যারের সাথে কথা বলে দেখি; এই ভেবে আমি গেলাম মেদিনীপুর শহরে। ওনার লেখা পোস্ট কার্ড বাবার কাছে দেখলাম। যেতেই হবে। মেদিনীপুরে নেমে স্যার এর বাড়ী যাওয়ার সময় দেখলাম, গরমে রাস্তার পিচ নরম হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন খুব কম। স্যার এর একতলা বাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ। ডাকাডাকি করে সাড়া পেলাম। ভেতরে ঢুকে পরিচয় দিলাম। উনি বললেন, তোমার বাবাকে তো চিঠিতে সবই লিখেছি। এবার নিয়ম খুব কড়া। সবং থেকে একজন শিক্ষককে এম্বুলেন্স এ করে আনতে হয়েছে। এই সময় স্যার ট্রেজারী আপিসের এক কেরানী বাবুর নাম বললেন। সভয়ে বুঝলাম, ইনি আবার আমার বাবার ছাত্র। স্যার বললেন, " ইডিয়েটটা আমাকে বলে, আপনি ইংরেজী অর্ডারটা ঠিক বুঝছেন না। আরে ইডিয়েট, তুমি ইংরেজী কার কাছে শিখেছো!!!" ব্যাপার গুরুতর বুঝলাম। শহরের আরেক প্রান্তে আমার গুরু, প্রনম্য অরুণ বাবুর বাড়ী। রিক্সা নিয়ে চললাম তাঁর বাড়ী। ওনাদের কুষ্ঠ আশ্রমের একটি গাড়ী ছিল। বছর খানেক আগে মেদিনীপুরে চোখের শিবিরে অপারেশন করতে এসে সেই গাড়ীতে চেপেছি। মনে আশা, সেই গাড়ী পেতে পারি। ঐ ভয়ংকর দুপুরে অরুণ বাবু আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আবার আনন্দও পেলেন। কিন্তু আমার যাওয়ার কারণ শুনে বিরক্ত হলেন। সাথে সাথেই একটা ফাইল খুলে একটা লাইফ সার্টিফিকেট ফর্ম দেখালেন। আমি সরকারী ডাক্তার, অথচ ঐ ফর্ম এ কাউকে " বেঁচে থাকার প্রমান" দিই নি শুনে অবাক হলেন। পরে অবশ্য আমি অনেক দিয়েছি। সে যাই হোক, উনি বললেন, তুমি নিজে নিজের বাবার লাইফ সার্টিফিকেট সই করার দরকার নেই। বিকেল হোক, আমি আমার এক ভাইকে দিয়ে করিয়ে দেব। বিকেলে পাড়ার মধ্যেই এক অফিসার এর বাড়ী নিয়ে গেলেন। আমার পরিচয় দিয়ে, বাবার জন্য সার্টিফিকেট সই করে দিলেন। গুরু শুধু বললেন, আজই বাড়ী গিয়ে, বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে। আর যদি মেসোমশাই এর মধ্যে স্বর্গ পান, এটা ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে এলাম। মা তো গাড়ীর ব্যবস্থা হয়নি দেখে হতাশ। কিন্তু বাড়ী বসেই কাজটা হয়ে গেল, এটা বোধহয় হজম করতে ওদের সময় লেগেছিল। বাবার সই করিয়ে, ব্যাংক এ ওটা জমা দিয়েছেন, কাজ হয়ে গেছে; পরে পোস্ট কার্ড পেয়েছি।

এরপর বলি, আর এক করনিকের আর এক কেরামতির কাহিনী। আমাদের স্কুলের করণিকের প্রচণ্ড দাপট ছিল। মাষ্টার মশাই দের উপর ছড়ি ঘোরাত। তিনি স্কুলে ভর্তির সময় আমার বয়েস বছর খানেক বাড়িয়ে লিখে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য সৎ ছিলনা, পর পর অনেক কাজে প্রমান পেয়েছি। কিন্তু উনি আমার ক্ষতি করতে গিয়ে যে উপকারটা করে গেছেন, সেটা দেখার অন্তত পনের বছর আগে গত হয়েছেন। উপকার কি করেছেন। আমাদের চাকরী হঠাৎ পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত হয়ে গেল। ষাটের পর থেকেই দিন গুণতে শুরু করলাম। আর ভালো লাগে না। শরীরটা টেনে টেনে হাসপতালে নিয়ে যাই। এই অবস্থায় পাক্কা এক বছর আগে অবসর পেয়ে গেলাম; হ্যাঁ, সেই কেরানী বাবুর কেরামতিতে। আমার বন্ধু, কলেজের দাদা সব এখনও দাঁত কামড়ে চাকরী করে যাচ্ছে। ফোনে কথা হলেই বলে, তুই ভীষণ ভাগ্যবান। ওনাদের কেরামতি বহু কাজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিরক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু আমার স্কুলের সেই কেরানী আমার কতো উপকার করে গেছেন, সেটা দেখার সৌভাগ্য ওনার হয়নি। ৯.১০.২৪.

dayalbm@gmail.com

গীতার ২য় অধ্যায়, ৪৭ নং শ্লোক

এই একটি শ্লোকের কয়েক কোটি বার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। এবং এটা করা হয়েছে মধ্য যুগের শোষণ এর হাতিয়ার হিসেবে। আপনি " মা ফলেসু কদাচন" এই টুকু বলে যে কোন শিক্ষিত (?) মানুষকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এটা জানেন ...... এটুকু বলতে না বলতেই উত্তর পেয়ে যাবেন, " ঐ তো ফলের আশা করিয়ো না!"
কিন্তু ঐ শ্লোকটি পুরোটাই বলতে পারবেন এমন লোক লাখে একটাও পাওয়া যাবে না। @(দয়াল) এমনকি শ্লোক টি র প্রথম শব্দটিও লাখে একজন জানেন না। " কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেসু কদাচন।" এই হল শ্লোকটির প্রথম লাইন। ঐ প্রথম যুক্ত শব্দটি ভাঙ্গলে হয়, কর্মনি + এব+ অধিকার+ স্তে। এখানে অধিকার এর কথা বলা হয়েছে। গোটা শ্লোকে কোন শব্দ নেই যার মানে হয় " আশা করা!"
তোমাকে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, ফল দেওয়ার অধিকার নয়। একটা সামান্য উদাহরণ বলি। বোর্ডের বা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় যে ছেলে প্রথম হবে, বা ফার্স্ট ক্লাশ ফাস্ট হবে, সে যদি ভাবে, " আমার খাতা আবার কে মূল্যায়ন করবে, আমি নিজেই ১০০ বসিয়ে দিয়ে কাজটা সেরে রাখি!" কেমন হবে ব্যাপারটা? ওকে খাতায় উত্তর লেখার অধিকার দেওয়া হয়েছে, নম্বর দেবার নয়। নম্বর বসানোর অধিকার দেওয়া আছে কোন উচ্চতর যোগ্যতার মানুষকে।
যে পরীক্ষার খাতায় লিখে আসবে, সে তো ফলের আশা করবেই। (২৫.১২.২০২৩)

গুটি, কাঁচা না পাকা

গুটি ব্যপারটা আমাদের কাছে একটা খেলার জিনিস ছিল। মানে, যাকে বলে ছেলে খেলার ব্যাপার। আমরা ছোট বেলায়, অনেকদিন পর্যন্ত গুটি নিয়ে খেলেছি। আমার এক ডাক্তার ভাই আছে; আমার চাকরী জীবনের শেষ কয়েক বছর আমরা দুজনে একসাথে কাজ করেছি। আমি ওর থেকে বছর তিনেকের বড়। আমাদের কর্মস্থলের প্রথা অনুযায়ী, এই ভাই আমাকে দাদা বলেই ডাকে। এছাড়াও ওর সাথে আমার একটা বেশী কাছের সম্পর্ক আছে। ও আমার স্কুলেরও ভাই। ওর এক দাদা আমার সাথে স্কুলে পড়ত। সেই হিসেবে, ওকে আমরা কখনও কখনও দেশোয়ালি ভাই বলেও উল্লেখ করি। কাজের মাঝে একটু গল্প করার সুযোগ পেলে, আমার এই কমল ভাইয়ের সাথে , আমাদের পুরনো দিনের কথা হত। গ্রামের স্কুলের গল্প, গ্রামের কোন বয়স্ক মানুষ এর গল্প, গ্রামের রাস্তাঘাটের গল্প এইসব। এই কমল ভাইয়ের একটা কথা আমার কাছে বেশ মধুর, মায়াময় একটা স্মৃতি রোমন্থন এর সুযোগ করে দিয়েছে। ও বার দুই বলেছে, " আপনার ছোট বেলার একটা ছবি আমার বেশ মনে আছে। আপনি আর প্রীতিদা তেঁতুল তলায় গুটি খেলছেন।" আমাদের ছোট বেলার একটা খুব প্রিয় খেলা ছিল এই গুটি বা মার্বেল খেলা। মার্বেল পাথরের অন্য কোন আকার বা ব্যাবহার আমাদের তখন জানা ছিল না। অনেক পরে শহরে কাকার বাড়ীতে এসে জানলাম, আমাদের কাছে যা " গুটি" , সেগুলিকে এর বলে " গুল্লি।" কাঁচের গুল্লী আমাদেরও ছিল। কিন্তু আমরা একটু বড় আকারের, মার্বেল পাথরের তৈরি গুটি বেশী ব্যবহার করতাম। গ্রামের মাঝের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠ ছিল আমাদের খেলার মাঠ। এই মাঠে বিকেলের দিকে আট দশ জন, কখনও পনের জন জুটে যেতাম। ফুটবল পাওয়ার আগে, নানান গ্রাম্য খেলা চলত সূর্য ডোবার সময় পর্যন্ত। স্কুলে ভর্তির আগে পর্যন্ত সকালেও চলে যেতাম, ঐ মাঠের কোনায় , বড় রাস্তার পাশের বিরাট বড় তেঁতুল গাছের ছায়ায়, গুটি খেলতে। দুজন, তিনজন, চার জনেও খেলা হত। এমনকি ফুটবল খেলার মত দুই গ্রামের মধ্যে টুর্নামেন্টও হত। কিন্তু শহরে যেমন দেখি, কাঁচের গুল্লি নিয়ে বাচ্চারা এক রকম বাজী রেখে খেলছে, এই জিনিস আমাদের জানা ছিল না। প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় পর্যন্ত , বই খাতার ব্যাগে, দুই চারটা মার্বেল গুলি আমরা নিয়ে যেতাম। কবে যে সেই কৈশোরের পরম সম্পদ, মার্বেলের গুলি আমাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল, আজ আর মনে নেই। কবে যে সামান্য জিনিসে তুষ্ট হওয়ার মনটাই হারিয়ে গেল, বুঝলাম না। এই যে, শহরের বাচ্চাদের গুল্লী নিয়ে, বাজী রেখে খেলা; এটাই বোধহয় বড় হয়ে তাসের জুয়া খেলার মসকো। গ্রামের মেলায় একরকমের জুয়া খেলার আসর বসতে দেখতাম। অনেকটা পাশা খেলার দান দেওয়ার মত, কিংবা লুডোর ছক্কার থেকে অনেকটা বড় গুটি দিয়ে সেই খেলা হত। সেই দান ফেলার গুটি থেকেই সম্ভবত , মেদিনীপুরের গ্রামে , " গুটি লেগেছে" বলে একটা কথা বেশ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ যে ঐ জুয়ায় জ্যাকপট জিতল, তার " গুটি লেগেছে!" এটা কিন্তু শুধুই ঐ জুয়া খেলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় না। যে কেউ কোন ব্যবসায় ফাটকাবাজী করে ভালো লাভ করলেও বলা হয়, " অমুকের গুটি লেগে গেছে।" ঠিক এই শীতের শুরুর দিকে, মেদিনীপুরে, হুগলী, বর্ধমান জেলায় ব্যাপক ভাবে আলু চাষ শুরু হয়। আলুর বীজ, সার এসব নিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলে। কোন ব্যবসায়ী হয়তো কয়েকমাস আগে থেকে কয়েক ট্রাক আলু বীজ এনে রেখেছিল। হঠাৎ করে বীজ আলুর একটা বিরাট ঘাটতি দেখা দিল। ব্যাস, ঐ বীজ আলুর ব্যবসায়ীর " গুটি লেগে গেল।" কিন্তু পাকা গুটি কেঁচে যাওয়ার ব্যাপারটি কি? ব্যাপারটা তো সবাই জানি। কোন কাজ শেষ মুহূর্তে এসে পন্ড হয়ে গেল, এটা বোঝাতে ঐ শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখানে " গুটি" কোথা থেকে এসেছে? গুটি " পাকা" কথাটা, আমার যতদূর মনে পড়ে, লুডো খেলায় খুব ব্যবহার করা হয়। কিন্তু লুডো খেলার মত একটা বালখিল্য খেলার গুটি থেকে, এত ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ কি করে এসে গেল? হ্যা, লুডোকে বালখিল্য খেলা বলার জন্য, কেউ কেউ আবার আপত্তি জানাতে পারেন। সেই জন্যই বলে রাখি; বুলাদি এই লুডো খেলাকে জাতে তুলে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে তো আর সত্যিকারের কোন খেলা নয়। দিদির কথাই এল যদি, তাহলে আমার দিদিদের " পাঁচ গুটি" খেলাই বা বাদ যায় কেন। কোন সুদূর অতীত স্মৃতিতে জেগে উঠল, দুপুরে দুই বা তিন সখীর পাঁচ গুটি খেলা। বড় দিদি তো পঁচিশ বছর আগেই চলে গেলেন। আজ আর তাঁকে মনেপড়ে কি না, জিজ্ঞেস করার সুযোগ নেই। হাই স্কুলের গুরু গম্ভীর হেড মিস্ট্রেস পদ থেকে অবসর নেওয়া দিদিকে এখন, পাঁচ গুটি খেলার কথা জিজ্ঞেস করলে, ধরে বেঁধে মানসিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবে। খুবই গ্রাম্য খেলা বা গ্রামের প্রচলিত কিছু কথা বলছিলাম, তাই মালদা জেলার একটা গ্রাম্য কথা মনে পড়ে গেল। মালদা বললে আমরা সবাই " আম" বুঝি। সেই মালদা জেলার চাঁচলে একবার " গুটি আম" কথাটা শুনেছিলাম। ওখানে ভরা আমের মরশুমে যাতায়াত ছিল, কয়েক বছর। তখনই জেনেছিলাম; মালদার ভালো জাতের যে সব আম হয়, সেই সব আমের বাগানের আম, ভালো জাতের আমের গাছের ডাল থেকে তৈরী কলমের চারা গাছ থেকে বড় হওয়া গাছেই হয়। যতো ভাল আমই হোক, তার আঁটি থেকে যে গাছ হয়, তাতে আসল আমের মত ভালো আম হয় না। এই নিম্ন মানের আমের নাম বা শ্রেণী হল " গুটি আম।" আমরা তো মালদার আম শুনেই এসেছি। ঐ চাঁচোল থেকে আম কিনেও দেখেছি, তেমন উৎকৃষ্ট মানের মনে হয়নি। সেটার কারণ বোঝাতে ঐ গুটি আমের বৃত্তান্ত আমাকে বুঝিয়েছিল, আমার পরিচিত

ছেলেটি। আচ্ছা, কথাটা গুটি না, কি " ঘুটি?" আমি তো আজীবন গুটি বলে এসেছি, তাই ভুল হলেও, গুটি কথাটাই লিখলাম। আর এক গুটির কথা আজ আর লিখলাম না। আমরা যারা ১৯৮০ এর দশকে ডাক্তার হয়েছি, তারাই কোনোদিন দেখিনি। শুধুই বইতে পড়েছি। সে হল, একদা বিশ্বত্রাস, " গুটি বসন্ত।" ২.১২.২৪.

মহাকাব্যিক অভিসন্ধি

এই শব্দবন্ধ ভাদুড়ী মশাই বারবারই ব্যবহার করেছেন। আমি আজ যে কাহিনী বলতে চাইছি সে প্রসঙ্গে ভাদুড়ী মশাই এরকম কোথাও লিখেছেন কি না আমার চোখে পড়েনি। হিরিম্বা রাক্ষসীর সাথে ভীমের বিয়ে হল। তাঁদের ছেলে ঘটোৎকচের জন্মের পরই ভীম আবার অন্য ভাইদের সাথে মিলে এদিক ওদিক ঘুরতে শুরু করলেন। পাণ্ডবদের গতিবিধি, বড় বড় ঘটনা চলতে থাকলে আমরা ভীমের সেই ছেলে ঘটোৎকচকে প্রায় ভুলেই যাই। আসলে হিরিম্ব রাক্ষসের বনের মাঝে যে রাজ্যে পাণ্ডবরা ঢুকে পড়লে ঐ সব ঝামেলায় পড়েছিলেন, সেই রাজ্যের রাজা হয়ে, ঘটোৎকচ বেশ ভালই রাজ করছিলেন। ভীমের সাথে হিরিম্বার বিয়ের সময়টা মনে করে দেখুন। জতুগৃহ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরে পাণ্ডবরা তখন দুর্যোধনের নাগাল থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছেন। সহায় সম্বলহীন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওনারা ঐ হিড়িম্ব রাক্ষসের বন এ এসে পড়েছিলেন। বেশ তো, রাক্ষসের পাল্লায় পড়ে প্রাণ যাচ্ছিল , তাই মহাবলসালী ভীমের লড়াই হল রাক্ষসের সাথে। তারপর এক রাক্ষসীর সাথে ভীমের বিয়ে হল কেন? তখন তো ওনারা কোথায় থাকেন, কি খান, গাছ তলায় শুয়ে রাত্রে ঘুমান। এরকম অবস্থায় কারো বিয়ে করতে ইচ্ছা করে? নাকি পাত্রী পাওয়া যায়? তবুও তো হল। এখানেই সেই মহাকাব্যিক অভিসন্ধি! হিরিমবা রাক্ষসীর কাতর অনুরোধে মা কুন্তি রাজী হলেন মেজ ছেলের বিয়ে দিতে। তখনও বড় ভাই যুধিষ্ঠির এর বিয়ে হয়নি। ভীম বিয়ে করে হিরিমবার সাথে চলে গেলেন। ঠিক এক বছর পর ওদের পুত্র ঘটোৎকচ জন্মালে, ভীম ওদের বনেই রেখে অন্য ভাইদের সাথে চললেন। তারপর তো অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত বিরাট ঘটনা। এক দ্রৌপদীর সাথে পাঁচ ভাইয়ের বিয়ে। পাণ্ডবদের বাড়ী ফিরে আসা। নতুন রাজ্যে রাজসূয় যজ্ঞ। বিশাল বিশাল ঘটনা আমাদের দেখতে হল। এর মধ্যে কোন বনের মাঝে এক রাক্ষসী মায়ের ছেলের কি হল, কে খবর রাখে!

না, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর বংশের সবথেকে বড় বংশধর, দূর বনের রাজা ঘটোৎকচকে ভুলে যাননি। রাজসূয় যজ্ঞ এ তারও নিমন্ত্রণ ছিল। রাজা ঘটোৎকচ মাকে নিয়ে এসেছিলেন। হাতির পিঠে প্রচুর সোনাদানা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির পাশে বসিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, আমাদের বড় ছেলে বলে। আর রাজমাতা হিরিম্বার যে বর্ণনা এই সময় দেওয়া হয়েছে, সেটা বেশ চিত্তাকর্শক I আমাদের কবি কাশীরাম দাস তো তাঁকে " মেঘের কোলে সৌদামিনী" যেমন হয়, সেরকম চোখ ধাঁধানো সুন্দরী বলেছেন। যেখানে রানীরা সব বসেছিলেন, শ্বাশুড়ি মা কুন্তী তাঁকে সেখানে গিয়ে বসতে বলেন। হিরিমবার চোখ ধাঁধানো রূপের কাছে দ্রৌপদীও চাপা পড়ে যান। সে এক মজার খটামোটি লেগেছিল। সে কথা পরে হবে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। এই রাজসূয় যজ্ঞ শেষে যে যার বাড়ী ফিরে গেল। এখানে পাণ্ডবদের বিপুল ধনসম্পদ দেখে দুর্যোধন এর ভয়ংকর লোভ আর ঈর্ষা হল। তার থেকেই পশাখেলা। পাণ্ডবদের বনবাস। এই বনবাসের মাঝেই অর্জুন নাগ কন্যা উলূপী আর মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছেন। অর্জুন স্বর্গে গিয়ে নানান দিব্যস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। বনবাসের শেষে ফিরে এলেও পাণ্ডবদের রাজ্য ফেরৎ দেওয় হলনা। লাগল কুরুক্ষেত্রের মহা যুদ্ধ। গোটা ভারতের প্রায় সব রাজাই দুই দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে চলে এল। কৌরবদের পক্ষে বিশাল বিশাল বীর যোদ্ধা যুদ্ধ করছেন। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ন, দুর্যোধন ইত্যাদি। ওদিকে পাণ্ডবদের প্রধান যোদ্ধা ভীম আর অর্জুন। কর্ণের কাছে আছে ইন্দ্রের দেওয়া অব্যর্থ অস্ত্র একাঘ্নী বান। এই বানটি কর্ন যত্ন করে রেখে দিয়েছেন, অর্জুনের জন্য। এতো সকলেই জানি, অর্জুনের জন্যই পাণ্ডবরা অপরাজেয়। অর্জুন শেষ মানেই পাণ্ডবরা শেষ। @দয়াল বন্ধু

পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করতে নেমেছে বীর অভিমন্যু। উলুপির ছেলে ইরবানও এসেছে যুদ্ধে বাবাকে সাহায্য করতে। আসেনি একমাত্র চিত্রাঙ্গদার পুত্র বব্রুবাহন। ভীমের পুত্র ঘটোতকচও বাবার দলে যুদ্ধ করতে এল। মহাযুদ্ধে অর্জুন এর ছেলে অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে মারল। সে মরেও মহাকাব্যের নায়ক হয়ে গেল। ভীম তো একাই কৌরব ভাইদের সকলকে মারলেন। ঘটোৎকচ রাক্ষস। তার চেহারা বিশাল , পাহাড়ের মত। সে যুদ্ধে নেমেই হাজার হাজার কৌরব সৈন্য মেরে ফেলতে শুরু করেদিল। এক সময় এমন অবস্থা হল, তার ভয়ে সকল কৌরব সৈন্য প্রাণ নিয়ে পালাতে শুরু করে দিল। ঐ দিনই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। দুর্যোধন জানত কর্ণের কাছে আছে একাঘ্নী বান। শেষ উপায় হিসেবে দূর্যোধন সেই বান দিয়েই ঘটোৎকচকে মারতে বলল, কর্নকে। প্রবল অনিচ্ছা সত্বেও কর্নকে সেই একান্ত ভরসার দিব্যাস্ত্র খরচ করে ঘটোৎকচকে মারতে হল। ঘটোৎকচ নিজের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে গেলেন অর্জুনকে।

ঘটোৎকচের জন্মের এটাই হল মহাকাব্যিক অভিসন্ধি। এত বছর পর, এরকম একটা মহা যুদ্ধের মহা সন্ধিক্ষণে কাজে লাগবে, তাই মহা কবি এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভীমের সাথে এক রাক্ষসীর বিয়ে দিয়েছিলেন।

চেম্বারের নাটক?

অনেকদিন আমার চেম্বারে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা লেখা হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, বছর দুই আগে শেষ লিখেছিলাম। সেই যে বাচ্চা কোলে এসে, এক কম বয়সের গৃহ বধূ, করুন ভাবে অনুরোধ করেছিল; তার স্বামীকে মদ খেতে বারণ করতে। এবারও এক মহিলা , বয়স বলল, আঠাশ বছর। বিবাহিতা কি না বোঝা গেল না। সম্ভবত না। যার সাথে এসেছিল, তিনি সম্ভবত এই মহিলার ভাবি। অবশ্য " ভাবি" বলে একবারও ডাকতে শুনিনি। অনেকসময় পাড়া প্রতিবেশী কারও সাথেও আসেন, এরকম বয়সের মহিলারা। তবে কিনা, বহু বছর ধরে এরকম দেখতে দেখতে, একটা নিজস্ব দেখার চোখ তৈরী হয়েছে। অবশ্য মাঝে মাঝে ভুলও হয়েছে। যার চোখ দেখলাম তার সাথের কিছুটা কম বয়সের মহিলাকে হয়তো বোঝানোর চেষ্টা করলাম, রোগের গুরুত্ব। আপনার মায়ের চোখের কিছু পরীক্ষা করতে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে হবে; এই বলার পর হয়তো বললেন, আমার মা না, পাশের বাড়ির লোক। কিংবা আরও মধুর ভাবে বললেন, " আমার মা না, এটা আমার বৌদি।" সে যাই হোক, দুজন মহিলা এসেছিলেন। আমার বহু বছর এর অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আসল যে সমস্যার জন্য আমার কাছে এসেছেন, ঠিক সেই সমস্যার কথা খুবই কম লোকে , প্রথমে বলে। নানান আনুষঙ্গিক কথা বলে সময় নষ্ট করছেন দেখে, প্রায়ই বলতে হয়, " ঠিক কোন অসুবিধার জন্য এখন এসেছেন, সেটা আগে বলুন।" এই মহিলা কিন্তু ঠিক যেজন্য এসেছেন, সেটাই বললেন। ওনার দুই চোখ লাল হয়েছিল দিন পাঁচেক আগে, ওষুধের দোকান থেকে একটা চোখের ড্রপ দিয়েছিল, সেটা লাগিয়ে লাল কমে গেছে। তবুও, সম্ভবত ওষুধের দোকানদার বলেছিল, একবার চোখের ডাক্তার দেখিয়ে নিতে, তাই এসেছেন। অনেকের ধারণা, " হাঁড়ী কাঠের মত" যন্ত্রে মাথা রেখে বসলেই ডাক্তারের পক্ষে চোখ দেখা সম্ভব। আসলে কিন্তু আমাদের মত চুল পাকিয়ে ফেলা ডাক্তারের চেম্বারের দরজার কাছে দাঁড়ানো অবস্থায়ই রুগী দেখা শুরু হয়ে যায়। একজন রুগী দু হাত সামনে বাড়িয়ে, বাতাস হাতড়ে ঢুকছে , এর মানে সে সম্পূর্ণ অন্ধ। তাঁকে তো আর সামনের আলোজ্বলা বাক্সে কি লেখা আছে, পড়তে বলার কোন মানে হয় না। আবার হয়তো মায়ের কোলে, তোয়ালে জড়িয়ে আনা, ক্ষুদ্র একটি মানব শিশু এসেছেন, আমার ঐ গলির ভেতর প্রায় চোখে না পড়া (ঐন্দ্রিল ভাই বলেন, খুপড়ি) চেম্বারকে পবিত্র করতে। ওকে তো আর ঐ হাঁড়িকাঠের সামনে বসতে বলি না। নতুন মা ওকে নিয়ে চেয়ারে বসতে বসতেই, ব্যাগ থেকে টর্চ লাইট বের করি। এরকম কতো ভাবেই আমাদের রুগী দেখা শুরু হয়ে যায়, কোন যন্ত্র পাতি ছাড়াই। আমাদের মত পুরনো দিনের ডাক্তারের কাছে কিন্তু , নিজের চোখ আর কানের দাম অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রের থেকে বেশী। এই মহিলা আমার সামনের মেশিনের উল্টো দিকে বসার সাথে সাথেই আমার চোখে পড়ল, ওনার দুটি চোখ সমান ভাবে খোলা নেই। বাম দিকের চোখ ডান দিকের থেকে বেশী খোলা মনে হচ্ছে। কিংবা, ডান দিকের চোখ বাম চোখের থেকে একটু কম খোলা লাগছে। উনি লাল চোখের কথা বললেন, কিন্তু মেশিন ছাড়াই দেখতে পাচ্ছি, চোখ তেমন কিছু লাল নেই। মেশিনে মাথা রাখার আগে , দূরের আলোকিত বাক্সের গায়ে লেখাগুলি পড়তে বললাম। দুচোখ খুলে সবই পড়ে দিলেন। এবার এক এক চোখ আড়াল করে পড়তে বললাম। ডান চোখ আড়াল করে বাম চোখে সবই পড়তে পারলেন। কিন্তু বাম চোখ আড়াল করে পড়তে বলতেই বোঝা গেল, ইনি ডান চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। কি হল? তিনটে লাইন খোলা আছে, উপরে লাইনও দেখতে পাচ্ছেন না? ঘাড় বাঁকিয়ে, একটু ট্যেরা করে, নানান ভাবে চেষ্টা করে দেখার চেষ্টা করে গেলেন। এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম; একটা দড়ি টেনে, ঐ বাক্সের ক্রমশ বড় লেখা বার করে পড়ানোর চেষ্টা করে দেখলাম, একেবারে উপরের, সবথেকে বড় অক্ষরটিও পড়তে পারলেন না, ডান চোখে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বাক্সের লেখা ক্রমশ বড় করার সময় , সাথের ভদ্র মহিলাও উঠে দাঁড়িয়ে ওকে নানান ভাবে উৎসাহিত করে গেলেন। না, ডান চোখে প্রায় কিছুই দেখলেন না। ব্যাপারটা প্রায় ৯০% বুঝে গেলেও, কিছু কিছু কথা জেনে নিতে হয়। তাই , এরকম কম দেখেন, আগে জানতেন কি না? আগে কোনদিন চোখের ডাক্তার দেখানো হয়েছে কি? ডান চোখে কোনদিন কোন আঘাত পেয়েছেন কি না, এসব খবর জেনে নিতে হয়। এরপর সেই হাঁড়িকাঠে মাথা দিয়ে শুরু করে পরপর যেমন যেমন চোখ দেখা হয়, দেখলাম। কিন্তু মন বলছে, এ সেই বাঁকুড়ার স্যারের বোনের মতই হবে। চশমার পাওয়ার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলাম, ডান চোখটি " লেজি আই" অর্থাৎ Ambliopic . সেই স্যারের বোনের, লেজি আই ধরা পড়েছিল, কুড়ি বছর বয়সে। আর এনার বয়স আঠাশ। এত বয়সে লেজি আই প্রথম ধরা পড়েছে, এর আগে আমি শুনিনি। সাধারণত স্কুলে পড়ার সময়, ছয় সাত বছর বয়সে ধরা পড়ে যায়। কখনও কখনও বারো তের বছর বয়সে পেয়েছি। এই " লেজি আই " রোগটি কি? কেন হয়। আমি যত জনকে পেয়েছি, সবারই একটি চোখে অস্বাভাবিক বেশি প্লাস পাওয়ার ছিল। প্রায় জন্মগত ভাবে একটি চোখের পাওয়ার বেশী থাকে এদের। ছোট বেলা থেকেই ঐ চোখের দৃষ্টি অন্য চোখের থেকে কম থাকে। এই কম দেখতে দেখতে, ঐ চোখটি ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। ভালো চোখটি দিয়েই সব কাজ করার অভ্যেস তৈরী হতে থাকে। সাত আট বছর বয়সের আগে ধরা পরলে , এই কমজোরী চোখের পাওয়ার ঠিক করে চশমা দেওয়া হয়। অনেক সময় অপেক্ষাকৃত ভালো চোখটিকে কিছুদিন পটি দিয়ে বন্ধ করে, কমজোরী চোখের উপর

নির্ভরতা বাড়িয়ে, ঐ চোখটি যাতে লেজি হয়ে না পড়ে তার চেষ্টা করা হয়। অর্ধেক ক্ষেত্রে ভালোই উন্নতি হয়ে যায়। কিন্তু দেখা গেছে, নয় বৎসর বয়সের পর চিকিৎসা শুরু করলে, বিশেষ লাভ হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই ঐ চোখটি ট্যারা হয়ে যায়। অপারেশন করে, ট্যারা চোখ সোজা করে দিলেও, দুই চোখের দৃষ্টি সমান আর হয় না। এজন্যই, যতো কম বয়সে রোগটি ধরা পড়ে, চিকিৎসায় উপকার হওয়ার সম্ভাবনা ততোই বেশী।

কি করে বোঝা যায় যে বাচ্চার একটি বা দুটি চোখই কম দেখছে? বাচ্চার স্বাভাবিক কাজ কর্ম, খেলাধুলার দিকে একটু মন দিয়ে দেখলেই, কিছু কিছু গণ্ডগোল চোখে পড়ে যায়। বাচ্চা টিভি দেখার জন্য সামনে এগিয়ে গিয়ে বসে। এটা হয় ওর দূরের দৃষ্টি কম হলে। পড়াশুনা শুরুর পর আরও সহজে ধরা পড়ে যায়। বই খুব কাছে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে কি না লক্ষ করতে হবে। স্কুলের বোর্ড পিছনের বেঞ্চে বসে দেখতে পাচ্ছে কি না, সেটা স্কুলের শিক্ষক ভালো বুঝতে পারেন। দেখাযায়, মা শিক্ষিতা হলে, বাচ্চার চোখের সামান্য অসুবিধাও তাঁরা নিজেরাই ধরে ফেলেন। আমার প্রতিবেশী এক ডাক্তার দম্পতির বছর আড়াই এর বাচ্চাটি, একদিন দেখি চোখে বেশ মোটা চশমা পরে, বাবার হাত ধরে টলটল করে হাঁটছে। ওর বাবাকে জিজ্ঞেশ করেই জানলাম যে, বাচ্চার মায়ের কিছু সন্দেহ হওয়ায় ওরা বাচ্চাটিকে নিয়ে চোখের ডাক্তার এর কাছে গেছলেন। এটা ওর মা নিজে ডাক্তার বলেই সম্ভব হয়েছে। নয়তো এত ছোট বাচ্চার চোখে চশমা লাগার মত সমস্যা, সাধারনত মায়েদের চোখে পড়ে না। আমি যখনই কোন লেজি আই রুগীর চোখ দেখি, এই প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর পরেও, আমাদের স্যার এর বোনের কথাটা মনে পড়ে যায়।

আমাদের কলেজেরই দাদা, আমাদের শিক্ষক হয়েছিলেন। আমাদের খুবই প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। নামটা খুবই প্রচলিত। এই যেমন, স্বপন, তরুণ বা অশোক এর মত। কলেজের দাদাদের কথা উঠলেই, কোন তরুণ দাদা, বা কোন অশোক দাদা এরকম প্রশ্ন হবেই। আমাদের এই দাদাকে আমরা একটি লুকানো নাম দিয়ে বোঝাই। " আ টু পা টু " দাদা , বললেই সবাই বুঝে যাই, কার কথা বলা হচ্ছে। এই আটুপাটু কথাটার বেশ গভীর তাৎপর্য আছে। বিশেষ করে বাঁকুড়ায়, কোন রুগী যদি বলেন, " আটুপাটু লাইগছে" , তার মানে অনেক কিছু হতে পারে। রুগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কিংবা বুক ধড়ফড় করছে, অথবা রুগী খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন; এমন আরও বেশ কিছু রোগ লক্ষণ ঐ আটুপাটু শব্দটি দিয়েই প্রকাশ করা হয়। এই জিনিসটি আমরা প্রথম শিখেছিলাম, ঐ স্যার এর কাছে। উনি ক্লাশে যেভাবে বলেছিলেন, সেই ইংরেজী মহা বাক্যটির প্রথম অংশ আমাদের ব্যাচের কাছে, কিংবদন্তি হয়ে আছে। আজও ওনার প্রসঙ্গ উঠলেই আমরা বলেফেলি, " আটুপাটু মিনস ডিসপ্নিয়া!" সেই মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক দাদা একদিন তাঁর কলেজে পড়া বোনকে নিয়ে, হাসপতালের চোখের আউটডোর এ এসেছিলেন। একেবারেই আকস্মিক ভাবে ধরা পড়েছিল, ঐ কলেজ ছাত্রীর একটি চোখ লেজি আই। সম্ভবত আলোকিত বাক্সের উপরের একটি কি দুটি লাইন মাত্র পড়তে পারছিলেন। ঐ রকম শিক্ষিত পরিবারেও, এত বড় একটা গণ্ডগোল , কুড়ি বছর বয়সে হঠাৎই ধরা পড়েছিল। মাঝে মাঝে কোন স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে যেতাম। সেখানে , বাচ্চাদের চোখে কোন সমস্যা আছে কি না, তার প্রাথমিক পরীক্ষা স্কুলের শিক্ষকদের করতে শেখাতে হত। সব জায়গায়ই আমার ঐ শিক্ষকের বোনের কথাটা উল্লেখ করতাম। আজও লেজি আই নিয়ে লিখতে গিয়ে, সেই স্যার আর তাঁর বোনের কথাটা লিখে ফেললাম। কলেজ ছাড়ার পনের কুড়ি বছর পরেও দুই একবার আমার প্রিয় সেই " আটুপাটু" স্যার এর সাথে দেখা হয়েছে; পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি। কুশল বিনিময়ের পরই কিন্তু আমার মনে পড়েছে, স্যার এর বোনের চোখ পরীক্ষার কথা। না, স্বাভাবিক ভদ্রতায় কোনোদিনই আর জিজ্ঞেশ করা হয়নি, স্যার আপনার সেই বোন কেমন আছেন? সরকারী ভাবে বরিষ্ঠ নাগরিক হওয়ার পর, আবার যদি দেখা হয় স্যারের সাথে! এখনও কি জিজ্ঞেশ করতে পারবো?
৬.১১.২০২৪.

টিকিট

টিকিট কাটা হয়েছে প্রায় সাড়ে তিনমাস আগেই। আর দিন কুড়িও বাকি নেই, সব রকম টাকা পয়সাও দেওয়া হয়ে গেছে। এবার ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া। এই হল মোটামুটি একটা ভ্রমনের স্বাভাবিক গতি। এবার অবশ্য টিকিট কাটা হয়েছে এরোপ্লেনের। এ টিকিট যতো আগে কাটাযায় ততোই সস্তা। এরও কতোই উন্নতি দেখলাম গত বছর কুড়িতে। তখন টিকিট কাটার জন্য পকেটে করে টাকা নিয়ে শহরের মধ্যে এয়ারলাইন্সের আপিসে যেতে হত; সেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এবার যে টিকিট কাটা হল, সবই অন লাইনে, ঘরে বসেই।

শুধু ঘরে বসে একটা কোম্পানির টিকিট কাটাযায় তাই নয়। আরও চারটে কোম্পানি, কে কত দাম নিচ্ছে, কখন পৌছবে, সব এক জায়গায় বসেই দেখে নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়াগেল। বাড়ীর সবাই একসাথে বসে। হয়তো রাত দশটার পর।এই ঘরে বসে টিকিট কাটার অন লাইন ব্যবস্থায় সবথেকে বেশী সুবিধা হয়েছে রেল যাত্রার জন্য। বছর তিনেক হল নিয়মিত এই ই টিকিট কেটেই দুরপাল্লার ট্রেনে চাপছি। আগের দিনের ব্যবস্থাটা ভাবলে এখনও ভয় লাগে। একটা রেলের টিকিটের জন্য শিয়ালদা, হাওড়া বা ফেয়ারলিতে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হত।

শুধু কাজের সময়, মানে অফিস টাইমে, একটা লোকের কয়েক ঘন্টা টিকিটের লাইনে কাটানো, এমন করে কত হাজার ঘন্টা নষ্ট হয়েছে ভেবে দেখুন। বছর ছয়েক আগে একবার শিলিগুড়িতে বলতে গেলাম। ওনারা ট্রেনের টিকিট কেটে ক্যুরিয়ারে পাঠালেন। আর গত বছর ফারাক্কা গেলাম; টিকিট অন লাইনে কেটে জয়ন্তবাবু আমার মোবাইলে পাঠিয়ে দিলেন।

গত বছর ঔরঙ্গাবাদে হোটেলে বসে হিসেব করলাম, পরদিন বিকেল পর্যন্ত বসে থাকা বিরক্তিকর, তাছাড়া হোটেলও ছাড়তে হবে সকাল আটটায়। মোবাইলেই দুপুরের ট্রেনের টিকিট কেটে ফেললাম। এছাড়াও টিকিট কাটার সাথে সাথেই রিটায়ারিং রুমও বুক করি আজকাল। ষ্টেশনের রিটায়ারিং রুমে থাকতে পারলে আর শহরের হোটেল খোঁজা বা যাতায়াত করতে হয় না। মনে আছে, বছর পাঁচেক আগে একবার শিলিগুড়িতে রাত্রে থাকার জন্য ষ্টেষনে রিটায়ারিং রুম নেওয়ার কত ঝকমারি। প্লাটফর্মের আপিস থেকে লিখে নিয়ে বাইরে টিকিট কাউন্টারে গিয়ে টাকা জমা দিতে হয়েছিল।

রেলের টিকিটের জন্য চুড়ান্ত হেনস্থা হতে হয়েছিল রেলেরই ভুলে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে রায়গঞ্জের থেকে কলকাতা আসব। তখন রায়গঞ্জে কলকাতার ট্রেন যেত না। মালদা থেকে ট্রেন ধরতে হত। রায়গঞ্জে রেল ষ্টেষনে চারটি টিকিট কাটলাম। গাড়ী করে মালদায় এসে ট্রেন ধরলাম। গাড়ী ছাড়ার দশ মিনিট আগে অন্য লোক এসে টিকিট দেখাল, ঐ সব বার্থ ওদেরও দেওয়া হয়েছে। ছুটলাম ষ্টেষন মাষ্টারের কাছে। উনি জানালেন, রায়গঞ্জের কোটা দুমাস উঠে গেছে, ওরা ভুল করে টিকিট দিয়েছে। ট্রেনে কন্ডাক্টারকে সব বলে, মেঝেতে ছেলেকে শুইয়ে কলকাতায় এলাম। ঐ কন্ডাক্টার পয়সা নিয়ে অন্য দুজনকে বার্থ বিক্রী করল দেখলাম। ঐ যে রেলের কর্মচারিগণের ওপর ঘৃণা জন্মাল, আজও তার থেকে মুক্তি পাইনি।

ঐ সময়ও রায়গঞ্জে পুরনো কাঠের মত ছোট টিকিট ছিল। কিন্তু কম্পিউটার রিজার্ভেশন করা টিকিট একটু বড় পোষ্টকার্ড সাইজের হত। এই বড় টিকিট এখনও আছে। কিন্তু নেট থেকে টিকিট করলে আর ওসব টিকিটের দরকারই হয়না। তবে যদি কাগজে প্রিন্ট নিতে হয়, সেক্ষেত্রে তো বড় একটা কাগজই লাগে। ট্রেনে যাতাযাতে কোন কাগজের টিকিট না হলেও চলে। কিন্তু যদি রিটায়ারিং রুম নেওয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ওটা কাগজে প্রিন্ট নেওয়াই ভালো। কেননা ওসবের দায়িত্ব সাধারণত কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের ওপর থাকে, ওরা কাগজই দেখতে চায়।

অনেকদিন পর্যন্ত রেলের মান্থলি টিকিট হলদে রঙের একটু শক্ত কাগজের হত। কবে যে ওটাও সাধারণ টিকিটের মত হয়ে গেল খেয়ালই করিনি। শহরতলীর ট্রেনে চাপার জন্য এই মান্থলি বা কোয়ার্টারলি টিকিট খুব সুবিধাজনক। আমরা যারা সবদিনই একবার বা দুবার ট্রেনে চড়ি, তাদের জন্য আদর্শ। ভাড়া কম লাগার থেকেও বড় কথা হল, রোজ রোজ টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়াতে হয় না। শুধু এই লাইনে দাঁড়াতে গিয় কত হাজার লোক যে গাড়ী ফেল করে তার ঠিক নেই। মাঝে মাঝে যারা ট্রেনে চড়ে, তাদেরও লাইনে দাঁড়াতে যাতে না হয় তার ব্যবস্থা হয়েছে। কার্ড একটা কেনা থাকলে টিকিট ভেন্ডিং মেসিনে টিকিট কাটা যায়। শুধু টাকা ঢুকিয়ে টিকিট কাটার মেসিনও আছে বড় ষ্টেষনগুলিতে। আমি বছর পাঁচেক হল কার্ড ব্যবহার করছি। তবুও দরকারের সময় মেসিন কাজ করছে না, এমনও হয়েছে।

একবার বর্ধমান হয়ে ভাতারের এক অনুষ্ঠানে যেতে গিয়ে বিশ্রী কান্ড হয়েছিল। সকালের ট্রেনে দমদম থেকে উঠে বর্ধমান যাব। মিনিট পনের আগে ষ্টেশনে গিয়ে দেখি, পঞ্চাশজন করে লোক এক একটা লাইনে। সবকটা মেসিনও খারাপ। ঐ ট্রেন না ধরলে দেড় দু ঘন্টা দেরী হয়ে যাবে। ভাতারের অনুষ্ঠানে শ তিনেক লোক আমার জন্য বসে

থাকবে। আমার মান্থলি আছে ইছাপুর পর্যন্ত। দরকার হলে বিনা টিকিটেও যাব ঠিক করলাম। প্লাটফর্মে উঠে তিন চার জনকে ফোন করলাম। গ্রীষ্মকাল হলেও, সকালে ফোন বেজে গেল। বারাকপুরের দীনেশবাবু ধরলেন। ওনাকে ব্যাপারটা বোঝাতে উনি বললেন, বারাকপুর থেকে বর্ধমানের টিকিট কাটার চেষ্টা করছেন। মিনিট কুড়ি সময় পাওয়ায় উনি টিকিট কেটেও নিলেন। প্লাটফর্মে এসে আমাকে টিকিট দিয়ে গেলেন। এই যে একটা টিকিট কাটার জন্য একজন বাহাত্তর বছরের যুবককে সকাল ছটায় দৌড়তে হল, এটা কিন্তু রেলের লোকেরা জানলই না। আর জানানো হল না ভাতারের ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ তিনেক মানুষকে। অন্তত বারো ঘন্টা আগে(এখানে একবার থামতে হল) এসব টিকিট কাটার একটা ব্যবস্থা থাকলে অনেক ঝামেলা এড়ানো যায়। এখন অবশ্য মোবাইলে টিকিট কাটার একটা ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু আমি একদিনও ওটা কাজে লাগাতে পারিনি। ট্রেনের টিকিট কাটা আর না কাটা নিয়েই অনেক গল্প আছে। সেসব শেষ করা যাবেনা লিখে। পরশুদিনই সৌম্য স্যারের রাত্রের ট্রেনের টিকিট কনফার্ম হল না। ও জেনেছে ঘন্টাখানেক আগে। অগত্যা রাতের বাসেই যেতে হল। বাসেও টিকিট দিলেও, বসার জায়গা নিশ্চিত ছিল না।

বাসের টিকিট কয়েকটা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া এখনও, বাসে উঠেই কাটতে হয়। বাসের টিকিট আগের থেকে কেটে বসার জায়গা নিশ্চিত করা যায় কিছু কিছু দূরপাল্লার বাসে আর ট্যুরিস্ট বাসে। যে সব বাসে ওঠার পর টিকিট কাটা হয়, সেখানে আবার নানান অনিয়ম। একটু দূরের বাস হলেই কন্ডাক্টর চুরি করার চেষ্টা করে। কিছু কম ভাড়া নিয়ে, টিকিটটা না দেওয়ার চেষ্টা করে। আর কলকাতার বাসের মত মারাত্মক ভীড়ের বাসে অনেক সময়েই কন্ডাক্টর দরজা ছেড়ে ভেতরে ঢোকেনা। নামার সময় গুতোগুতিতে অনেক সময় টিকিট কাটাই হয় না। বিশেষ করে ছেলে ছোকরার দল অনেক সময়ই টিকিট ফাঁকি দেওয়াটা একটা খেলার মত মনে করে।

ট্রামতো কলকাতা থেকে প্রায় উঠেই গেল। এক সময় ট্রামের মান্থলি টিকিট ছিল, এখনও আছে কিনা জানিনা। এছাড়া জলপথ পরিবহনের টিকিট হয়। কলকাতা আর শহরতলির বিভিন্ন ঘাটে লঞ্চে চড়তে হলে টিকিট কাটতে হয়। অটো টোটো বা ট্যাক্সি কোনদিন টিকিট দেয় না। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট গাড়ী চলে, তারাও কখনওই টিকিট দেয় না। এতো গেল পরিবহনের টিকিট। এছাড়া আর কোথায় কোথায় টিকিট লাগে একটু দেখা যাক। এক সময় সিনেমার টিকিট নিয়ে কি সব কান্ড হয়েছে। টিকিট ব্ল্যাকার বলে একটা পেশাই ছিল তখন। বড় বড় হলের বাইরে ওরকম দু চারটে মস্তান মত লোক থাকত। নামি নায়ক নায়িকার সিনেমা এলে ওরাই টিকিট কাউন্টারে ভীড় করে অনেক টিকিট কেটে নিত। ভদ্রলোকদের তিন টাকার টিকিট দশটাকা কুড়ি টাকায় কিনতে হত ওদের কাছে। সত্যি বলতে কি এই একটি অশ্লীল ব্যাপারের জন্যই বয়স কালে আমার সিনেমা সম্বন্ধে একটা বাজে ধারনা তৈরী হয়েছিল। সিনেমা সম্বন্ধে কেউ কোন ভালো কথা বললেও এখনও সে আলোচনা এড়িয়ে চলি। সিনেমার মত থিয়েটার আর যাত্রারও টিকিট বিক্রী হয়। থিয়েটার, বিশেষ করে কোলকাতার পেশাদার মঞ্চের কিছু বিখ্যাত নাটক আমি টিকিট কেটে দেখেছি।

আমাদের ছোটবেলায় গ্রামেরদিকে কলকাতার বড় দলের যাত্রা হলে, তাকে " টিকিট সেল যাত্রা " বলা হত। শেষ যে টিকিট সেল যাত্রা দেখেছিলাম তার অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি। তখন বাঁকুড়া থেকে গড়বেতায় আসতাম প্রতি শনিবার, ষ্টেষনের পাশে নবীন সংঘে চোখের রুগী দেখতে। ওদেরই আয়োজনে ঐ দিন সন্ধ্যায় বিখ্যাত দলের যাত্রা। ওরা থেকেযেতে বলল। সন্ধের পর ওদের টিকিট বিক্রীর ঘরটাতে বসে জন সমুদ্র দেখলাম। হৈ হৈ করে টিকিট বিক্রী হল। বিস্কুটের টিনে টাকা রাখা হচ্ছে দেখলাম। এক সময়ের অতি বিখ্যাত নায়কের অভিনয় দেখতে হাজার হাজার লোক এসেছে দেখলাম। কিন্তু যাত্রা পালাটি ভালোলাগেনি লোকের। ঘন্টাখানেক চলার পর লোকে ইট পাটকেল ছুড়ে ভন্ডুল করে দিল।

টিকিট না পাওয়ার জন্য, মেদিনীপুরে নাথবতী দেখা হলনা। আর কোনদিন দেখার সুযোগ হয়নি। এখন তো অনেক সময় লোকে বাড়ীতে টিকিট রেখে গেলেও আর যাওয়া হয়না।

আর একটা ব্যাপারে টিকিট নিয়ে হাজার লোকের "হাহাকার " দেখলে আমি অবাক হয়েযাই। খেলা দেখার জন্য উন্মাদনা থাকতেই পারে। কিন্তু ঐ "হাহাকার " শব্দটির অপব্যবহার এক এক সময় অশ্লীল মনে হয়। ভেবে দেখুন, বাস নদীতে পড়ে বিয়াল্লিশ জন মানুষ মারা গেল। হতভাগ্য মানুষগুলির আপনজন হাহাকার করছে। আবার ইডেনের একটা টিকিটের জন্য হাহাকার। কাগজওয়ালারা কেমন করে বাংলা ভাষাকে ধর্ষণ করে এ তার প্রকট উদাহরণ। একটি টিকিটের জন্য বহু লোক লালায়িত, এ কথা লেখার সাহসই নেই।

এবার বলি আমাদের দৈনিক বিড়ম্বনার টিকিটের কথা। সরকারী হাসপাতালের দু টাকার টিকিট কাটতে একজন মানুষকে দুঘন্টাও লাইনে দাঁড়াতে হয় কখনও। এমনকি ঐ টিকিট কেটে দেওয়ার জন্য দালাল ও ধরতে হয় কখনও। অবাক লাগে যখন বাজারী কাগজওয়ালারা বা টিভির সেন্টেড পেইন্টেড উপস্থাপিকা অবহেলায় বলেদেন, সরকারী হাসপাতালে লোকে যায় না। আচ্ছা, প্রতিদিন যে হাজারে হাজারে প্রাণী ঐ দু টাকার টিকিটে ডাক্তার দেখিয়ে যাচ্ছে, তারা কি মানুষই নয়!

দীনেশবাবুর কথা লিখতে গিয়ে একবার থামতে হয়েছিল। ঐ সময় ওনার স্ত্রীর শেষ সংবাদটা দিলেন একজন। একেও আমরা বলি পুস্পক রথের টিকিট কনফার্ম হওয়া।

আর একটা টিকিটের কথা আমাদের দিন রাত ভাবতে হয়। সেটা হল ভর্তি রুগীর টিকিট। আমরা ইংরেজীতে বলি বি এইচ টি, অর্থাৎ বেড হেড টিকিট।

সরকারী হাসপাতালের টিকিট কাটতে বড়ই অনিহা। ওদিকে ইকোপার্ক, নিক্কোপার্ক, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া সব জায়গায়ই কয়েকশো লোকের টিকিটের জন্য লাইন দিতে কোন কষ্ট নাই। আর বড় বড় ক্লাব বা পাঁচতারা হোটেলে যে সব ডিনার পার্টির টিকিট বিক্রী হয়, সেসব কেনার লোকেরও অভাব নেই। আর দক্ষিন ভারতের মন্দিরে ছোট লাইনে ঢোকার জন্য আমি নিজে ২৫০ টাকার টিকিট কেটেছি। লোকে পাঁচশ হাজার টাকার টিকিটও কাটে শুনেছি। সভয়ে বলি,ঐ লোকগুলি কিন্তু দুশো টাকা ডাক্তারের ফি দিলে, বাজে খরচ বলে হাহুতাশ করে। ট্রেনে চোদ্দ বছরের ছেলের জন্য হাফ টিকিট কেটে টিটির সাথে তর্ক করে। আর বাসে উঠে ছ টাকার টিকিটও ফাঁকি দেয়।

তবে যে টিকিট আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকা দাম শোনাযায়, তার কথা না বললে তো টিকিট পূরাণ শেষই হবে না। না, লটারির টিকিটের কথা বলছি না। অবশ্য ও টিকিট পাওয়া লটারি পাওয়ার থেকেও দামি। ভোটের দিন ঘোষনার আগে থেকেই তেনারা একটা টিকিটের জন্য হত্যা দেন। পেয়ে গেলেই কেল্লা ফতে। মানুষের সেবা করার এমন মহৎ সুযোগ তো পাঁচ বছরে একবারই মাত্র আসে। কত সাধ্য সাধনা করে একটা টিকিট জোগাড় করতে হয়,বোকা জনগন বুঝলই না।

নপুংসক

আমার ফ্ল্যাটের জানালার বাইরেই রেল লাইন। পাড়া থেকে রেলের প্ল্যাটফর্মে ওঠার রাস্তা জানালার তলা দিয়ে। ভোর সাড়ে চারটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্ম থেকে পাড়া, পাড়া থেকে প্ল্যাটফর্ম লোকজন চলতেই থাকে। কয়েক মাস থেকে দেখছি, ভোর পাঁচটার আগেই কয়েকজন হিজড়ে রেল লাইনের পাশে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। কোথা থেকে আসে জানিনা; কিন্তু ওরা শিয়ালদর দিকে যেতে থাকা মেল ট্রেনে উঠে চলে যায় । ওদের শারীরিক সক্ষমতা দেখলে অবাক হতে হয়। জংশন স্টেশন, ঢোকার সময় সব মেল ট্রেন একটু আস্তে চলে , ঐ চলন্ত ট্রেনে ওরা স্বচ্ছন্দে উঠে যায়। চলন্ত ট্রেন থেকে রেল লাইনের উপর নেমেও যেতে দেখেছি। শাড়ী পরেই। এই ট্রেনে উঠেপড়া হিজড়ে বা নপুংসকরা ট্রেনে উঠে কি করে সে তো আমরা সবাই জানি। সোজা কথায় ভিক্ষে করে। সচরাচর এদের এই সব কাজ দেখে এদের সম্বন্ধে খুব একটা ভালো ধারণা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু নপুংসক বা এখনকার পরিভাষায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষও যে অত্যন্ত সম্মানের পেশায় যেতে পারে, আমরা আমাদের রাজ্যেই দেখেছি। একজন স্বনাম ধন্য চলচ্চিত্রকার নপুংসক হলেও নিজের কাজের জন্যই যতেষ্ট মান সম্মান পেয়েছেন। আর একজন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ আছেন, যতেষ্ট পন্ডিত মানুষ। মহাভারত মহাকাব্যে এই নপুংসক চরিত্রের কয়েক জনের কথা বিস্তারে লেখা হয়েছে।

মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা পুরুষ মানুষের পোশাক পরে থাকতেন, শুধু তাই না, পুরুষের মত অস্ত্র বিদ্যা পেয়েছিলেন। বাস্তবে উনি মহিলাই ছিলেন, তার প্রমাণ অর্জুনের সাথে বিয়ের পর তাঁদের পুত্রের জন্ম। শিখণ্ডী চরিত্র আমাদের সবার জানা। তিনি ভীষ্ম বধের কারণ হয়েছিলেন; কেননা তাঁকে দেখেই ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করেন। শিখণ্ডী নপুংসক ছিলেন, এটাই আমরা সবাই জানি। কিন্তু ওনার ব্যাপারটা খুব সহজ, সরল ছিল না। উনি কি আদৌ তৃতীয় লিঙ্গের ছিলেন? না কি সেই চার হাজার বছর আগে এই তৃতীয় লিঙ্গ ব্যাপারটাই জানা ছিল না?

আমরা যারা সামান্য জীব বিজ্ঞান পড়েছি, আমরা জানি স্বাভাবিক মানুষের শরীরের যে কোন কোষে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। বাইশ জোড়া সবার একই। বাকী এক জোড়া ক্রোমোজোম দিয়ে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। দুটি এক্স ক্রোমোজোম থাকলে সে স্ত্রী লিঙ্গের হবে , আর একটি এক্স আর একটি ওয়াই হলে পুং লিঙ্গের হবে। তৃতীয় লিঙ্গের যারা, তাদের এই তেইশ জোড়ার ক্ষেত্রে গন্ডগোল হয়ে যায়। দুটির বদলে তিনটি ক্রোমোজোম থাকে এদের। এর ফলে হয়তো গোঁফ দাড়িও হল, আবার জননাঙ্গ স্ত্রীর মত। এই জননাঙ্গ দেখেই শিশু জন্মের সাথে সাথেই তার লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। তবে এমনও কোথাও কোথাও পড়েছি যে, এই সব ট্রেনে বাসে ভিক্ষা করে বেড়ানো হিজড়ার দলে, পুরুষের জননাঙ্গ কেটে ফেলে, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ করে নেওয়ার চল আছে।

শিখণ্ডী চরিত্র নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। মহাভারতের আরও অনেক জায়গার মত এখানেও মহাদেবের বর এর মত অলৌকিকতা আছে। মহাভারতের গল্পের মধ্যে তিন রাজকন্যার কথা আমরা সবাই জানি। অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকা। কাশী রাজার এই তিন কন্যার স্বয়ম্বরের সময়, মহাবীর ভীষ্ম তিন কন্যাকে রথে তুলে নিয়ে হস্তিনাপুরের রাজবাড়ীতে চলে আসেন; নিজের ভাই বিচিত্র বীর্যের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য। এখানে এসে পৌঁছনোর পর কন্যারা জানতে পারেন যে, মহাবীর ভীষ্ম তাদের বিয়ে করতে তুলে আনেননি; এনেছেন ভাইয়ের জন্য। অম্বা ভীষ্ম কে জানান যে তিনি শল্য রাজার বাকদত্তা। ভীষ্ম তাঁকে সসম্মানে শল্য রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন। ওদিকে তিন কন্যার অপহরনের সময় ভীষ্মের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে শল্য চূড়ান্ত অপদস্ত হয়েছেন। তাছাড়া তাঁর মনে হয়েছে , অম্বা যেন ভীষ্মকেই পছন্দ করে নিজেই রথে চড়ে বসে ছিলেন। শল্য অম্বাকে প্রত্যাখ্যান

করেন। অম্বা ফিরে এসে ভীষ্মকে জানান যে, তিনি ভীষ্ম ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবেন না। ভীষ্ম তো তাঁর বিখ্যাত প্রতিজ্ঞায় অটল। মাঝখান থেকে অম্বা কাউকেই বিয়ে করতে পারলেন না। প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে অম্বা বনে চলে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে ভীষ্মকে জানিয়ে গেলেন যে, তিনিও ভীষ্মকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

সাধারণ ভাবে আমরা জানি, এই অম্বা ধ্রুপদ রাজার বাড়িতে শিখণ্ডী নামে জন্ম নেন। নপুংসক শিখণ্ডী মহাভারতের মহা যুদ্ধের সময় ভীষ্ম বধের কারণ হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্ম মতে পুনর্জন্ম হতেই পারে। এই নতুন জন্মে অম্বা একজন বড় বীর যোদ্ধা হয়ে জন্মে ভীষ্মকে বধ করতে পারতেন। তা না হয়ে তাঁকে একজন নপুংসক হয়ে কেন জন্ম নিতে হল? এখানেই কি মহাকবির কোন মহাকাব্যিক অভিসন্ধি দেখতে পাচ্ছেন, ভাদুড়ী মশাই? সাধারণ গল্পের থেকে ভেতরে গেলে দেখা যায় , অম্বা বনে ঘুরতে ঘুরতে রাজর্ষি হোত্রবাহনের আশ্রমে পৌছোন । রাজর্ষি হোত্রবাহন আবার এই তিন কন্যার দাদু। অম্বার দুর্দশা দেখে দাদুও খুব বিচলিত হন। সেই সময়ে পরশুরাম কোথাও যাওয়ার পথে হোত্রবাহনের আশ্রমে পৌঁছোন। পরশুরাম ভীষ্মের গুরু । হোত্রবাহন তাঁকে ঘটনা সব বলে, ভীষ্মকে রাজী করাতে অনুরোধ করেন। পরশুরাম অম্বাকে নিয়ে ভীষ্মের কাছে আসেন । কিন্তু ভীষ্ম তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল। এবার পরশুরাম রেগে গিয়ে ভীষ্মকে শাস্তি দিতে চান। গুরু শিষ্যে ভীষণ যুদ্ধ লেগে গেল। কয়েকদিন যুদ্ধের পর দুজনেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লে, দেবতাদের অনুরোধে যুদ্ধ থামে। বাস্তবে পরশুরাম হার স্বীকার করে নেন। আর কোন উপায় নেই দেখে অম্বা বনে গিয়ে শিবের তপস্যা শুরু করেন। শিবের বরে তিনি দ্রুপদ রাজার ঘরে জন্ম নেন। ঐ সময় দ্রুপদ রাজাও ভীষ্মকে বধ করার জন্য শিবের তপস্যা করছিলেন। শিব ঠাকুর জানান যে , দ্রুপদের যে সন্তান হবে, সেই ভীষ্ম বধের কারণ হবে।

আমরা অলৌকিকতা ছেড়ে ব্যাপারটাকে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চাইলে, কি হতে পারে ব্যাপারটা? সম্ভবত দ্রুপদ রাজার মেয়ে হলেও তাকে ছেলে বলে প্রচার করা হয়। ছেলের মত তার অস্ত্র শিক্ষাও হয়, গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে। তাহলে তাকে নপুংসক বলা হয়েছে কেন? তখনকার নিয়ম অনুযায়ী মেয়েদের অস্ত্র শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। বালক বয়সে অস্ত্র শিক্ষা শুরু করলেও যৌবনে স্ত্রী লক্ষণ সমুহ প্রকাশ পেলে আর তাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। আমরা বর্তমান সময়েও দেখেছি, ঐ রকম ভাবে ক্রোমোজোমের গন্ডগোলের জন্য, জন্মের সময় লিঙ্গ নির্ধারণ করা না গেলে , পরিবার সেই সন্তানকে পুত্রের মতোই বড় করে। সাধারণত এঁদের এই লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায় না বলেই এঁদের বিয়ে নিয়ে সমস্যা হয়। খুব সম্প্রতি অপারেশন করে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের জননাঙ্গ করা যাচ্ছে। কিন্তু চার হাজার বছর আগে , রাজার বাড়িতেও এটা সম্ভব ছিল না।

আর একটি সম্ভাবনা আছে। অম্বা ভীষ্ম বধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বনে গিয়ে গোপনে অস্ত্র শিক্ষা শুরু করেন। দাদু হোত্রবাহন সব খবর রাখতেন। উনি জানতেন দ্রুপদ রাজাও ভীষ্ম বধের চেষ্টা করছেন। একা একা অম্বার পক্ষে ভীষ্মের মত মহা বীর যোদ্ধাকে বধ করা অসম্ভব। তাই দাদু অম্বাকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে , তাকে ভীষ্ম বধের কাজে লাগাতে বলেন। অম্বা কন্যা, কিন্তু তখনকার নিয়ম ভেঙ্গে অস্ত্র শিক্ষা করেছেন, তাই তিনি নপুংসক। তিনি না স্ত্রীলো, না পুরুষ। মহাযুদ্ধের সময় পান্ডবদের শ্বশুর মশাই দ্রুপদ সপরিবারে পান্ডবদের দলে যোগ দেন। শিখণ্ডী নপুংসক; তাকে দেখলেই ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করবেন, এই খবর পান্ডবদের ননপ্লেয়িং ক্যাপ্টেন শ্রীকৃষ্ণ জানতেন; তাই তিনি কৌশলে শিখণ্ডীকে কাজে লাগান।

পুর্ব জন্ম বা কন্যা অবস্থায় তিনি অম্বা। পুরুষের মত অস্ত্র শিক্ষা করে তিনি শিখণ্ডী, পুরুষ হলেন। এটাই তাঁর জন্মান্তর। মহাকবি কোন কিছুই বাদ দিয়ে যাননি তাঁর মহাকাব্যে। সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ চার হাজার বছর

আগেও ছিল। সমাজে তাদের কি অবস্থান, শিখণ্ডী চরিত্রের মাধ্যমে মহাকবি আমাদের তাই দেখিয়ে দিয়েছেন। ইচ্ছা করলে এই নপুংসক মানুষেরা যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে পারেন; ভীষ্ম বধের মত বড় কাজেও লাগতে পারেন, মহাকবি কি আমাদের জন্য এই বার্তাই দিয়েছেন?

আর এক সাময়িক নপুংসক বৃহন্নলা। সেখানেও এক বছরের জন্য হলেও একটা বড় কাজের জন্য মহাকবি তাঁকে ব্যাবহার করে দেখিয়েছেন। এখনকার সাথে সামঞ্জস্য দেখাতে গেলে বলা যায়, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ যার মধ্যে পুরুষ ভাব প্রকট, তিনি পুরুষের মত কাজ করুন। আর যার মধ্যে নারী স্বভাব প্রকট তিনি মহিলাদের মত কাজ করুন। একেবারে আধুনিক যুগে কোন কাজই তো নারী পুরুষ কারো জন্য আলাদা করে চিহ্ন দেওয়া নেই। সবাই সব কাজ করতে পারেন। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ কেন ট্রেনে বাসে ভিক্ষা করতে যাবেন ?

নাম করণের সার্থকতা।

আমার এক নিকট আত্মীয়ার নাম, লোপামুদ্রা। ঐ নাম তথা আত্মীয়ার সাথে আলাপ হওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর পর জানতে পারি যে, এই লোপামুদ্রা নামের এক বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কাহিনী মহাভারতে আছে। একই রকম ভাবে বছর আঠারো আগে, এক আত্মীয়ের ছেলের নাম শৌনক, জানার পর , এই শৌনক মানে কি, বা এ নাম কোথা থেকে এল ভাবতে ভাবতেই , সম্ভবত পরের দিনই একটা লেখায় চোখে পড়ে শৌনক নামটা। আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাইয়ের "কথা অমৃত সমান"- এ দেখলাম ঐ শৌনক মুনির নাম। মহাভারতে কি নেই , তাই ভবি।

আমরা স্কুলে বাংলা পড়ার সময় যে সব গল্প বা কবিতা পড়তাম, তাদের 'নাম করণের সার্থকতা' বলে একটা জিনিস আমাদের জানতে হত। অমুক লেখকের তমুক গল্পের নাম করণের সার্থকতা লিখ; এরকম একটা প্রশ্ন আসত পরীক্ষায়। আমরা বুঝি না বুঝি, একটা দশ লাইনের মত উত্তর মুখস্ত করতে হত। আর নাম নিয়ে ছিল দু' একটা প্রচলিত বাকধারা। নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না। আর একটা ছিল, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। তাল পুকুর আমি বেশ কয়েকটা দেখেছি, কিন্তু ঘটি না ডোবার মত দুরবস্থা কোনটার দেখিনি। আর চোখের ডাক্তার হওয়ার সুবাদে অনেক কানা লোক দেখলেও তাদের কারো নাম পদ্মলোচন পাইনি।

আবার কদিন আগে মহাভারতের এই শৌনক মুনির প্রসঙ্গ বিস্তৃত শুনলাম। তখন আমার ঐ আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলের শৌনক নাম কে রেখেছে? ওরা এই শৌনক মুনির কথা জানে কি না? ছেলের নাম তার বাবাই রেখেছে, জানাল। এই নামে একজন মুনি ছিলেন, এটুকুই জানে, আর কিছুই জানা ছিল না। ওকে মহারাজ সমর্পনানন্দর মহাভারত পাঠের ইউ টিউব লিঙ্ক পাঠিয়ে দিলাম।

মহাভারতের ঐ গল্পটা একটু বলি। পাণ্ডবরা বনবাসে যাওয়ার সময় অনেক ব্রাহ্মণ তাঁদের সাথে সাথেই বনে চলে গেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই ব্রাহ্মণদের কাছে ধর্মলোচনা শুনে সময় কাটাতেন। স্বনামধন্য ধার্মিক হাওয়ার সুবাদে , মাঝে মাঝেই নতুন নতুন ব্রাহ্মণ, মুনি- ঋষি এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাথে শাস্ত্র আলোচনা করে যেতেন। এ ভাবেই একদিন বিখ্যাত শৌনক মুনি যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তখনও বনবাসের বেশী দিন হয়নি। রাজা থাকার সময়ে যেমন করেছেন, তেমনি ভাবেই যুধিষ্ঠির, সাথে আসা ব্রাহ্মণদের সেবা যত্ন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বনবাসের সময় এত মানুষের ভরণ পোষণের ক্ষমতা পান্ডবদের ছিল না। এদিকে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ দের অযত্ন হচ্ছে বুঝে মনে মনে বেশ কষ্টও পাচ্ছিলেন। সেই রকম একটা দিনই মহাত্মা শৌনক মুনি সেখানে আসেন। এই শৌনক মুনির উল্লেখ ' প্রশ্নোপনিষদে ' আছে। কয়েকজন মুনি- ঋষি এই শৌনক মুনির কাছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলে , শৌনক মুনি তাঁদের বলেন যে, অন্তত একটি বছর আমার আশ্রমে থাকুন, তপস্যা করুন; তারপর আপনাদের প্রশ্ন করার অধিকার আছে কি না বুঝে, আপনাদের প্রশ্ন শুনব। এই প্রশ্ন করার অধিকার নিয়ে , সমর্পনানন্দ মহারাজ বেশ কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলেছেন। আমার মত অনধিকারির কাছে সেসব কথা না শুনে , সরাসরি মহারাজের পাঠ থেকেই শুনুন।

যাই হোক, রাজ চক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরকে বনবাসের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, সেই নিয়েই শৌনক মুনি বিস্তৃত আলোচনা করলেন। মুনি বলেছিলেন, " শোক স্থান সহস্রানি, ভয় স্থান শতানী চ।" অর্থাৎ মানুষের শোক দুঃখের হাজার কারণ হয়, আর ভয় পাওয়ার মত একশোটা জিনিস আছে।এই শৌনক মুনি কর্ম যোগ আর সাংখ্য যোগ এর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। রাজ্য হারান, বনবাসী যুধিষ্ঠিরের শোকের কারণ তো খুবই প্রকট। তারপরও তিনি তখনও নিজের বনবাস জীবনের সীমাবদ্ধতাকে ঠিক মেনে নিতে পারেননি; আগের মতোই শত শত ব্রাহ্মণের সেবা যত্ন করে যেতে চাইছেন। সেটা ঠিক মত করতে না পারাটাও তাঁর শোকের আর একটা কারণ। স্পষ্টবাদী শৌনক মুনি যুধিষ্ঠিরকে বাস্তব অবস্থাটা বোঝানোর চেষ্টা করে দেখলেন যে,

রাজার সেই রাজসিক মানসিকতা তখনো থেকে গিয়েছে। এখানে যেন ব্যতিক্রম হিসেব দেখা যাচ্ছে, যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ মুনির কথা মানতে পারছেন না। শৌনক মুনি একটু হতাশ হয়েই যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আমার আত্মীয় এই শৌনক ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার হাওয়ার জন্য বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, ওর বাবা মা কোনদিনই ভাবেনি যে তাদের ছেলে একজন দার্শনিক হোক। একই ভাবে এ দেশের লাখ লাখ ডাক্তারের মধ্যে কারো নাম চরক বা সুশ্রুত কোনদিন শুনিনি। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এমনকি দশরথ নামও প্রচুর শোনা যায়। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা নাম বাঙালিদের মধ্যে বিরল হলেও উত্তর ভারতে বেশ প্রচলিত। পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে ভীম, অর্জুন, নকুল নাম আমাদের আশেপাশে অনেক দেখা যায়। সহদেব নামটি খুব প্রচলিত না হলেও আমার পুরনো স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক মশাই এর নাম সহদেব। যুধিষ্ঠির নামের একজন ডাক্তারবাবু আছেন আলিপুদুয়ারে; আমার সাথে ভালো পরিচয় আছে। এছাড়া আর কোন যুধিষ্ঠির নামের কারো কথা মনে পড়ছে না। সেদিন ভাষাবিদ ডা পাত্র বলছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র কারো নাম দেখা যায় না। অবশ্য দুর্যোধন নাম আমি শুনেছি।দ্রৌপদী আর কুন্তী নামও উত্তর ভারতে বেশ প্রচলিত। আরও প্রাচীন মুনি ঋষি দের নামও কয়েকটি এখনও বেশ আধুনিক নাম হিসেবেই প্রচলিত। উপমন্যু, উদ্দালক, প্রচেতা , অরুন্ধতী এসব তো বেশ আধুনিক নাম। এমনকি একলব্য নামও শুনলাম। কিন্তু আমার আত্মীয় ঐ শৌনক এর মতই, শুধুমাত্র সুন্দর ছন্দোময় একটা নাম হিসেবেই সম্ভবত এসব নাম রাখা। ঐ সব বেদ উপনিষদের মুনি -ঋষি, তপস্বিনীদের মত নাম রাখার সময় কজন মনে রাখে ঐরকম নাম করণের সার্থকতা?

নারদ নারদ

পৌরাণিক কাহিনীর কত বিচিত্র ভুল ব্যাখ্যা হয় , নারদ মুনি সম্বন্ধে এই একটা জিনিস জানলেই বোঝা যায়। আমার লেখার শিরোনাম দেখেই আপনার কি মনে হয়নি, এ একটা ঝগড়াঝাঁটির গল্প শোনাবে? নারদ মুনির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উনি ঝগড়া লাগাতে ওস্তাদ। এর কথা ওকে বলে একটা গন্ডগোল বাঁধাতে পারলেই ওনার আনন্দ। যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও দায় আছে বলে দুর্জনে বলে, সেই যুদ্ধও থামানোর জন্য আমাদের সবার পরিচিত নারদ মুনি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

মহাভারতের মহা যুদ্ধের আগে দুই পক্ষই যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। দুই পক্ষই নিজের দলের শক্তি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন রাজাদের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের নিজের দলে টানছে। এদিকে দুই পক্ষের দূত অন্য পক্ষে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যাতে যুদ্ধটা এড়ানো যায়। পান্ডবদের দূত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। পান্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিক অন্তত পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটা গ্রাম দিলেও যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করবেন না; এই শর্তও দুর্যোধন মানলেন না। দুর্যোধন সকল রকমের নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে , পান্ডবদের দূত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করে রাখারও চক্রান্ত করেছিল। সামনে ভয়াল লোকক্ষয় বুঝতে পেরে নারদ মুনি দুর্যোধনকে বোঝাতে এলেন। মুনি একগুঁয়ে দুর্যোধনকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, একগুঁয়ে জেদ আর ‘বাড়াবাড়ি’, ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে।এই বাড়াবাড়ি ব্যাপারটা কতোটা বাজে দিকে যেতে পারে, সেটা বোঝানোর জন্য , নারদ মুনি পুরাকালের এক কাহিনী বললেন। সে কাহিনী বলবার আগে আমি আপনাদেরকে সবিনয়ে জানাই যে, মহাভারতের সময়টাই আজ থেকে চার সাড়ে চার হাজার বছর আগের। নারদ মুনি যে বাড়াবাড়ির কাহিনী বললেন, সেটা হয়তো আরও দু' হাজার বছর আগের। তাই আমাদের এখনকার কোন যুক্তি বা মূল্যবোধ দিয়ে বিচার করতে বসে যাবেন না। ছয় হাজার বছর আগের সমাজ আর আমাদের আজকের সমাজ এক নয়।

নারদ মুনি দুর্যোধনকে শোনালেন, সুপ্রাচিন গালব মুনি– মাধবীর কাহিনী। গালব মুনি হলেন ব্রহ্মর্ষি বিষ্যামিত্রের শিশ্য। আর মাধবী হলেন বিখ্যাত রাজা যযাতির কন্যা। কাহিনী বেশ লম্বা। সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। শিষ্য গালবের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে , গুরু বিষ্যামিত্র খুশী হয়ে তাঁকে বাড়ি যেতে বললেন। সামান্য ব্রাহ্মণ গালব গুরুকে কিছু দক্ষিনা দিতে চাইলে , গুরু জানালেন, দরকার নেই। এবার “ বাড়াবাড়ি” শুরু করলেন গালব। তিনি বারবার গুরুকে বলতে থাকলেন, কিছু একটা বলুন, আমি আপনাকে দক্ষিনা দেবই। আরে যাও না বাবা, বারবার বলেছেন , গুরু বিষ্যামিত্র। শেষে একসময় বিরক্ত হয়ে এমন “বাড়াবাড়ি” রকমের একটা দক্ষিনা চেয়ে বসলেন যে , আজ ছয় হাজার বছর পরেও তা জোগাড় করা সম্ভব নয়। গুরু বললেন, আমাকে দক্ষিনা হিসেবে আটশো ঘোড়া এনে দাও; যে সে ঘোড়া নয়, এক বিশেষ রকমের ঘোড়া। যে ঘোড়াদের গায়ের রঙ হবে , পুর্নিমা চাঁদের জ্যোৎস্নার মত সাদা। কিন্তু একটা কান হবে কালো। দেখলেন তো দক্ষিনার বাড়াবাড়িটা।

এবার গালব পড়লেন বিপদে। সে তো সামান্য ব্রাহ্মণ , কোথায় পাবে এত , আর এমন বিশেষ ঘোড়া ! ভাবতে ভাবতে চললেন ; বড় কোন রাজার কাছেই এসব পেতে পারি। পৌঁছলেন রাজা যযাতির কাছে। খুব বিখ্যাত রাজা, ধার্মিক রাজা। ব্রাহ্মণকে দান দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত। কিন্তু ঐরকম বিশেষ আটশো ঘোড়া

তো রাজার কাছে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছু চেয়েছেন; তাঁকে না দিয়ে ফেরালে পাপ হবে। তার থেকেও বড় কথা , রাজার দান করার “ বাড়াবাড়ি” রকমের অহংকার থাকে না। রাজা যযাতি গালব মুনিকে বললেন, আমার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, আপনি তাকেই নিয়ে যান। এমন কন্যার জন্য যে কেউ ঐ রকম আটশো ঘোড়া কন্যাপণ হিসেবে দিতেও রাজী হবে। এখানে এই “কন্যাপণ” ব্যাপারটা পরিস্কার হওয়া দরকার। আজকের দিনে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু লাগবেই। কিন্তু তখনকার সমাজে এটাই প্রচলিত ছিল। ছয় হাজার বছর তো বহু বহু পুরনো , আমার বাবা পঁচাত্তর বছর আগে কন্যাপণ দিয়ে আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন।

এর পরের কান্ডগুলি একেবারে রোমহর্ষক বলা যায়। এই রোমহর্ষক কথাটা জেনে বুঝেই লিখেছি। মহাভারতের কাহিনী রাজকন্যা মাধবী চললেন, ব্রাহ্মণ গালবের সাথে। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা পূরণে সহায়তা করা। প্রথম রাজার কাছে ঐ রকম দুশোটি মাত্র ঘোড়া আছে। কিন্তু রাজা ওই রকম সর্ব সূলক্ষণা কন্যাকে বিয়ে করতে চান। গালব মুনীর তো তাতে কাজ হবে না; তাঁর চাই আটশ ঘোড়া। এদিকে রাজা কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। সমস্যার সমাধান করলেন, রাজকন্যা মাধবীই। উনি গালবকে বললেন, যা বোঝা যাচ্ছে এক জায়গায় অপনার ঐ আটশ ঘোড়া পাওয়া যাবে না। আমার একটা **ঋষী**র বর আছে; আমি পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরই আবার কুমারী হয়ে যাব। আপনি চারজন রাজার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে আটশ ঘোড়া নিয়ে নিন। এই সন্তান জন্মের পর মায়ের কুমারী হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা দ্রৌপদীর ক্ষেত্রেও হয়েছিল, এ তো সবাই জানি। গালব মুনি দু'শ ঘোড়া নিয়ে চলে গেলেন।

এই দেখা যাচ্ছে মাধবীর ‘বাড়াবাড়ি’। ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য তাঁর তো আত্মত্যাগের দরকার ছিল না। দেবতা বা ঋষীর বর আছে বলেই পরপর চারজনকে বিয়ে করতে হবে? এটাও নিশ্চয়ই নিজেকে ত্যাগী দেখানোর অহংকার। গালব মুনি তো ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, তাঁর বোঝার কথা নয়, একজন মহিলা তার বহু বিবাহের ইচ্ছা কেন প্রকাশ করেছেন। মুনি কিন্তু নিজে বলেননি।

পর পর তিন রাজাকে বিয়ে করে মাধবী মুনিকে ছ্য়শ ঘোড়া জোগাড় করে দিলেন। গালব মুনি বিষ্ণুর বাহন গরুড়-এর পিঠে চেপে গোটা পৃথিবী ঘুরে বুঝে গেছেন, আর কোথাও ওরকম ঘোড়া নেই। এবার বাধ্য হয়েই গুরু বিশ্বামিত্রর কাছে এসে বললেন যে , ছ্য়শ ঘোড়া পাওয়া গেছে। আর কোথাও ওরকম ঘোড়া নেই; থাকলে চতুর্থবার এই কন্যার বিয়ে দিয়ে বাকী দু'শো ঘোড়াও আনা যেত। মহা মুনী বিশ্বামিত্র ঐ অলৌকিক প্রায় কন্যাকে বিয়ে করে তাঁর গর্ভে একজন পুণ্যবান পুত্র লাভের আশা করলেন। মাধবী তাতেই রাজী হয়ে গালব মুনিকে প্রতিজ্ঞা পূর্ন করতে সাহায্য করলেন। গুরুর পুত্র লাভ হয়ে গেলে গালব মুনি, মাধবীকে তাঁর বাবার কাছে রেখে এলেন। রাজা যযাতি চারজন পূণ্যবান নাতি পেয়ে আনন্দিত হলেন।

এরপর রাজা যযাতি কন্যা মাধবীর স্বয়ম্বর-এর আয়োজন করলেন। সেখানে দেবতারাও এসে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু মাধবী কাউকেই বিয়ে না করে তপোবনকে বরমাল্য দিলেন। অর্থাৎ তিনি তপস্বিনী হয়ে গেলেন। চার বার বিয়ে করার পর পঞ্চম বার বিয়েটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলেই কি মাধবী আর বিয়ে করলেন না? গবেষকরা এ

নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন। আমাদের আগ্রহ মহাভারত-এর গল্প শোনাতে। মহাকবি আমাদের কি গল্প শোনাচ্ছেন দেখি। মহাভারতের আদি পর্বে দেখা যাচ্ছে , কুরু বংশের আদি পিতা রাজা যযাতি। পুত্র পুরুর মহানুভবতায় হাজার বছর যৌবন লাভের পর, সেই পুরুকেই যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে নিজে তপস্যা করতে শুরু করলেন। তপস্যার পূণ্য ফলে রাজা যযাতি সরাসরি স্বর্গে চলে গেলেন। কিন্তু স্বর্গেও একদিন তাঁর পূণ্য ক্ষয় হয়ে গেল। তার স্বর্গ থেকে পতন হল। যযাতি ইন্দ্র দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি মর্তে গিয়েও পুণ্যবান লোকেদের মধ্যে পড়েন। এদিকে মাধবীর সেই চার পূণ্যবান পুত্র নৈমিষারন্যে যজ্ঞ করছিলেন। তাঁদের সেই যজ্ঞের ধুম স্বর্গের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

ঐ যজ্ঞ ধুম অনুসরণ করে স্বর্গচ্যুত যযাতি সেই চার পূণ্যবান রাজার যজ্ঞ স্থানে এসে হাজির হলেন। তিনি এই পূণ্যবানদের কাছে একটু পূণ্য ভিক্ষা করলেন, যাতে তিনি স্বর্গে ফিরে যেতে পারেন। তিনি কিন্তু জানতেন না যে এই চারজন তাঁই মেয়ের ঘরের নাতি। তপস্বিনী মাধবী কাছেই হরিণদের সাথে ছিলেন; তিনি এসে বাবা যযাতির সাথে নাতিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাতিদের আর কন্যার পুণ্যের ভাগ নিয়ে রাজা যযাতি আবার স্বর্গে ফিরে গেলেন।

মহাভারত এর কাহিনীর স্বাভাবিক ধারার মতই এখানেও কাহিনীর মধ্যে কাহিনী তার মধ্যে কাহিনী ঢুকে গেছে। রাজার মেয়ের ঘরের নাতি, দাদুকে পুণ্যের ভাগ দিয়ে স্বর্গে পাঠাল। এই উদাহরণ দিয়ে পারলৌকিক কাজে কন্যা সন্তানের ভূমিকা দেখানো হয়েছে। আমাদের যাদের পরকালের চিন্তা নেই, তাদের এতে আগ্রহ নাই থাকতে পারে। কিন্তু মহাকাব্যের কবি যে আমাদের কোন কিছু নিয়েই "বাড়াবাড়ি" করতে বারণ করলেন, বাস্তব জীবনের চলার পথে সেটাই মূল্যবান পরামর্শ।

আমার ইন্দ্রনাথ, নির্মলদাদা।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের সেই ডানপিটে দাদা ইন্দ্রনাথকে মনে আছে নিশ্চয়ই। সেই গভীর রাতে মাছ ধরতে যাওয়া। মাছ চুরি। এসব গল্প যখন পড়েছি তার অনেক আগেই আমার নির্মলদাদার সাথে সাথে ওভাবে বন বাদাড়ে অনেক ঘুরেছি। ওটা যে কেউ বইতে লিখে গেছেন , ওসব যে আবার লেখার মত জিনিস কোনদিন ভাবিই নি।

আমি তখন বোধহয় ক্লাশ ফোরে পড়ি; আমাদের মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়ীতে এল নির্মলদা। আমার এক কাকার ছেলে। ওদের বাড়ী টিটাগড়ে। আমাদের কাছে সেই সময় ওরা কলকাতার লোক। ওর বড় দাদাও আমাদের বাড়ীতে দু তিন বছর থেকে গেছে শুনেছি, দেখিনি। এই নির্মলদা আমার থেকে বছর দুই তিনের বড়। স্কুলে এসে ক্লাশ ফাইবে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু পরে বোধহয় এক দুবার ফেল করে আমার থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। কলকাতায় থাকলে লেখাপড়া হবে না, তাই মেজ জ্যাঠা মশাই এর বাড়ীতে আশ্রয়। বাবা স্কুল মাষ্টার মশাই ছিলেন, বাড়ীতে একটা লেখাপড়ার পরিবেশ ছিল। তাই বাবা নির্মলদাকে মেদিনীপুরের স্কুলে পড়ার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ওর পড়াশুনায় মনোযোগ ছিল না। কিন্তু প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারত। খেলাধুলায় তুখোড় ছিল। খেলা মানে কিন্তু ফুটবল ক্রিকেট নয়। মেদিনীপুরের কিছু গ্রামের খেলা ছিল, আজকাল আর দেখিনা। গাদি বা গিজা বলে একটা খেলা ছিল। কোন ব্যাট বল কিছুই দরকার নেই, মাঠে একবার দড়ি ধরে কতগুলি দাগ টেনে নিলেই হল। এক এক দলে পাঁচ ছয় জন করে খেলা হত। প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করে খেলতে হত। এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের প্রতিযোগিতা হত। এই নির্মল দাদাকে অন্য গ্রামের দলে খেলার জন্য ভাড়া করে নিয়ে যেত। ওর শারীরিক পটুতা কেমন ছিল, আমার দেখা একটি ঘটনা বললে বুঝবেন। স্কুলের টিফিন এর সময় আমরা স্কুলের সামনের মাঠে খেলছিলাম। কয়েকটা শালিক পাখী মাঠে চরছিল। নির্মলদার বন্ধু কেউ ওকে বলেছিল, ঐ একটা শালিক পাখী ধরতে। বার তিনেক বেড়ালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা পাখী ধরে ফেলল। হাঁটু কনুই ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরলেও নির্বিকার। এরকম বেশ কিছু ব্যাপারে ওর সাংঘাতিক সহ্য ক্ষমতা দেখেছি। সে সময় মেদিনীপুরের গ্রামে অনেক মৌচাক দেখা যেত। গাছের ডালে, ঝোপের মধ্যে ছোট কালো কালো মৌমাছির চাক। এখন সাধারণত বড় গাছের ডালে বা পাকা বাড়ীর ছাদ থেকে যে বড় বড় মাছির পাহাড়ী মৌচাক দেখা যায়, এগুলী ভয়ংকর। নির্মল দাদাও ওদের ভয় পেতো। ওই ছোট মৌচাক বিশেষ করে আমের মুকুলের সময় অনেক দেখতাম। দাদা ছিল ওই মৌচাক ভাঙ্গার ওস্তাদ। একবার একটা ঝোপের মধ্যে একটা বিরাট মৌচাক ভাঙ্গতে গিয়ে ওর মুখে এত বেশী হুল ফুটেছিল যে মুখটা সাদা দেখাচ্ছিল। ওর কিন্তু কোন জ্বালা যন্ত্রণা করছিল বলে মনে হয়নি। গ্রীষ্মের কাঠ ফাটা দুপুরে আমরা দুজন মৌচাক ভাঙ্গতে বেরোতাম। কোথায় কোন ঝোপে মৌচাক লুকিয়ে আছে, ও যেন গন্ধ পেত। দুপুর বেলা লোকের বাড়ীর ছাচ তলা থেকে মৌচাক ভেঙ্গে নিয়ে আসত। আর ছিল মাছ ধরার নেশা। কত বিচিত্র কায়দায় যে মাছ ধরতে পারত! সখের মৎস শিকারিদের মত, হুইল লাগানো ছিপ ফেলে কোনোদিন মাছ ধরতে দেখিনি। এই মাছ ধরার জন্য ঘোর অন্ধকার রাত্রে, তুমুল বর্ষার মধ্যে বেরিয়ে পড়ত। কতবার যে মাছ ধরতে গিয়ে সাপের সামনে পড়েছে তার হিসেব নেই। বন্যার সময় এক অদ্ভুত কায়দায় মাছ মারতো। বড় রাস্তার পাশে যেখানে বন্যার জল এসে থামত সেই সব জায়গায় কিছু জিওল মাছ এসে বসে থাকত। রাত্রে টর্চের আলো পড়লে সেই মাচগুলি থমকে যেত। একটা কাস্তের পিছন দিক দিয়ে ওই মাছের মাথায় মেরে ওদের কাবু করে দিত। এরকম এক রাত্রে টর্চের আলোয় একটি ফুট দেড়েকের কালাচ সাপ দেখল। আমরা তখন ওদের কালচিতি সাপ বলতাম। নির্মল দাদা মাছ মারার কাস্তের পিছন দিক দিয়ে ঐ সাপের মাথায় মোক্ষম আঘাত করে মেরে ফেলল। এখন ভাবলেই ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। তখন আসলে আমরা জানতামই না, এটা এত বিপজ্জনক একটা সাপ।

ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় ও কলকাতায় ফিরে এল। আমিও বছর দুই পরে কলকাতায় চলে এলাম। শ্যামবাজারের স্কুলে পড়ার সময় একদিন বেলোগাছিয়ায় গেলাম ওর সাথে দেখা করতে। প্রায় ৪৭-৪৮ বছর আগের খবর। কি করে ওর সেই ব্যাটারী কারখানার ঠিকানা খুঁজে গেছলাম, আজ আর মনে নেই। এসিড ঢালা ব্যাটারীর প্লেট বানাতো। ওর কাজের জায়গায় এসিড এর ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়েছিলাম। অনেক বছর পর, আমি ওর ব্যারাকপুরের বাড়ীতে দেখা করতে গেলাম। ব্যাটারী কারখানার থেকে লেড এর বিষ একটু একটু করে ওর শরীরের সকল স্নায়ু দুর্বল করে ফেলেছিল। আমি ব্যারাকপুরের হাসপতালে চাকরী করার সময় মাঝে মাঝেই ওদের বাড়ী যেতাম। ওর ছেলে তখন স্কুলে পড়ে। একদিন আমাকে একটা প্রশ্ন করে বিপদে ফেলে দিয়েছিল। ছেলেটি আমাকে বলেছিল, আমার বাবা যদি তোমার দাদা হয়, তুমি ওর সাথে তুই করে কথা বলছ কেন? সত্যিই তো, এটা ভেবে দেখিনি। ঐ ক্রনিক লেড পয়জনিং এই বেশ কম বয়সে নির্মল দাদা মারা গেছে, সেও বছর পনের হবে। আমার ছোট বেলার খেলার সঙ্গীদের কয়েকজন আগেই মারা গেছে। এবার তো আমিও, সরকারী ভাবেই বরিষ্ঠ নাগরিক হয়ে গেছি। এখন শুধুই স্মৃতি নিয়ে দিন কাটানো। ৩০.৯.২৪.

নেংটি ও সেই হাদু মাছের গল্প

একটি নেংটি ইদুর এর জন্য আজ আমি ঘর ছাড়া। বাঘ ভালুক নয়, বিষধর সাপ নয়, কোন জঙ্গিও নয়, সামান্য এক নেংটি ইদুর আজ সকাল থেকে দুপুর, মানে এই প্রায় বারোটা পর্যন্ত আমাকে ঘর ছাড়া করে রেখেছে। আমি থাকি তিনতলার ফ্লাট বাড়ীতে। মশার ভয়ে দরজা খুলে ঢোকা বেরোনোর কয়েক সেকেন্ড ছাড়া আমার বাসায় মশা মাছি ঢোকাও প্রায় বন্ধ। প্রতিটা জানালায় সুক্ষ্ম জাল লাগানো আছে, মশা মাছি আটকানোর জন্য। এমনকি বারান্দার দিকের দুটি দরজাতেও মশার নেট এর ব্যবস্থা আছে। দশ বছরের বেশী হয়ে গেল, এই ফ্লাটে এসেছি। যতদূর মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে একবার একটি নেংটি ইদুর দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে গেছল। সেটা আবার দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেছল। এবার একজনের উপস্থিতি টের পাচ্ছি, একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাকে বলে। কিন্তু এখনও তাকে চোখে দেখিনি।

গতকাল সকালে কোনার বারান্দার দিকের দরজায় লাগানো মশার নেট খুলতে গিয়ে দেখি, নিচে এক কোনার দিকে একটি গোল করে কাটা জায়গা। কাটা জালের টুকরো দেখেই বুঝতে পারলাম, নেংটি ইদুর এর কীর্তি। যদি জাল কেটে কোনার বারান্দায় বেরিয়ে যায়ও, ওখান থেকে নিচে নামতে পারবে কি? একটু সন্দেহ ছিল। কাল রাত্রে আমার স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেছে, ইদুরের কটর কটর দাঁত চালানোর শব্দে। ঠাণ্ডা পড়ে গেছে বলেই গতকাল রাত থেকে আর দরজা খোলা রাখা হয়নি। সকালে দু মাইল হেঁটে ফিরে এসে দেখি, দরজার নিচের দিকে প্রায় সাত আট ইঞ্চি জায়গার প্লাই বোর্ড কেটেছে। নেট না পেয়ে, কাঠ কামড়ে কেটেছে! অন্য ঘরের জানালার নেট পরীক্ষা করে দেখা গেল, দুটি জানালার নেটে তিনটি ফুটো করেছে। এ তো এক মহা বিড়ম্বনায় পড়তে হল। এক তো জানালার নেট কেটে রাখলে, দিনরাত জানালা খুলে রাখা যাবে না। দমদমের কুখ্যাত মশার কামড় খেয়ে দু দিনেই ডেঙ্গু হবে। তাছাড়া এটা ঘরের ভেতর থাকলে আরও কি কি কেটে নষ্ট করবে, কে জানে! বুঝতে পারছি, আমাদের ঘরে ও যতোই চেষ্টা করুক, খাওয়ার পাচ্ছে না। আমাদের সমস্ত খাওয়ার জিনিস এমন ভাবেই রাখা যে, ইঁদুরের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। একমাত্র খাদ্য কিছু ফল, ঝুড়ি ঝুড়ি করে ফ্রিজের উপরে রাখা থাকে। দুই রাত্রে কোন ফল নষ্ট করেনি দেখেই বুঝতে পারলাম, ওটা ফ্রীজের উপর উঠতে পারছে না। আর এখানে খাদ্য বা জল কিছুই না পেয়ে, মরিয়া হয়ে বাইরে বেরোতে চাইছে।

এবার কথা হল, ওটা ঢুকল কোন পথে? দরজা দিয়ে ঢুকতে হলে ওকে দরজার বাইরে ওৎ পেতে বসে থাকতে হয়েছে। আমরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য দরজা খুলে ঢোকা বা বেরোনোর সময় টুক করে ঢুকে পড়েছে। ঘরে এমন কিছু বড় বোঝা দু এক সপ্তাহেও ঢোকেনি যে তার মধ্যে লুকিয়ে ঢুকে পড়েছে। একটা সামান্য সম্ভাবনার কথা মনে আসছে। দিন দুই আগে, এ সি পরিষ্কার করতে দুজন মিস্তিরি এসেছিল। ওদের যন্ত্র পাতি আনার বড় ব্যাগ ছিল; সেই ব্যাগে ঢুকে এসে থাকতে পারে। যেভাবেই আসুক , ওটাকে ঘর থেকে বের করতে না পারলে, ও যে আরও অনেক ক্ষতি করবে , সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই আজ সকাল থেকেই ওকে ধরার জন্য তোড়জোড় শুরু করতে হল। অনেক বছর আগে একটা ছোট ইঁদুর ধরার খাঁচা কেনা হয়েছিল, ব্যারাকপুরের বাড়ীতে। সেটা আনা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু কোথায় ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে, এত দিন পর মনে করা মুশকিল। মেয়ে কিছুদিন আগে, জুতোর বাক্স গুছিয়ে ছিল; ওর খেয়াল হল, ওটা জুতোর বাক্সে আছে। বেরকরে আনা হল। বেশ ভালো আছে। ঐ ফাঁদে একটা খাওয়ার বেঁধে রাখতে হয়। ঘরে পাঁউরুটি ছিল। তাই গরম করে, তাতে একটু ঘী মাখিয়ে খাঁচার ভেতর রাখা হল। এই করতে গিয়েই মনে পড়ল বছর তিরিশ আগের একটি কথা। মেদিনীপুরে দাতব্য চক্ষু হাসপতালের কোয়ার্টারে থাকতাম তখন। এরকম একটা ইঁদুর ধরার খাঁচা ব্যবহার করতে হবে। টোপ হিসেব দেওয়ার জন্য শুঁটকি মাছ আনা হল। সম্ভবত এই শুঁটকি মাছের বুদ্ধিটা দিয়েছিল, আমার তখনকার গাড়ীর ড্রাইভার ছেলেটি। এখন আর ওর নাম মনে নেই। পদবি ছিল, তালুকদার। একটু ফাজিল মত ছেলে ছিল। সন্ধ্যে বেলা আমরা ঐ ইঁদুর ধরার খাঁচা নিয়ে বারন্দায় বসেছি। শুঁটকি মাছ কি করে ঐ খাঁচার ভেতরের আংটায় আটকানো যায়, তাই নিয়ে কেরামতি চলছে। আমার ছেলে তখন বছর তিনেকের। সব কিছুতেই প্রবল কৌতুহল। আর এই ইঁদুর ধরার খাঁচা তো একটা মজার ব্যাপার বটেই। ছেলে এসে আমাদের গা ঘেঁসে বসেছে। হঠাৎ ড্রাইভার ছেলেটি একটা শুঁটকি মাছ তুলে , ছেলের নাকের কাছে ধরেছে। শুঁটকির বিকট দুর্গন্ধকে ঐ তিন বছরের বাচ্চা যে ভাবে বর্ণনা করেছিল, আজও সেটা আমাদের ছবির মত চোখে ভাসে। অর্মৃতম বালভাসিতম নিবন্ধে ছেলের ছোট বেলার কয়েকটা মজার উচ্চারণ লিখেছিলাম। কি করে যেন এই ব্যপারটা লিখতে ভুলে গেছলাম। আজ আবার ঐ পাঁউরুটি খাঁচায় আটকানোর সময় মনে পড়ল। ছেলে দুর্গন্ধে ছিটকে পিছিয়ে গিয়ে বলেছিল, " হাদু মাছ" ; অর্থাৎ হাগু মাছ। আজ তো হাদু মাছ আনার চেষ্টা করিনি। ঐ পাঁউরুটি খাঁচায় দিয়েই ফাঁদ পাতা হয়েছে।

সে তো হল। কিন্তু আমি ঘর ছাড়া কেন? আমি কি খুব ভীতু লোক? ইঁদুরের ভয়ে ঘর ছাড়া? না। আসলে ঐ ঘরে আমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকি। আজ কয়েক মিনিটে একটা জরুরী কাজ সেরে নিয়ে কম্পিউটার

বন্ধ করতে হয়েছে। ঐ ঘরে খাঁচা পেতে, ঘরের জানালার পর্দা টেনে, ঘর অন্ধকার করে রেখেছি। দেখা যাক, ইঁদুর কলে পড়ে কি না। আমি তো বেশ " খ্যাঁচা কলে পড়ে গেলাম!" ১৯.১১.২৪.

পাখীর ডাকে
পাখীর ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেছে কোনোদিন? আজও নিশ্চয়ই অনেক গ্রামের মানুষের ঘুম ভাঙছে ভোরের মোরগের ডাকে। আমরা যারা শহরে নির্বাসিত, আমরা তো ভুলেই গেছি, একদিন ভোরে উঠে আমরাও মোরগের ডাক শুনেছি। আমাদের বাড়ীতে কোনোদিন মোরগ মুরগী ছিল না। কিন্তু গ্রামের শান্ত পরিবেশে অনেক দূরের বাড়ী থেকেও মোরগের ডাক ভেসে আসতো। তখন অবশ্য আমিও প্রায় দিনই মোরগের থেকেও আগে ঘুম থেকে উঠে পড়তাম। এখন তো অনেক মোবাইলে সকালে এলার্ম বাজে; কেউ কেউ নিশ্চয়ই মোরগের ডাকও বাজায়। এখানেই একটি অপ্রিয় সত্যি কথা বলে দেওয়া ভালো। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, গ্রাম সম্বন্ধে আমার দারুণ কিছু দুর্বলতা আছে তাই বুঝি গ্রামের প্রকৃতি নিয়ে কাব্য রচনা করতে বসেছি। না, মোটেই না। বছর চল্লিশ হল গ্রামে একটি নতুন দূষণ শুরু হয়েছে; আর দিনকে দিন সেই দূষণ বেড়েই চলেছে। গ্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জোরে হাঁচি দিলেও দু চারজন খুচরো নেতা জুটে যেতে পারে। চাই কি দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যেতে পারে। শহরে শত দূষণ, শত অশান্তির মধ্যেও, আমি চাইলে এই রাজনৈতিক দূষণ থেকে দূরে থাকতে পারি। গ্রামে বসে আপনি ঐ দূষণ এড়াতে পারবেন না। এটা কিন্তু গ্রামের বদনাম করার জন্য হঠাৎ বলে ফেললাম, সেরকম নয়। দূষণ নিয়ে লেখাটা পড়ে, আমার এক বন্ধু মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, আরও কয়েকটি দূষণের কথা বাদ চলে গেছে। যে কথা হচ্ছিল; পাখীর ডাক। ঠিক মত বলতে গেলে, আমি আজ পাখীর কলরব নিয়ে কিছু কথা বলতে চাইছি।
ঐ দূষণের জন্য কি পাখীর কিচির মিচির বা কলরব অনেক কমে গেছে? অনেকে বলেন, তাঁদের এলাকায় এখন আর চড়াই পাখী দেখা যায় না। আমার ভাগ্য ভালো , আমার বর্তমান বাসস্থানের কাছে চড়াই পাখী অনেক আছে। কেউ কেউ বলেন, মোবাইল ফোনের টাওয়ার থেকে যে দূষণ হয় তার জন্য , চড়াই পাখী কমে গেছে। তাই যদি হবে তাহলে কি বলতে হবে, দমদমে মোবাইলের ঐ দূষণ নেই, বা কম আছে? এখানেও তো অনেক মোবাইল টাওয়ার। আমার ফ্ল্যাটের কোনের বারান্দায় বেশ কয়েক বছর ধরেই চড়াই, শালিক, ঘুঘু পাখিদের আনাগোনা। চড়াইদের জন্য একটি ছোট্ট মাটির পাত্রে প্রতিদিন, ঘাসের দানা দিয়ে রাখি। চড়াই তো আসেই, দুই একটি ঘুঘু পাখিও ঐ দানা খেয়ে যায়। কালো পায়রা আর কাকের অভাব বোধহয় কোথাও এখনো হয়নি। কাক নিয়মিত আসে না। কিন্তু ওদের খাওয়ার মত কিছু রাখা হচ্ছে দেখলে একশ মিটার দূর থেকেও দেখতে পায়; সাথে সাথেই দু 'চারজন উড়ে এসে তুলে নিয়ে যায়। কালো পায়রা আমাদের আবাসনের অন্যদিকটায় থাকে। আমার নিচের ফ্ল্যাটের কোনার বারন্দায় পায়রাদের জন্য খাওয়ার দেওয়া থাকে। মাঝে মাঝে ওরা এসে হুড়োহুড়ি করে; উপরেও এসে একবার খাওয়ার খুঁজে যায় সে সময়। আমার বারান্দায় প্লাষ্টিকের বাটিতে জল দেওয়া থাকে, সারা বছরই। যার যখন ইচ্ছা করে, এসে জল খেয়ে যায়। কেউ কেউ ঐ বাটিতে স্নান করে। কোন কোন সময় চড়াইদের অত্যাচারও চলে। বেশ চলছে দুই তিন মাস; হঠাৎ কেন জানিনা, ওদের তুলসী পাতা খাওয়ার ইচ্ছা হয়। টবের তুলসী পাতা আর জবা গাছের পাতা ঠুকরে খেতে শুরু করে। পাশের বড় আবাসন তৈরী হওয়ার আগে ওখানে একটা বকুল গাছ ছিল। সেই গাছে বেশ কয়েকটি কোকিল থাকত; গাছ কাটা পড়ার পর ওরা দূরের কোন গাছে চলে গেছে। এখন বসন্ত কালে তো বটেই, অন্য সময়ও দুই এক জন ভোরের দিকে ডাক দিয়ে জানিয়ে দেয়, ওরা আছে। এখন আমার ঘুম ভাঙ্গে শালিক আর চড়াই পাখিদের ডাকে। ঘুম ভাঙ্গে কথাটা ঠিক বললাম না। প্রায় দিনই ঘুম ভেঙ্গে যায় আগেই; উঠে পড়ি , যখন বুঝতে পারি, " পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।" কয়েক বছর আগে একবার উত্তর বঙ্গের এক নামকরা বনের মধ্যে, একটি বন বাংলোতে রাত্রে ছিলাম। রাত্রে পৌঁছেছিলাম। মার্চের প্রথমে হলেও সন্ধ্যার পর এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল; কম্বল গায়ে ঘুমাতে হয়েছিল। ভোরে , আক্ষরিক অর্থেই পাখিদের কলরবে ঘুম ভেঙ্গেছিল। উঠে পিছনের দিকের বারান্দায় বেরিয়ে তো শুনি, পাখিদের জলসা বসে গেছে। কতো রকমের পাখী যে ডাকাডাকি করছিল ! তার বছর তিনেক পরে , এক গ্রীষ্মের বিকেলে পৌঁছেছিলাম, বাঁকুড়ার রাধানগর গ্রামে। বিকেলে, সৌম্য স্যারের সাথে ওর স্কুলের দিকে ঘুরতে বেড়িয়ে একটা ঝোপে ডাহুকের হট্টগোল শুনেছিলাম। ভোরে ঘুম ভাঙ্গলো পাখিদের কলরবে। সে এক বিরল অভিজ্ঞতা। আমি আমার ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে ছাদে উঠে গেলাম। তখনও বেশ অন্ধকার; পাখিদের ছবি আসছিল না। কিন্তু বাড়ীর ছাদ লাগানো গোটা তিনেক গাছে , পাখিদের হট্ট মেলা যেন। কত রকমের আর কত শত পাখী যে ডাকাডাকি করছিল সে বোঝার উপায় নেই। সেই পাখীর কলতান রেকর্ড করে নিলাম। আর একবার চন্দ্রকোনা রোডে, আমার বন্ধু অশোকের বাড়ীতে রাত্রে ছিলাম। ভোরে ঘুম ভাঙ্গলো পাখিদের কলরবে। দোতলার জানালার বাইরে অসংখ্য শালিক আর চড়াই। আমার ছোট্ট ডিজিটাল ক্যামেরা অন করে জানালায় রেখে দিয়েছিলাম। সেই সুন্দর কলতান আজও আমার মোবাইলের রিং টোন। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের গোবিন্দ নগর চত্বরে বেশ কিছু গাছ এখনও আছে। বড় বড় শামুখখোল এর মত পাখিরা এখন সারা বছরই থাকে। ঐ গাছগুলির তলা দিয়ে, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর চলা ফেরাকরা সমস্যার; পাখীর বিষ্ঠা মাথায় পড়বেই। একপাশে একটা বাগান মত জায়গায় কিছু

বড় ঝোপ ঝাড় অযত্নে পড়ে আছে। সন্ধ্যার মুখে ওখানে গেলে প্রচুর পাখীর কিচির মিচির গানে মুখরিত হয়ে থাকে, শোনা যায়। জলপাইগুড়ি জেলা শহরের একটু পাশের দিকে , করলা নদীর পাড়ে কয়েকটি বড় , পরিত্যক্ত বাগানের মত ছিল। বড় বড় গাছ কিছু থাকলেও, ফুলের বাগান চোখে পড়ল না। সকালে উঠে হাঁটতে হাঁটতে ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। পাখীর কলরব না হলেও, কোকিলের কুহু তান শুনে থেমে গেলাম। রেকর্ড করে নিলাম। সেটাও আমি রিং টোন করে ব্যাবহার করেছি। ঐ বাগানেই একটি নাম না জানা পাখী লাগাতার তুক তুক্ করে ডেকেই যাচ্ছিল। সে ডাক শুনে একজন অভিজ্ঞ মানুষ জানিয়ে ছিলেন, ওটা বসন্ত বৌরি পাখীর ডাক। তারপর থেকে কোন গাছে ঐ ডাক শুনতে পেলে দাঁড়িয়ে খুঁজে দেখেছি; প্রায়ই পাখিটা দেখতে পেয়েছি। কেরালার মুন্নারে এক সকালে উঠে, হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেকর্ড করেছিলাম, অসংখ্য পাখীর কলতান। কদিন আগে ঘুরে এলাম, হুগলী জেলার বলাগরের কাছে, সবুজ দ্বীপে। দুপুরে হোটেলে ঢোকার সময়ই দেখেছি, বড় বড় গাছের মাথায়, শামুকখোলের মত বড় বড় পাখীর বাসা। আর কক কক করে ডাকছিল; তাকে ঠিক কলতান বলা যায় না। বিকেল কুয়াশা থাকায়, সাড়ে চারটা নাগাদ সূর্য হারিয়ে গেল, কিন্তু আলো থাকল আরও প্রায় এক ঘন্টা। অন্ধকার হওয়ার আধ ঘন্টা মত আগে থেকে, আধ ঘন্টা পর পর্যন্ত গোটা এলাকা পাখিদের কলরবে মাতোয়ারা হয়ে থাকল। ওখানে একটি সুন্দর ওয়াচ টাওয়ার আছে। তার উপরে উঠে দেখলাম, চার দিক থেকেই, নদীর উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে আসছে। করেক হাজার। এত কাক একসাথে আমি কোনোদিন দেখিনি। কাক আর শালিক এক সাথে কলরব করেই চলল। গাছের মাথায় মাথায় বসে থাকা আর দল বেঁধে উড়ে যাওয়া পাখিদের ভিডিও রেকর্ডিং করলাম, মোবাইলেই। সবুজ দ্বীপের গোটা চত্বর সন্ধ্যার পর থেকে আলোকিত হয়ে থাকে। পাখীরাও তাই অনেক সময় পর্যন্ত সমানে ডেকে গেল। ভোরেও তাই; আলো ফোটার আধ ঘন্টা আগে থেকে, আধ ঘন্টা পর পর্যন্ত চলল ওদের জলসা। বিকেলে ওদের ফিরতে দেখেছি, অনেক সময় পর্যন্ত। সকালে কিন্তু প্রায় হঠাৎ করেই সকলে একসাথে বেড়িয়ে গেল, দ্বীপ ছেড়ে। এত পাখী, কোথায় কত দূরে চলে যায় জানিনা। এত কাক আর শালিকের খাদ্য পেতে নিশ্চয়ই অনেক অনেক গ্রামে ওদের ছড়িয়ে পড়তে হয়। ওদিকের গ্রামে গ্রামে এখনও বেশ গাছ আছে। তবুও ওরা এই দ্বীপেই কেন রাত কাটায়? জানি না। দ্বীপ বা ঝাঁকড়া গাছ হলেই ওরা থাকবে, এমন কিন্তু কোন ঠিক নেই। প্রায় বছর কুড়ি আগে একবার সুন্দরবনে বেড়াতে গেছলাম। এক দাদা বলেছিলেন, সরকারী লঞ্চে যাচ্ছেন; খুব ভালো লাগবে। ভালো খাওয়ার দাওয়ার দেবে। কিন্তু বাঘ তো নয়ই, একটা কাকও দেখতে পাবেন না। কথাটা খারাপ কিছু বলেননি। কয়েকটা হরিণ ছাড়া, বন্য প্রাণী আর কিচ্ছুই প্রায় চোখে পড়েনি। সেবার লঞ্চেই ছিলাম রাত্রে। ভোরেও কোন পাখীর ডাক শুনিনি। আবার গেলাম বছর পনের পরে। এবার বেসরকারি নৌকায়। সন্ধ্যার মুখে পাখিরালয় দ্বীপে নামাল; ওখানেই রাত্রে থাকা, লজে। পাখিরালয় নাম শুনে মনে হয়েছিল, অনেক পাখী দেখতে পাবো। না, সেখানেও প্রায় কোন পাখী নেই। পাখী না থাকলে সেই জায়গা আমার ভালো লাগে না। তবে, এটা না বললে অন্যায় হবে; আন্দামানের নীল সাগর আর কাশ্মীরের নিস্বর্গ ভালো লাগবেই। সেসব জায়গায় পাখী সেরকম দেখিনি। ২৯.১১.২৪.

পা ছুঁয়ে প্রণাম
গতকাল আমাদের কলেজের একটা বড় গ্রুপে , " পা ছুঁয়ে প্রণাম" এই নিয়ে বেশ আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত যা বোঝাগেল, আমাদের এই পুরোনো শ্রদ্ধা জানানোর প্রথা আজও টিকে আছে।
প্রসঙ্গটা এলো আমার একটি কয়েক বছরের পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে । এখনকার একটি প্রচলিত ধারণা, এখন আর ছাত্ররা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করে না। হয়তো সমাজের অধিকাংশ শিক্ষক মশাইদের সেরকমই অভিজ্ঞতা। আমি বছর পনের বা তার বেশি সময় ধরে নতুন ডাক্তারদের সাপের কামড় এর চিকিৎসা বিষয়ে পড়াই। আমার এই ডাক্তার ভাইদের কেউ কেউ এখনও দেখা হলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এই খবর দেখে আমার কলেজের এক ভাই, যে নিজেই এখন বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের একজন শিক্ষক, লিখেছে, মাত্র তিনদিন আগেই কলকাতার এক মেডিক্যাল কলেজের এক অনুষ্ঠানে , ওর দুই প্রাক্তন ছাত্র কিছু পুরস্কার পেয়েছে। তারা দুইজনেই ওকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। আসলে ঠিক পা ছুঁয়ে প্রণাম না করলেও, বহু ছাত্র তাঁদের প্রিয় বা শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছে নানা ভাবে শ্রদ্ধার প্রকাশ করে।
এখানে মনে পড়ল, গীতার চতুর্থ অধ্যায় এর চৌত্রিশ নম্বর শ্লোকের কথা।
" তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪-৩৪॥"একজন শিষ্য বা ছাত্র ঠিক কিভাবে গুরু বা শিষ্যের কাছে শিক্ষা লাভ করবে , তার নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে। শিষ্য প্রণাম করে , প্রশ্ন করে, গুরুর সেবা করে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই কথাগুলি প্রায় চার হাজার বছর আগে বলা হয়েছে। সে সময় আজকের মত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা ছিল না। এখন ছাত্রেরা স্কুলের বা কলেজের বেতন দিয়ে পড়াশুনা করে। গুরুরও সরাসরি শিষ্য বা ছাত্রের কাছ থেকে বেতন বা গুরু দক্ষিণা নেওয়ার দরকার পড়ে না। সেই বেদ বা মহাভারতের যুগে, শিষ্য বা ছাত্র গুরুর বাড়ীতেই থেকে পড়াশুনা করতে যেত। তাই তাদের সরাসরি গুরুর সেবার কাজও করতে হত। কিন্তু ঐ যে, প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া, এটা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। আমি নিজে যখন ছাত্র ছিলাম তখনও মাঝে মাঝে শিক্ষকদের প্রশ্ন করে নানা জিনিস জেনে নিয়েছি। আমাদের ছাত্র জীবনে , অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর আগে শিক্ষকরাও প্রশ্ন করলে বিব্রত বোধ করতেন না। ছাত্রের প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে পরে, নিজে জেনে এসে উত্তর দিতেন। কিন্তু ভুল উত্তর দিয়ে চালাকি করার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু কলেজে গিয়ে দেখলাম কোন কোন শিক্ষক চালাকি করে একেবারে ভুল উত্তর দিচ্ছেন। অবক্ষয়ের শুরু বোধহয় সেই সময় থেকেই। ঐ চালাকি এক সময় ছাত্রের কাছে ধরা পড়ে যায়। তখন কিন্তু আর ছাত্রের কাছে শ্রদ্ধা আশাকরি না। নিজে বয়স্কদের শেখাতে গিয়ে দেখলাম, আন্তরিক ভাবে শেখালে, ছাত্রদের প্রশ্ন শিক্ষককে আরও উৎসাহিত করে। @দয়াল বন্ধু
এবার আসি সেই প্রনিপাতের কথায়। শুধুই স্কুল কলেজের ছাত্ররাই কি প্রণাম করে? এখনও সমাজের শ্রদ্ধেয় মানুষদের সামনে পেলে আমরা প্রণাম করি। কেন? ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের কাছে কি কিছু পাওয়ার আশা করি? আমি তো প্রৌরত্বে পৌঁছেও দুজন প্রাজ্ঞ মানুষকে শুধু পা ছুঁয়ে প্রণাম করার জন্যই ছুটে গিয়েছি। ওনাদের কি মনে হয়েছে জানিনা, আমার কিন্তু মনে হয়েছে , ধন্য হলাম। আমার প্রিয় বিষয় মহাভারতে এই পা ছুঁয়ে প্রণাম নিয়ে কি আছে? আক্ষরিক অর্থে পা ছুঁয়ে প্রণাম নিয়ে আমার স্কুলের পণ্ডিত মশাই সেই পঞ্চাশ বছর আগে খুব ভালো একটি গল্প বলেছিলেন। আজকাল যে সকল পণ্ডিত, গবেষকের কাছে মহাভারতের কথা শুনছি, তাঁদের কারও কাছে সে ব্যাখ্যা শুনিনি। পণ্ডিত মশাই নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। আজকাল কেন ব্রাহ্মণদের আর সেই তেজ নেই সেকথা বলতে গিয়ে, মহাভারতের কাহিনী বলেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির এর রাজসূয় যজ্ঞ। বিশাল বিপুল কর্ম কাণ্ড। হাজার হাজার অতিথি অভ্যাগত। মহারাজ যুধিষ্ঠির অন্য ভাই , আত্মীয় বন্ধু এমনকি দুর্যোধনকেও নানান দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। দেখাগেল সবথেকে প্রিয় বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কোন দায়িত্ব নেননি। তাঁকে কি দায়িত্ব নিতে চান, জানতে চাইলে তিনি জানান, তিনি অতিথি ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দেওয়ার কাজটি করতে চান। যুধিষ্ঠির ভালো করে জানেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজে যা করতে চাইছেন, তার বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে। আর আমরা যাকে বলছি, " মহাকাব্যিক অভিসন্ধি!" দূর দূর থেকে বামুন ঠাকুরেরা আসতে থাকলেন। রাজার বাড়ীতে আসা মানে কিছু দান দক্ষিণার আশায় আসা। এসেই দেখেন, এক বিখ্যাত রাজা পায়ে হাত দিয়ে পা ধুইয়ে দিচ্ছেন। আরে ব্যাস! বামুনগুলির অহংকার আরও বেড়ে গেল। এই " অহংকার" সকল পতনের কারণ। বেদ, উপনিষদ সহ সকল ধর্ম গ্রন্থের এটাই তো মূল শিক্ষা; আজও। সর্ব কালে। সর্ব দেশে। সেই হল ব্রাহ্মণ থেকে বামুনে পতনের শুরু। আর আমার পণ্ডিত মশাই এটাকেই বলেছেন, "বামুনগুলির সব তেজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পায়ে হাত দিয়ে ফেরৎ নিয়ে নিলেন!" এজন্যই হয়ত আমরা বয়স্ক ব্যক্তি পায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করলে পিছিয়ে যাই।
পায়ে হাত দিয়ে আমি ধন্য হয়েছি , সেকথা বলেছি। এবার মহাভারতে এক মহা পূণ্যবান, পবিত্র মানুষকে ছুঁয়ে আর একজন কেমন করে ধন্য হয়েছিলেন, সেই কাহিনী বলতে চাইছি।

মহাযুদ্ধের আগেই কর্ন নিশ্চিত ভাবে জেনেছিলেন, পঞ্চ পাণ্ডব তাঁর ভাই। মা কুন্তিকে কথা দিয়েছিলেন, অর্জুন ছাড়া বাকী ভাইদের, সুযোগ পেলেও তিনি মারবেন না। যুদ্ধে একদিন যুধিষ্ঠির কর্ণের সামনে পড়ে গেলেন। ভালো যোদ্ধা হলেও তিনি কর্ণের সাথে পারবেন কেন। কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে নাস্তানাবুদ করে, হেরে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। মাথা নিচু করে ফিরে যাওয়ার সময় কর্ণ, যুধিষ্ঠিরের পিঠে একটি থাপ্পর মেরে বলেন, যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। উনি কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করে দুর্যোধনের কাছে নিয়ে গেলে, সেই দিনই যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। এবার কথা হল, ছেড়ে তো দিলেন, কিন্তু পিঠে থাপ্পর মারার দরকারটা কি ছিল? বলা হয়, কর্ণ আসলে ঐ সুযোগে পরম পবিত্র মানুষটিকে একটু স্পর্শ করে নিজে ধন্য হলেন।
১৩.৮.২০২৪.

একটি ফল ত্যাগ

এই " ফল" আর " ত্যাগ" দুটি কথা নিয়ে হিন্দু দর্শনে বিশাল ব্যাপক আলোচনা আছে। " কর্মফল" নিয়েই গীতার শ্লোকের যতো লক্ষ কোটি বার " ভুল" ব্যাখ্যা হয়েছে, পৃথিবীর আর কোন বিষয় নিয়ে তার এক শতাংশ বারও আলোচনা হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই " গীতার শ্লোকের অশুভ ব্যাখ্যা" নিয়ে আলোকপাত করেছেন। আর " ত্যাগ" ই তো সনাতন ধর্মের সবথেকে বড় সমস্যা। আমি কিন্তু আজ ওসব গভীর বিষয় নিয়ে লিখতে যাচ্ছি না। অবশ্যই এই " একটি ফল ত্যাগ" ব্যাপারটিও হিন্দুদের একটি পুরাতন প্রথা। আজ সেই প্রথাটি নিয়ে কিছু কথা হোক।

আমাদের কাশ্মীর ভ্রমণ কাহিনী যাঁরা পড়েছেন, বা ঐ নিয়ে করা আমার ইউটিউব ভিডিও যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, আমরা একেবারে কাশ্মীরের বাগান থেকে কিনে দুই পেটি আপেল এনেছিলাম। সেই আপেলের প্রায় অর্ধেক, আমাদের কন্যা তার আপিসের সহকর্মী আর অধস্তন কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করেছে। আমার এখন আর আপিস নেই, তাই আপিসে আপেল নিয়ে যাওয়ার দায় নেই। চেম্বারের বন্ধুদের দুই একজনকে কয়েকটা দিয়েছি। কিছু দেওয়া হয়েছে ভাই আর ছেলের বাসায়। আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁদের দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাঁদের অনেকেই ঐ সময় বেড়াতে চলে যাওয়ায় তাদের আর দেওয়া হয়নি। আমার লেখা পড়ে দু ' চারজন মজা করে লিখেছেন, আমার বাড়ীতে আপেলের জন্য হামলা করতে পারেন। না, কেউ আসেননি। থাকতে থাকতে এলে দু একটা নিশ্চয়ই খেয়ে যেতেন। আমার এক প্রতিবেশী আছেন, আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করি। প্রাক্তন সেনা কর্মী, প্রায় আশি বছর বয়সেও একেবারে সোজা মেরুদণ্ড, এই মানুষটিকে আমরা কখনও কখনও মজা করে পিতামহ ভীষ্মও বলি। ওনারা বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুটি বরিষ্ঠ নাগরীক ঠিক আমার নিচের তলায় থাকেন। ওনাদের দুটি আপেল দিয়ে এলাম l সরাসরি বাগান থেকে আনা হয়েছে জেনে বেশ উচ্ছাস প্রকাশ করলেন। সেই সময় আমার মনে ছিল না যে, ঐ পিতামহ একবার কোথাও বলেছিলেন যে, উনি আপেল " ত্যাগ" করেছেন। এক সপ্তাহ পরে, কালীপূজার প্রাসাদ খাওয়ার সময় দেখলাম, উনি বললেন, আপেলের টুকরোটা তুলে নিতে। ঠিক তখনই মনে পড়ল ওনার এই " আপেল ত্যাগের" কথাটা। কি ব্যাপার? ব্যাপারটা আপনারাও অনেকেই জানেন, বা শুনেছেন। এখনই মনে পড়বে। উনি মায়ের নামে আপেল ত্যাগ করেছেন। আমার বাবা ত্যাগ করছিলেন , খেজুর। আর আমি সুপারি। যাঁরা এই ব্যপারটা জানেন, তাঁদের আর বলতে হবে না। যাঁরা এখনও জানেন না, তাঁদের জন্য বলি। গয়ায় পিণ্ডদান করলে , প্রয়াত প্রিয়জনের নামে একটি ফল ত্যাগ করে আসতে হয়। কেন? কি তার উপকার? কিছুই আমি জানি না। সবাই করে; তাই আমিও করেছি।

গয়ায় পিণ্ডদান, হিন্দু ধর্মের একটি বেশ প্রচলিত প্রথা। যুক্তিবাদী মানুষদের কাছে স্রেফ ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কার। কিন্তু এখনও যেহেতু আমি নিজেকে " হিন্দু " বলে পরিচয় দিয়ে থাকি; কোন কোন সরকারী কাগজে, " রিলিজিয়ন " হিন্দু লিখতে হয়েছে, তাই এই প্রথা অনুযায়ী আমিও একবার গয়া তীর্থ ঘুরে এসেছি। অবশ্যই " হিন্দু " কে আমরা ভুল করে " রিলিজিয়ন" বলি , এটা আসলে , ঋষি অরবিন্দ যেমন বলেছেন, " ইট ইজ এ ওয়ে অফ লাইফ!" এটা ঠিক পশ্চিমী অর্থে রিলিজিয়ন নয়। হিন্দু এক রকমের জীবন দর্শন। এর সাথে ফুল -বেলপাতা , আজান ইত্যাদির কোন সম্পর্ক নেই। অনেক যুক্তিবাদী বলেন, আমি সৎ পথে চলি, মানুষের উপকার করি, সমস্ত কিছুর একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে দেখি, এটাই আমার " ধর্ম" ; আমার ধর্ম মানবতা! আসলে এটাই যে হিন্দু ধর্মের বা হিন্দু দর্শন এর মূল কথা, এটাই আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মধ্য যুগের কিছু ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কার আমাদের মধ্যে এমন সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আমরা আমাদের মহান ঐতিহ্য ভুলে গেছি। সামাজিক বা আরও আধুনিক পরিভাষায় আর্থ সামাজিক অবক্ষয় আমাদের মধ্যে মূল্যবোধের এতই অভাব এনে ফেলেছে যে, মানবতা, পরোপকার, দয়া, দান, ত্যাগ এসব কথাকে আমরা একটু বাঁকা চোখেই দেখি। কথা হচ্ছিল, গয়ায় পিণ্ডদানের মত একটা একশ ভাগ ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কার এখনও চলছে কেন? বা , আমার মত যারা নিজেদের সামান্য শিক্ষিত বলে ভাবি, তারাও এই প্রথাটিতে এখনও কুলোর বাতাস দিচ্ছি কেন? একটি কথার উত্তর আমার জানা নেই। আমরা যাঁরা বেশ নিজেদের ইংরেজী শিক্ষিত, সাহেব সাহেব ভাবি, তারা কেন বৃদ্ধ বয়সে ছেলে মেয়ে আমাকে একটু দেখবে, এমন আশা মনেমনে পুষে রেখেছি? কিংবা, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী কেউ বৃদ্ধ বৃদ্ধা মা বাবাকে অযত্ন করলে আমাদের খারাপ লাগে কেন? যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেল বলে, বড় বড় তাত্বিক আলোচনার দরকার কি? সাহেবরা তো আমাদের এই সব পারিবারিক ঐতিহ্য সকলকেই " বাজে প্যানপ্যানানি" মনে করে! আগে একরার লিখেছি; তর্পণ নিয়ে। এই যে পুর্ব পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা প্রাচীন প্রথা, এটার অন্তর্নিহিত গভীরতা না দেখে , শুধুই কুসংস্কার বলে দাগিয়ে দেওয়া, এটাও এক রকম সংকীর্ণতা। বেশ, সামান্য তিল আর গঙ্গার জল, অং বং করে কিছু দুর্বোধ্য আওয়াজ করে, আবার গঙ্গায় ফেলে দিলাম; আমার মৃত বাবা মা এসে সেটা খেয়ে চলে গেল; কি হাস্যকর ব্যাপার; তাই না? তাহলে আপনার তিরিশ বছর আগে প্রয়াত বাবার নামে কষে গালাগাল দিলেই বা কি আসে যায়? তিনি তো আর এসে শুনে যাচ্ছেন না! একটা নির্বিকার, সাধু সন্ত গোচের লোককে খুঁজে বের করুন তো, যার প্রায়াত বাবা মায়ের নামে গালাগাল

করলে আপনাকে কষে একটা থাপ্পড় দিয়ে দেবে না। দুটিই কিন্তু একই রকম। আসলে আপনার পূর্ব পুরুষের প্রতি আপনার পূর্ণ শ্রদ্ধায় আপনি যেমন এই চড় বসিয়ে দিচ্ছেন, ঠিক সেই কারণেই বহু লোক বছরে একটা দিন নদীর ঘাটে ঘাটে ছুটে যায়, গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিয়ে আসে। মাঝে অনেক তত্ব আলোচনা করলাম। আসলে এই গয়ায় পৌঁছনোর জন্য। গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিয়ে, একটি ফল মা বা বাবার জন্য ত্যাগ করে আসতে হয়; এটাই নিয়ম। শুনেছি, কিন্তু নিজে গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিলেও, ওরকম কোন আচার অনুষ্ঠান করিনি বা কেউ করতেও বলেনি। তবুও, তবুও আমার বাবার মত অনেকেই এই " ফল ত্যাগ" করেছেন জানি বলেই, আমিও আমার মায়ের নামে সুপারি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। সুপারি কেন? এটা তো সেই অর্থে কোন ফলই না। এটা তো একটা ফলের বীজ মাত্র। তাই যদি বলতে হয় , তাহলে তো নারকেলও একটা বীজ। আসলে আজন্ম দেখে এসেছি, মা পান, সুপারি, দোক্তা এসব খায়। পানের সরঞ্জাম, সুপারি কাটার যাঁতি এসব ছিল বাড়ীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের একটি। বন্যায় বাড়িছাড়া হয়ে, হাসপতালের কোয়ার্টারে আশ্রয় নিতে হয়েছে, তখনও মায়ের পানের সরঞ্জাম সাথে নেওয়া হয়েছে। বড়দা, বড় দিদি আর দুই এক ভাই পান সুপারি নিয়মিত খেলেও আমি কোনোদিনই সেভাবে পান খেয়ে মজা পাইনি। বরঞ্চ বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর, মিঠে পান খেয়ে দেখেছি, খুব একটা সুবিধা করতে পারিনি। কিন্তু ঐ গয়া তীর্থ ঘুরে আসার পর থেকেই, বিয়ে বাড়ীতে পান দিলেও, পান খুলে তার থেকে সুপারি বেছে ফেলে, পান মুখে দিয়েছি। এত কিছু প্রথা মেনে করেছি, আর করে চলেছি। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা হলো, গয়াতীর্থ গোটা ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। মা মারা যাওয়ার পর সেজদার উদ্যোগে ভাইয়েরা সকলে মিলে গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিয়ে এলাম। সকালে ভারত সেবাশ্রম থেকে বেরোনোর সাথে সাথেই, মোটর বাইক নিয়ে অপেক্ষায় থাকা, স্মার্ট যুবকেরা ঘিরে ধরল। পান্ডার নাম জানতে চাইল। " গনেশ" শোনার সাথে সাথেই একজন যুবক মৃদু ধমক দিয়ে বলল, " গনেশ ঠাকুর বোলো!" অন্যরা সবাই সরে গেল। এই গনেশ পান্ডার নাতি বা পুতি, কিংবা পুতির পুঁতি ছেলেটি আমাদের মন্দিরে আসতে বলে, ভুট ভুট করে মোটর বাইক ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা অটো রিক্সা করে একটা নোংরা, পুরাতন বাজার মত জায়গায় এসে নামলাম। কীওখানেই বোধহয় ঐ পাণ্ডার নাতির পুঁতি ছেলেটি অপেক্ষা করছিল। সে একটি রং চটা দোকানে নিয়ে গিয়ে, সেখান থেকে পিণ্ডদানের সরঞ্জাম কিনে নিতে বলে চলে গেল। আমরা দল বেঁধে ঐ সব ভাঙা চোরা রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে একটি এবড়ো খেবড়ো সিমেন্ট বাঁধানো চত্বরে পৌঁছলাম। ঐ চত্বরে এদিক ওদিক ইতস্তত কিছু লোকজন বসে গেছেন, পিণ্ডদান করার জন্য। ঐ ছেলেটি বা অন্য কোন লোক আমাদের একটি খেরোর খাতা দেখিয়েছিল। সে একেবারেই প্রাচীন পদ্ধতিতে নাম ধাম লেখা একটি রেজিষ্টার বলা যায়। বোধহয় আমাদের বাবা কোন সাল নাগাদ গয়ায় এসেছিলেন, সে রকম একটা কিছু আন্দাজে বলতে পেরেছিল , বড়দা বা মেজদা। কিন্তু খুবই অল্প সময়েই লোকটি বাবার নাম সই করা পৃষ্ঠাটি বেরকরে আমাদের দেখিয়ে দিল। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা ঐ রকম একটি জায়গায় বাবার নাম সই করা খাতা দেখে আপ্লুত হলাম। আমার ছোড়দা বরাবরই একটু আবেগপ্রবণ। সে তো কেঁদেই ফেলল। অতি সত্বর একজন প্রৌঢ় মানুষ এসে আমাদের পিণ্ডদান প্রক্রিয়া শুরু করলেন। কলা পাতার উপর সামান্য কিছু জিনিস পত্র রেখে , ঐ অ ং বং চং কিছু মন্ত্র পড়ে আমাদেরও পড়িয়ে দিলেন। অনেক বছর পর, অধুনা প্রয়াতা সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন মহাশয়ার লেখা পড়ে, তর্পণ এর মন্ত্র সকল, আর তাদের অর্থ বুঝেছি। জানিনা সেই কুড়ি একুশ বছর আগে, গয়ার সেই পুরোহিত আমাদের কি মন্ত্র পড়িয়েছিলেন। কিন্তু একটি জিনিস পরিষ্কার মনে আছে; সেই " তীর্থগুরু" মানুষটি সেই সকাল সকাল বেশ পেট ভরে মদ খেয়ে এসেছিলেন। তার মুখ থেকে মদের গন্ধ দু তিন হাত দূর থেকেও পাওয়া যাচ্ছিল। ক্রিয়াকর্ম শেষ করিয়ে উনি যখন দক্ষিণা চাইছিলেন, তখন দক্ষিণার পরিমানটি যাতে ভালো হয় , সেজন্যই ঐ, " আমি তোমাদের তীর্থগুরু " এই কথাটি বলেছিলেন। বেশ বুঝতে পারছি; সেদিন গুরুর ঐ অসম্মানজনক মূর্তির জন্যই, গয়া তীর্থও আমার মনে কোন শ্রদ্ধা জাগাতে পারেনি। গয়ার তীর্থ মাহাত্ম বলে আর একটি কথা খুব প্রচলিত আছে। সেটা হল, " ফল্গু ধারা।" অন্তস্বলীলা ফল্গু, বহুবার শুনেছি। গয়ায় এই ফল্গু নদীতে জল দেখা যায় না; বালির তলা দিয়ে জল বয়ে চলে, বালি খুড়লে জল পাওয়া যায়। এটা একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। এর উপর তীর্থ মাহাত্ম আরোপ করার কোন যুক্তি নেই। আমার দুর্ভাগ্য, আমরা বোধহয় বর্ষা কালে গেছলাম। সে সময় ফল্গু নদীতে হাঁটু জল ছিল। আমরা বেশ কিছু ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেছিলাম, নদীর জলের কাছে। দু একজন হাঁটু জল পেরিয়ে অন্য পাড়ে চলে যাচ্ছে, দেখেছি। আমরা নদীর জল আনতে, না কি পিণ্ডের সামগ্রী জলে ফেলতে নদীতে নেমেছিলাম, মনে নেই। পুরোহিত আমাদের ঐ চাথালের পাশের একটি মন্দির এর ভেতরে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের মেঝেতে, জল, ফুল, বেলপাতা ঢাকা একটি জায়গায় হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে বললেন। হাতে কি ঠেকল কিছুই বুঝলাম না। ওটিই নাকি " বিষ্ণু পাদপদ্ম।" এরপর অটো নিয়ে আর দুই এক জায়গায় ঘুরে এলাম। কোন জায়গাই আমার কাছে বিশেষ মনে হয়নি। অটো করেই ভারত সেবাশ্রম এ ফিরে এলাম। দুপুরের খাওয়ার পর একটি বড় অটো নিয়ে আমরা সবাই মিলে চললাম, বুদ্ধগয়া দেখতে। শহর ছাড়িয়ে, ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে বড় রাস্তায় জোরে ছুটল সেই বড় অটো। রাস্তার পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও তেমন কিছু সুন্দর নয়। কিন্তু বুদ্ধ গয়া বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

বোধীবৃক্ষ, কয়েকটি মন্দির ইত্যাদি দেখে গয়ায় ফিরে এলাম। মহাগুরু নিপাতের পর গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান হিন্দুদের একটি মহৎ কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করা হল; এই পর্যন্ত।

কিন্তু ঐ ফল ত্যাগ ব্যাপারটি তাহলে কোথায় হল? পুরোটাই আমার নিজের কাছে। আমার কাছে এই মায়ের নামে সুপারি ত্যাগের তাৎপর্য অন্য রকম। মাসে কি বছরেরও একবার পান সুপারি খাই এমন নয়। কিন্তু দুই একবার যখনই পান খাওয়ার ব্যাপার আসে, আমার ঐ সুপারি ত্যাগের কথাটা ঠিক মনে পড়ে যায়। এটুকু বুঝেছি, সুপারি বেছে ফেলে দেওয়ার সময়, মায়ের কথা একটু মনে আসেই। সুপারির সাথে সাথেই মায়ের পান খাওয়া, সুপারি কেটে রাখা, এরকম কিছু স্মৃতি এসেই যায়। আমাদের বাবা মায়ের জন্মদিন আমার জানা নেই। বাবার মৃত্যু দিনটি তাঁর চলে যাওয়ার পর বছর কুড়ি মত, গ্রামের বাড়িতে একটু কীর্ত্তন, পূজা এসব দিয়ে পালন করা হয়েছে। আমি আমার এই চাকরীর দায়ে; আর তার থেকেও বেশি, বর্ষাকাল হওয়ায়, একবারও যেতে পারিনি। বড়দা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। তিনিই ছোট মত অনুষ্ঠানটি করতেন। বড়দা অসুস্থ হয়ে যাওয়া থেকে সেই অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়ে গেছে। মাকে কি সারা বছরে দু একটা দিনও মনে পড়ে? সম্ভবত না। শুধু ঐ সুপারি বেছে ফেলে দেওয়ার সময়, মায়ের কথা মনে পড়ে। আমার কাছে এই ‘ মাকে মনেপড়া ‘ ব্যপারটাই এই “ গয়ায় ফল ত্যাগের” একমাত্র ইতিবাচক দিক। হিন্দু ধর্মের কতো শত আচার, প্রথা তো আমি জানিই না। শুধু মায়ের কথা মনে রাখার জন্য এই একটা প্রথা, তা সে যতো অযৌক্তিক হোক না; আমৃত্যু মেনে চলতে চাই। ২২.১১.২৪.

বসুধারা

অসংখ্য বার দেখেছি। প্রায় সব বাড়ীতেই দেখেছি। জানি, ওটা হিন্দুদের একটা মঙ্গল চিহ্ন। বিয়ে বাড়িতে দেওয়ালে, তেল সিঁদুর দিয়ে আঁকা দেখেছি। ওটার ঠিক কি নাম? কোনোদিন জানার ইচ্ছাই হয়নি। ষাট বছর বয়সের পর, ছেলের বিয়ের সময় জানলাম। আমাদের পুরুত মশাই, রবি ঠাকুর মশাই , আমাদের ফ্লাট বাড়ীতে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করার সময় দেওয়ালে ঐরকম একটি চিহ্ন আঁকার চেষ্টা করছিলেন; তখন তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই জিনিসকে কি বলে? ঠাকুর মশাই বললেন, বসুধারা। এরপর এই চিহ্ন আঁকার তাৎপর্য কি, তাও উনি বললেন। মহাভারতের শিশুপালের কথা বললেন। মহাভারত আমার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। ভাদুড়ী মশাই এর লেখায় শিশুপালের কাহিনী পড়েছি, মন দিয়েই পড়েছি। কিন্তু সেখানে ঠাকুর মশাই এর বলা কথাগুলির কোন উল্লেখ পাইনি। আমি ভুল শুনে থাকতে পারি, তাই ও নিয়ে আর ভাবিনি। আমি ওনার কথায় কথায়, সেদিন যা বুঝেছিলাম সেটা অনেকটা এরকম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে হত্যা করার পর, শিশুপাল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর মত অপরাধীর তো কেউ তর্পণ করবে না। তাহলে তাঁর গতি কি হবে। তখন ভগবান তাঁকে বর দিলেন যে, যেখানেই কেউ শ্রাদ্ধ কর্ম করবে, তোমাকেও একটু জল দেবে।

বছর পাঁচেক পর, গতকাল আমার কলেজের এক ডাক্তার দাদা ঐ মঙ্গল চিহ্ন পাঠিয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, এটার নাম কি? এর তাৎপর্য কি? উনি এও লিখেছেন, পৃথিবী বিখ্যাত মহারাজ ওনাকে পরে জানাবেন বলেছিলেন, কিন্তু আর জানাননি। এখানে জানানো উচিত যে, আমার এই দাদা ব্যাপক পড়াশুনা করেছেন। আমাদের কলেজের গ্রুপে ওনাকে " Encyclopaedia" বলা হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে ওনার পড়াশুনা নেই। আমার মত অর্বাচীনকে এই জিনিষটার কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন, সেটাই গবেষণার বিষয়। উনি লিখেছেন, পুরুত ঠাকুরদের জিজ্ঞেশ করে দেখেছেন, কেউ উত্তর দিতে পারেননি। ওনার মনে হয়েছে, আমি বোধহয় এই বিচিত্র জিনিসটি নিয়ে পড়াশুনা করেছি। আমি আমার ঐ ঠাকুর মশাই এর কাছে শোনা বসুধারা নামটি জানালাম। dayalbm@gmail.com

এরপর হাতে ধরা মোবাইলেই খুঁজে পেলাম, বসুধারা লিখে সার্চ করতেই অনেক কিছু দেখাল। ওরা লিখেছে এর আরও একটা নাম আছে, ভূষণ্ডী। কিন্তু ওদের কাছে শিশুপাল নিয়ে কোন উল্লেখ নেই। ভূষণ্ডি রামায়ণের একটি চরিত্র। রাম ভক্ত, হনুমান ভক্ত ইত্যাদি। এছাড়াও এই চিহ্নটির বর্ণনা, এর তাৎপর্য ইত্যাদি অনেক কিছুই লিখেছে। আমরা যে চিহ্ন নিয়ে ভাবছি তাতে একজন মানুষের প্রতীক আঁকা হয়। মেটা সার্চ কিন্তু লিখেছে, স্বস্তিক চিহ্নের সাথে আরও কিছু আঁকা হয়। স্বস্তিকা চিহ্ন হিন্দুদের কাছে একটি মঙ্গল চিহ্ন। বাড়ীতে এই চিহ্ন আঁকার উদ্দেশ্য হল, অশুভ শক্তির অপসারণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ঐ বিশ্বকোষ দাদা এই তথ্যে মোটেই খুশী হননি। আমি এসব জানানোতে একটু বিরক্তই হয়েছেন।

আমি এটুকু বুঝেছি, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে এই বসুধারা আঁকার সাথে, সকলে কোন একজনের উদ্দ্যেশ্যে জল দেবেন, এটা ঠিকই। সেই অজানা দেবতা বা মানুষটি শিশুপাল নাও হতে পারেন। Meta AI Search যে স্বস্তিকা চিহ্ন নিয়ে বলেছে, সেটা এই বসুধারা নয়। আপনিও নিশ্চয়ই এই নিয়ে কিছু শুনেছেন কোথাও। বলুন, আপনার জানা তথ্যও আমাদের সমৃদ্ধ করবে।

৫.১০.২৪.

আমার সহৃদয় পাঠকদের একজন পরে জানিয়েছেন, চেদিরাজ শিশুপাল নয়, এই কাহিনী আসলে, চেদিরাজ উপরিচর বসুকে নিয়ে। তাই নামটি বসুধারা।

বাঁকুড়ার ক্ষ্যান

আজ থেকে ছেচল্লিশ বছর আগে বাঁকুড়ায় প্রথম গেছলাম। বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় বাংলা ভাষায় কিছু আঞ্চলিক টান আছে। এখন অবশ্য জেলা শহরের লোকেরা প্রায় বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে। আমরা বাঁকুড়ার টানে কথা বলা বেশিটা শিখেছিলাম ওখানকার রিক্সা চালকদের কাছে। পরে যখন হাসপাতালে রুগী দেখা শুরু করলাম তখন তো প্রায় সব সময়ই বাঁকরি শুনতাম। সে সময় বাঁকুড়ার বন্ধুদের সাথে ইচ্ছা করলে, বেশ ভালো ওদের মত কথা বলতে পারতাম। যতদিন ছাত্র ছিলাম, পূজার সময় তো কলেজ বন্ধ থাকত। পাশ করে জুনিয়ার ডাক্তার হয়ে পূজার সময় ছুটি পেতাম না। আমি আবার বেশ কিছুদিন অতিরিক্ত হাউস ষ্টাফ ছিলাম। তাই বোধহয় বার চারেক পূজার সময় " ক্ষ্যাণ" দেখেছি। তার অনেক আগেই, প্রথম বর্ষের শেষ দিকে একবার কাছের থেকে মনসা পূজা দেখেছিলাম। আমি কিছুদিন পুরনো হোষ্টেল এর পিছনের পাড়ায় একজন মাষ্টার মশাই এর বাড়ীতে তবলা শিখতে যেতাম। ওনার বাড়ীর উঠানে একটা " মনসা মেলা" ছিল। মনসা মেলা অনেকটা তুলসী মঞ্চের মত। উঠানের একপাশে একটা মনসা গাছ, তার তলায় কিছু মাটির ঘোড়া। ফুট আট দশ জায়গা ভালো করে সিমেন্ট বাঁধানো। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে মনসা পূজা হয়, বোধহয় সারা বাংলায়। মাষ্টার মশাই এর বাড়ীর মনসা পূজা বেশ ধুমধাম করে হয়। মাষ্টার মশাই এর বাবা বা মা সম্ভবত সাপের কামড় এর ওঝগিরি করতেন। সে সময় কোন এক পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ীর কোন সাপে কাটা রুগী ওনাদের কাছে সুস্থ হয়েছিলেন। সেই বাড়ীর কর্তা ঐ বাৎসরিক পূজার সময় এখানে বেশ টাকা পয়সা খরচ করতেন। আমিও একবারই ওদের বাড়ীতে মনসা পূজায় নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি জন পঞ্চাশ লোক এসেছেন। মনসা মেলা বেশ সাজানো হয়েছে। মাষ্টার মশাই এর ভাই পূজায় বসেছেন। বেশ সময় নিয়ে পূজা , বা পূজার আয়োজন হল। এরপর দশ বারোজন মহিলা মাথায় করে একটি করে মাটির পাত্রে জ্বলন্ত আগুনের শিখা নিয়ে, লাইন দিয়ে পুকুরের দিকে চললেন। সাথে আমরা সবাই। ঢাক ঢোল বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা চলল। মাঠের দিকে একটা পুকুর পাড়ে গিয়ে আবার পূজা হল অনেক সময়। ওখানে এক বা তার বেশি পায়রা বলি হল। পরে আর কোনোদিন ওদের বাড়ি পূজা দেখতে যাওয়া হয়নি। কিন্তু হোষ্টেল থেকে দেখেছি, সন্ধ্যায় ওরকম মাথায় আগুনের পাত্র নিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে।

প্রথম যে বার দুর্গা পূজার সময় হোষ্টেল এ থাকতে হল, সেবার আমার বছর দুই এর ছোট, মুক্তানন্দ একদিন জানাল, পূজার অষ্টমীর দিন হোষ্টেল এ মেস বন্ধ থাকবে। ও নিজেই, সম্ভবত মেস থেকে কেরোসিন স্টোভ, কড়াই ইত্যাদি সব জোগাড় করে রেখেছে। দুপুরে গোটা হোষ্টেল খালি। আমরা দুজন নিজেরাই লুচি বেগুন ভাজা রান্না করে খেলাম। পরে দেখেছি , অষ্টমী নবমী দুই দিন ই বাঁকুড়ার সাধারণ দোকান পাট, গাড়ী ঘোড়া সব বন্ধ থাকে। তখন শুনতাম, ক্ষ্যান পালনের জন্য মেসের ছেলে, বাসের চালক, হোটেলের কর্মচারি সব গ্রামে চলে যায়। ক্ষ্যান ব্যপারটা কি তখন খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম। পরের বছর হাউস স্টাফ হোস্টেলে চলে এসেছি। বোধহয় এই হোষ্টেল এর ছেলেরা প্রায় সবাই পূজায় থেকে যেতে বাধ্য হয় তাই মেস বন্ধ করতে পারত না। আমাদের হোষ্টেল এর প্রায় উল্টো দিকের মাঠে তখন দূর্গা পূজা হত। সেবার আমি ক্ষ্যাণের মধ্যে পড়ে গেলাম। হাসপতালের থেকে আমাদের হোষ্টেল এ আসতে হলে ঐ পূজার মাঠের ভেতর দিয়ে আসতে হত। মাঠের কাছে এসেই বাজি পোড়ানোর ধুম লেগে গেল। ঐ মাঠের মধ্যে যেন যুদ্ধ শুরু হল। জন দশ বারো লোক নাগাড়ে বাজি পুড়িয়েই চলল। প্রায় মিনিট পনের চলল ঐ ভাবে। ওখান দিয়ে হেঁটে পেরনোর কোন উপায় ছিল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মেসে ফিরে মেসের রাঁধুনির কাছেই জানলাম, ওটা ছিল, ক্ষ্যানের বাজি পোড়ানো। ক্ষ্যান মানে যে সন্ধিক্ষণ সে তো বুঝতেই পারছেন। পরেও বার দুই, ঐ বাজি পোড়ানোর ধুম শুনেই বুঝে নিতাম, সন্ধিপূজা হচ্ছে।

১৩.১০.২৪.

অমৃতম বালভাসিতম
আমাদের পূজনীয় মুনি ঋষিরা যে সকল কথা বলে গেছেন, আমি প্রায় প্রতিদিন তার সত্যতা নিশ্চিত হচ্ছি। এখন প্রায় কলকাতা শহরে থাকলেও, সবদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথেই পাখিদের মিষ্টি গান শুনতে পাই। আর গত বছর খানেক হল, প্রায় সবদিন সকাল এগারোটা সাড়ে এগারোটা থেকে, এক বালকের মধুর ডাক শুনতে পাই। না, ঐ এগারোটা নাগাদ সময়টা থেকেই বুঝবেন, এ বালক আমাকে , " দাদু ভাই " বলে ডাকে না। তবে কিছুদিন হল, আমাকে কোনের বারান্দায় দেখতে পেলে বলে, "দাদু, কি করছ?" এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে, কোনোদিন ওর ঐ " তাতা, তাতা, তাতা বাইবাই" শুনতে না পেলে , মন খুঁতখুঁত করে। এই বাচ্চাটি আমাদের ফ্ল্যাটের উল্টো দিকের আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে থাকে। ওদের কোনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, সামনের পাঁচ নম্বর লাইনের ট্রেনের যাত্রীদের দিকে হাত নেড়ে, প্রবল উৎসাহে বলে যেতে থাকে, " তাতা, তাতা" , কোন কোন যাত্রী ওকে দেখে হাত নাড়লে, দারুন খুশি হয়ে, পিছনে বসে থাকা দিদা বা ঠাকুমাকে জানায়, তাতা করেছে, তাতা করেছে। সম্ভবত নতুন বছরে আর একটা কথা নতুন শিখেছে। মাঝে মাঝে বলে," তাতা, তাতা, তাতা বাবাই, হ্যাপিনিয়ার!" এই হ্যাপিনিয়ার কথাটা পূজার আগে পর্যন্ত নিয়মিত বলেছে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমাদের আবাসনের কৃষ্ণ মন্দিরে এসেছিল এবার। ঠাকুমার সাথে এসেছিল। প্রসাদ খাওয়ার পর, একটা বাতাসা চেয়ে নিয়ে, একটু একটু করে কামড় দিচ্ছিল। এক সময় বাতাসাটি তুলে ধরে আমাকে দেখিয়ে বলল, " সি , সি, না ডি!" দেখলাম বাতাসাটি কামড়ে খেয়ে অর্ধচন্দ্রকার করেছে; সেটা দেখতে কিছুটা ডি অক্ষর এর মত হয়েছে। বুঝলাম, স্কুলে ভর্তি হয়ে , এ বি সি ডি শিখছে। এভাবেই একেবারে উপরি পাওনা হিসেবে, এক বালকের অমৃতভাষণ শুনছি। বাচ্চাদের আধো আধো বুলি শুনতে ভালোবাসেনা, এমন পাষণ্ড আমি কোনোদিন দেখিনি। এখন তো সরকারি হিসেবেই দাদু পদবাচ্য হয়ে গিয়েছি। সেই কলেজে পড়ার সময় ও দেখতাম, ট্রেনের কামরায় কোন শিশু থাকলে, সারাটা পথ তার আধো আধো কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে চলতাম। তারপর তো আমার নিজের ছেলে এল। ওর বহু বিচিত্র ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা আজও রোমন্থন করে খুশী হই। ছেলের সবথেকে ছোট বয়সের যে কথাটি এখনও চোখের সামনে উজ্জ্বল, সেটা ওর একটি ধমক। স্বনামধন্য শিশু বিশেষজ্ঞ, আমার বন্ধু ডা পাহাড়ীর চেম্বারে ছেলেকে নিয়ে গেছলাম। তখনও ভালো করে হাঁটতে শুরু করেনি। মায়ের কোলে তোয়ালে জড়িয়ে গিয়েছিল। ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় , হঠাৎ মায়ের কোল থেকে পিছন ফিরে, ডা পাহাড়ী কে " পপ" বলে একটা ধমক দিয়ে দিল। আমাদের তো লজ্জায় হতবুদ্ধি অবস্থা। ও যে নিজে নিজে কোন কথা বলতে পারে, তাই জানতাম না। ডা পাহাড়ী হেঁসে বললেন, " এই , আমাকে বকলে আমি কিন্তু খুব রেগে যাই!" আমার আর এক ডাক্তার বন্ধুকে বলত, " তারাপাদো কাকু !" আর আমার দুই ডাক্তার দাদা ছিলেন ওর , " লাগাদা জ্যেঠু " আর " ভোলাদা জ্যেঠু !" এই ভোলাদার কথা আগে লিখেছি। অকালে চলে যাওয়ার আগে জেনে গেছেন, তাঁর স্নেহের চিকু ডাক্তারী পড়বে, জয়েন্ট এ ভালো রাঙ্ক করেছে, কিন্তু কোন কলেজে ভর্তি হল, দেখে যান নি।
ডাক্তারকে ধমক দেওয়ার মত আর একটি ঘটনাও আমাদের চমকে দিয়েছিল। গোস্বামীবাবুর নিচের তলায় আমার চেম্বার ছিল। আমরা একদিন ছেলেকে নিয়ে ওনার বাসায়, তিন তলায় গেছলাম। ছেলে তখন নিজে নিজেই হাঁটতে পারে। ওকে নিয়ে সোফায় বসানোর পরই সোফায় উঠে, নিজের মনে খেলতে শুরু করেছে। সোফায় উঠে, সোফার পিছন দিকে, বোধহয় জানালার পর্দা সরানোতে ব্যস্ত ছিল। বৌদি ওকে বললেন, তোমার নাম কি? কোন রকমে একবার পিছন ফিরে, ছেলে বলল, " কিকু!" আমরা তখনও ওকে নাম বলতে শেখাই নি। কি করে নিজের নাম বলতে পারল , বুঝলাম না। বাচ্চারা মায়ের কথা শুনে শুনে কথা বলতে শেখে। চিকু যে আমার মুখে বারবার শোনা একটা কথা শিখে নিয়েছিল, যখন বুঝতে পারলাম, সেটা প্রথমে একটা বেশ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমি তখন মেদিনীপুর শহরে একটি ছোট্ট বেসরকারি চোখের হাসপতালের ভেতরেই, কোয়ার্টারে থাকি। হাসপতালের উঠান আর আমার কোয়ার্টার এর মধ্যে একটি ঝোলানো দরজা, যাকে সুইং ডোর বললে আমরা ভালো বুঝি। দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ করার কোন ছিটকিনি বা কিছু ছিল না। একটি কলিং বেল ছিল। কেউ আমাদের বারান্দায় আসতে চাইলে ঐ বেল বাজিয়ে, আমাদের জানিয়ে আসতেন। যে সংস্থা ঐ হাসপাতাল চালাতেন তাঁদের মূল আপিস কলকাতায়। মেদিনীপুরের কয়েকজন ভদ্রলোক স্থানীয় ভাবে ঐ হাসপাতাল দেখাশোনা করতেন। তাঁদের মধ্যে বিশ্বনাথবাবু নামের একজন বয়স্ক মানুষ বেশী আসতেন। উনি সাধারনত বেল বাজাতেন না। ঐ ঝোলানো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে, " ডাক্তার বাবু" বলে একবার ডাকতেন। আসলে হাসপতালের মূল দরজা প্রায় সব সময়ই তালা বন্ধ থাকত। দারোয়ান তালা না খুলে দিলে কেউ ভেতরে যেতে পারত না। বিশ্বনাথ বাবু ঢোকার সময়ই, দারোয়ানের কাছে জেনে নিতেই, আমি কোয়ার্টারে আছি কি না। উনি ডাকলেই আমি " আসুন" বলে এগিয়ে যেতাম। ঢুকেই প্রথম ঘরটাতে বসে আমরা কথা বলতাম। ছেলে এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়াত। একদিন মাকে গিয়ে বলল, " আতুন দাদু " এসেছে। ওর মা কে এসেছে দেখে একটু অবাক হল। পরে আমাকে বলল, ছেলে , বিশ্বনাথ বাবুকে আতুন দাদু বলল কেন? প্রথমে আমিও ব্যপারটা বুঝলাম না। কিন্ত পরে পরে সবদিনই দেখতাম, বিশ্বনাথ বাবুকে ও "

আতুন" দাদুই বলছে। ঐ যে উনি এলেই বাবা " আসুন" বলে এগিয়ে যায়, এর থেকেই ঐ দাদু হয়ে গেলেন , " আসুন" দাদু ! সেই কথা শুরুর বয়সে ওর বলা আরও কয়েকটি কথা আজও রোমন্থন করতে ভালো লাগে আমাদের। বিস্কুট হল " টিট" । চানাচুর হয়ে গেল, " চানুচ " বা " নানুচ ।" কিন্তু" ভাঙ্গা গ্লাস " এর রহস্য উদঘাটন করতে সময় লেগেছিল। তখনও প্লাস্টিকের বোতল এর এমন ব্যপক ব্যবহার শুরু হয়নি। আমরা খাওয়ার টেবিলে গ্লাসে জল নিয়েই বসতাম। বাড়ীতে তো স্টেইনলেস স্টিলের গ্লাস ব্যবহার করা হত। কিন্তু কারও বাড়ীতে গেলে , সাধারনত কাঁচের গ্লাসে জল দেওয়া হতো। ছেলে সাথে থাকলে আমরা খুব সাবধান হয়ে যেতাম। কয়েকবার এরকম কাঁচের গ্লাসে জল দেওয়া দেখেই, ওর মাকে সাবধান করেছি, " সাবধান ভাঙ্গবে কিন্তু!" তাইতেই ওর কাছে ঐ জিনিসটি হয়ে গেল, " ভাঙ্গা গ্লাস!" নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়ে কয়েকবারই বলেছে, " আমার পেট কৈ?" ওকে আলাদা করে প্লেট না দিলেই, " আমাকে পেট দাও", বলে বিব্রত করত। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়ে , এক নিমন্ত্রণকারী জ্যেঠিমাকে বেশ বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল। রায়গঞ্জে গিয়ে প্রথম যে বাড়ীতে ভাড়া থাকতাম, তার দোতলায় থাকতেন বাড়ী ওলার বন্ধু ভট্টাচার্যবাবু। ওনাদের সাথে মাত্রই কয়েকমাস ছিলাম। ওনাদের বাড়ি তৈরী হচ্ছিল পাশের পাড়ায়। সেই বাড়ীর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রন ছিল। ছেলে তো জেঠিমাকে পাকড়াও করে, নিজের জন্যও একটি " পেট" নিয়েছে। ভদ্রমহিলা ওর সাথে মজা করে বলেছেন, নিজের জন্য প্লেট নিয়েছ, নিজে নিজেই খাবে কিন্তু। ছেলেও স্মার্ট ভাবে বলল, " আমাকে মাংস দেবে ।" ভদ্রমহিলা তো এরকম একটা উত্তরের জন্য তৈরী ছিলেন না। গৃহ প্রবেশ এর অনুষ্ঠানে তো নারায়ণ পূজা করে, নিরামিষ খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয়, মাংস পাবেন কোথায়?!

এসব কথা আজ থেকে তিরিশ বছর আগের। তারপর ছেলে আর আমাদের উপর দিয়ে মারাত্মক ঝড় বয়ে গেছে। এখন ছেলে সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার। কিন্তু ওর শৈশবের কথাগুলি রোমন্থন করে আমরা, ভগবানের কৃপা লাভের অনুভূতি পাই। আমাদের মেয়েও এখন স্বাবলম্বী। ওর ছোটবেলার একটি কথা আপনাদের বলি। আমরা তখন ব্যারাকপুরের যে বাড়িতে ভাড়া থাকতাম, তার পিছনের দিকে একটি ছোট্ট বাগান মত ছিল। পিছনের জানালা থেকে পাঁচিলের দূরত্ব দশ বারো ফুট হবে। বাগানে দুই একটা বেড়াল দেখেছি। একদিন আমার মেয়ে, তখন বছর পাঁচেক বয়স হবে, আমাকে একটি বিচিত্র কথা বলল। পরে বুঝেছিলাম, টিভিতে দেখে দেখে ঐ হিন্দি শব্দটি শিখেছিল। মেয়ে বলল, " মা বিড়াল আর ভন্টু বিড়ালের ' পয় - আর ' হয়েছে!" আমি কি ভুল শুনলাম? ওকে বললাম, কি বললি? আবার বল তো? আবারও ঠিক একই ভাবে উচ্চারণ করল, " পয় - আর।" এবার বললাম, কি করে বুঝলি? ও বলল, " আমি দেখেছি, মা বিড়াল আর ভন্টু বিড়াল পাঁচিলের উপর মুখোমুখি বসে থাকে।"

এসব গেল শিশুদের মুখে আধো উচ্চারণের মাধুর্য। আমার দুই ভাইঝি তখন প্রাথমিক বিদ্যালয় এ পড়ে। একজন বোধহয় ফোরে, আর একজন থ্রিতে। আমি কলেজ থেকে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। ওরা দুজন আমার কাছে বসে গল্প শুনছে। গল্পের মধ্যেই একটা প্রসঙ্গ এল। তখনও বাবা মা বাড়ীতে গৃহ দেবতা প্রভু জগদ্বন্ধুর নিত্য পূজা করেন। ঠাকুরের সিংহাসনে তাঁদের গুরুদেব, ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের ছবি থাকে। আমরাই জ্ঞান হওয়ার থেকেই জানি, মহানামদাদু আমাদের বাড়ীর পূজনীয় সাধু। সম্ভবত দাদু গুরুর ওরকম শক্ত একটা নাম ওরা বলতে পারবে কি না, পরীক্ষা করতেই জিজ্ঞেশ করলাম, দাদু ঠাকুমার গুরুদেবের নাম কি বলতে পারবি? ছোটোজন বেশী স্মার্ট। সে বলল, ওরে বাবা, অত বড় নাম বলতে পারব না। হঠাৎ বড় জন বলল, আমি বলতে পারবো, " মহেঞ্জোদারো হরপ্পা!"

আমার নিজের, খুব কাছের থেকে দেখা কিছু কিছু, " বাল ভাসিত অমৃত কথার " স্মৃতি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিলাম। টিভি খুললেই শুধু হতাশার ছবি। ফোনে বন্ধুদের সাথে কথা বলতে গেলেও , সেই অন্ধকার ভবিষ্যত এর আলোচনা। পাড়ার বা ক্লাবের আড্ডায় তো জীবনে কোনোদিন যাওয়া হয়নি। সেখানে তো বুড়োদের শুধু কার কি অসুখ তার পর্যালোচনা। আর না হয় রাজনীতি। সকল হতাশার থেকে দূরে থাকতে, এরকম মধুর স্মৃতি রোমন্থন টনিকের কাজ করে। এজন্যই বোধহয় দাদু দিদারা নাতি নাতনী পেলে তাই নিয়েই মেতে যায়। আহা, ঈশ্বরের কি অহৈতুকি কৃপা; ঠিক যে বয়সে মানুষ নিজেকে ব্রাত্য মনে করে হতাশ হয়ে পড়তে পারে, সেই বয়সে একটি করে দেব শিশু হাতে ধরিয়ে দেন। শুধু মনের আরামই না, ওদের পিছনে ছুটতে ছুটতে, শরীর চর্চাও হয়ে যায়। ৭.১১.২০২৪.

বিশ্বাসঘাতক

নারায়ণ সান্যাল মশাই এর বিখ্যাত উপন্যাস " বিশ্বাসঘাতক" , আবারও একবার পড়লাম। প্রথমবার পড়েছি প্রায় দশ বছর আগে। সেটাও কিন্তু অনেক দেরি করে পড়া হয়েছিল। পড়া উচিত ছিল আরও অন্তত তিরিশ বছর আগে। বইটি তো লেখা হয়েছে ১৯৭০ এর দশকে। সে সময় আমি স্কুলের ছাত্র, পড়লেও কি বুঝতাম! সান্যাল মশাই এর প্রতিটি বই আলাদা আলাদা বিষয়ে লেখা। অনেক গবেষণা করে লিখতেন। এই বিশ্বাসঘাতক উপন্যাসটি লেখা হয়েছে মূলত এটম বোম তৈরীর ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে। যেহেতু এটম বোম তৈরীর আর ব্যবহারের ইতিহাস, এটম অর্থাৎ পরমাণু ব্যাপারটি একটু বুঝতেই হবে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে বেশ কিছু পৃষ্ঠা সান্যাল মশাই লিখেছেন। দ্বিতীয়বার পড়ার সময় মনে হল, সাধারণ পাঠক একটু বিরক্ত হতে পারেন। কিন্তু একেবারেই পবিত্র বিজ্ঞান সাধক নোবেল পুরস্কার প্রাপক বহু বিজ্ঞানীর বহু বছরের সাধনার ফলকে, কিছু হিংস্র রাজনীতিবিদ সাধারণ মানুষ মারার জন্য ব্যবহার করেছে। এই প্রনম্য বিজ্ঞান সাধক, পণ্ডিত মানুষগুলির প্রাণপণ চেষ্টা বিফলে গেল রাজনীতিবিদদের নোংরা মানসিকতার জন্য। আমেরিকায় হাজার খানেক বিজ্ঞান সাধককে নজরবন্দি করে রেখে, বোমা বানাতে বাধ্য করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে, পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষার পরও, এই বিপুল মারনাস্ত্র মানুষ মারার জন্য ব্যবহার না করতে , আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছিলেন , সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। সেই চিঠিও বাজে কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ওরা। এই বই না পড়লে জানতেই পারতাম না, ৎজিলার্ড নামের একজন বিজ্ঞানী কতো আজই বুঝেগেছলেন এটম বোমার ভয়াবহতা, মনুষ্য সভ্যতার জন্য কত বিরাট বিপদ এই মারনাস্ত্র। মানুষের শুভ বুদ্ধির জয় যে সবসময় হয়না, সেই সব ইতিহাসও আমাদের জানা উচিত। ক্ষমতাসীন মানুষেরা যে প্রায়ই প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ মানুষদের অবজ্ঞা করে চলেন, সে তো আমরা মহাভারতেই দেখেছি। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, বিদুর কাউকে এতটুকু পাত্তা না দিয়ে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করা হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মহামতি বিদুর চরম অপদস্ত হয়েছেন। আজকাল আমরা প্রায়ই বুদ্ধিজীবীদের কটাক্ষ করি। একটু চিন্তা করে দেখুন, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন এর তুলনায় আজকের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কত নগন্য। হিটলারের ভয়াবহ একনায়ক তন্ত্র আমরা সবাই জানি। সকলেই হিটলারের নিন্দা করতে গিয়ে ভুলে যাই স্টালিন, চার্চিল বা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে। এরাও কিন্তু মহান সব বিজ্ঞানিকে এটম বোম তৈরীর কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন। স্টালিন তো এক মহান বিজ্ঞানীকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। এই বিজ্ঞানী অনেক পরে নোবেল পুরষ্কারও পেয়েছেন।

সান্যাল মশাই এর এই উপন্যাসে আসল যে " বিশ্বাসঘাতক" তার নাম আমি বলছি না। গোটা উপন্যাসটি অনেকটা গোয়েন্দা গল্পের মত। সে ক্ষেত্রে আসল লোকটির নাম আগেই জেনে গেলে, গল্পের মজাটাই মাঠে মারা যাবে। কিন্তু শেষে, অপরাধী যে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন তারপর আর তাঁকে অপরাধী মনে হয় না। মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য তিনি কী ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে বছরের পর বছর চেষ্টা করে গেছেন। ওনার সাফল্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে আটকে রেখেছিল। বাস্তবে আমেরিকার চোখে উনি একজন বিশ্বাসঘাতক হলেও, উনি আমার কাছে একজন মহা নায়ক। আপনি হয়তো আমার আগেই পড়ে নিয়েছেন সান্যাল মশাই এর এই বিখ্যাত বইটি। না হলে এবার পড়ে নিন। ৮.১০.২৪.

dayalsnake@gmail.com

ভূতের গল্প
এখনও কিন্তু আমরা বেশ আগ্রহের সাথেই ভূতের গল্প শুনি। সে যে যত শিক্ষিত মানুষই হোন না কেন, এই ভূতের গল্প ব্যাপারটা কেউ এড়িয়ে চলতে পারেন না। এর মধ্যে যারা যুক্তিবাদী তাঁরা গল্পটা শোনেন, যুক্তির ফাঁক খোঁজার জন্য। আমি আমার নিজের চোখে দেখা , বাঁকুড়ার একটি ঘটনা লিখেছিলাম। রিক্স করে বাজারের দিক থেকে হোস্টেলে ফেরার সময়, ঠিক সূর্য ডোবার পরপর এটা দেখেছিলাম। লোকপুরের ফরেস্ট আপিসের মোড়ে যে পুরোনো অশ্বত্থ গাছ আছে , ওটার একটা মোটা ডাল রাস্তার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ছিল, রাস্তা থেকে প্রায় পঁচিশ তিরিশ ফুট উপরে। ঐ ডাল থেকে টিপটিপ করে আগুনের ফুলকি পড়ছিল। ওটা কি বলে রিকসওলার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সে বেশ রহস্য জনক ভাবে, " ওদিকে দেখতে নাই" বলে , দ্রুত রিকস চলিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যায়। এ নিয়ে অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার হল না।
আজ ঐ বাঁকুড়ার আর একটি ঘটনার কথা বলি। লোকপুরেরই বাড়ী আমার প্রিয় গানের শিক্ষক , ওমপ্রকাশ ভকতবাবুর। হোস্টেলে থাকার সময় মাঝে মাঝেই ওনার বাড়ী চলে যেতাম, গান শুনতে। সাতাশি সালে হোষ্টেল ছেড়ে আসার পর মাঝে প্রায় পনের বছর বাঁকুড়া যাওয়া হয়নি। তারপর যখন আবার গেলাম, দেখি উনি একেবারে অন্য একজন মানুষ। তান্ত্রিক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। গান গাওয়ার থেকেও জপ তপ নিয়েই বেশি থাকেন। তবুও আমি গেলে গান না শুনিয়ে ছাড় পেতেন না। কিন্তু গানের থেকেও আমার সাথে গল্পই বেশী হয়। আমার ঐ গাছের থেকে আগুন পড়ার গল্প ওনাকেও বলেছি। এটা শুনেই সম্ভবত ওনার একটি অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেছিলেন। দীক্ষা নেওয়ার পর থেকেই উনি ভোরে আর সন্ধ্যায়, কয়েক ঘন্টা করে , নদীর পাড়ে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকেন। সে সময় মাঝে মাঝে, হাসপতালের সোজা পশ্চিম দিকে, মাইল খানেক দূরের দারকেশ্বর নদীর পাড়ে গিয়ে বসে থাকতেন। একদিন বিকেলে বেরিয়ে ঐ নদীর পাড়ে গিয়ে বসেছিলেন। সূর্য ডোবার পরপর খেয়াল করলেন, নদীর জলে একটা ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে। ঐ জায়গাটা তখন বেশ নির্জন ছিল। আজকাল তো প্রায় নদীর পার পর্যন্ত শহর চলে গেছে। ঐ সন্ধ্যার মুখে ওখানে নদীর জলে কারও নামার কথাও না। ওখানে বর্ষার কদিন ছাড়া তেমন জল থাকে না। অনেক সময় থেকে শব্দটা আসছে দেখে উনি একটু নেমে দেখতে গেলেন। ওখানে বেশ কিছু বড় বড় পাথরের আড়ালে থাকে জলের ধরাটা। দেখগেল একটি মৃতদেহের একটি পা, জলে বারবার যেন লাথি মারছে। সেরকম লোক হলে, বাবাগো বলে দৌড় দিতেন। ওমবাবুর মনে হল ব্যাপারটা কি দেখা দরকার। একটু ঘুরে, পাথরের আড়াল ছাড়িয়ে গিয়ে দেখেন, একটি কুকুর, মৃতদেহটির উপরের অংশ কামড় দিয়ে টানার চেষ্টা করছে। দেহের একটি পা জলে ডুবে ছিল, কুকুরের টানাটানিতে ঐ পা, জলে ছপ ছপ শব্দ করছে। সম্ভবত মর্গের কোন দেহ ডোমেরা ওখানে বালিতে পুঁতে রেখে এসেছিল। বর্ষার জলে দেহটা বেরিয়ে এসেছিল। dayalbm@gmail.com
সাহস করে সামনে গিয়ে কুকুরটাকে না দেখেই যদি উনি দৌড় দিয়ে ফিরে আসতেন, তাহলে ব্যাপারটি ওনার কাছে ভৌতিকই থেকে যেত। এরকম সব আপাত ভৌতিক কাহিনী আসলে কোন অলৌকিক ঘটনা নয়। পিছনের কারনটা খোঁজার চেষ্টা না করলেই, সাধারণ একটি ঘটনাকে ভৌতিক বলে চলিয়ে দেওয়া যায়। ৬.১০.২৪.

মিরাকল, আজও হয়?

রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় মহারাজ ঈশাত্মানন্দজীর একটি পাঠ শুনছিলাম, ইউটিউবে। খুব সুন্দর করে কথা বলেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই শুনছি ওনার পাঠ ও বক্তৃতা। আজ ওনার বহু বছর আগের একটি অভিজ্ঞতার কথা বললেন। আসামে বন্যা ত্রাণ করতে গিয়ে ওনারা জন তিনেক বেশ সমস্যায় পড়েন। সরকারী অতিথিশালায় ওনাদের থাকার ব্যবস্থা হলেও খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সামনের এক চায়ের দোকান থেকে চা পাঁউরুটি খেয়ে থাকছিলেন। চায়ের দোকানদারকে অনুরোধ করে কাজ হয়নি; সে ভাত ফুটিয়ে দিতে রাজী হয়নি। একদিন পর একজন লোক এসে বলল, সামনের বাড়ীর থেকে আপনাদের ডাকছে। অতি সাধারণ গাছপালায় ঘেরা একটি বাড়ী। সে বাড়ির বউটি একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলতে পারে। সে তার শ্বশুর শাশুড়ির সামনে মহারাজদের বলল, অপনাদের তো খাওয়ার খুব সমস্যা হচ্ছে, আমার শ্বাশুড়ি চাইছেন , আপনারা আমাদের বাড়ীতে এসে খেয়ে যান। ঐ বিদেশ বিভুঁইয়ে এরকম করে সাহায্য পেয়ে মহারাজ আপ্লুত। উনি এটাকে বলেছেন, “ মিরাকল আজও হয়!”

ডাক্তার যখন মরণাপন্ন কোন রুগী বাঁচিয়ে দেন, ভক্তজন বলেন, ভগবানের কৃপায় বেঁচে ফিরেছি। কেউ কেউ বলেন, ডাক্তার “ মিরাকল” করল। আমরা ডাক্তারি পড়তে গিয়ে থেকেই অনেক গল্প শুনেছি, যেখানে শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে, ডা বিধান রায় মিরাকল করেছিলেন। তাঁকে দেখিনি। শুধুই গল্প শুনেছি। আমার এক ডাক্তার ভাই এর গল্প বলি আজ। ঘটনা অবশ্য নয় বছর আগের। হুগলী জেলার এক গ্রামীণ হাসপতালে বছর ৪০-৪২ এর এক মহিলা ভর্তি হয়েছিলেন, পেটের যন্ত্রণা নিয়ে। সেটা ছিল জুলাই মাসের সাত তারিখ। ঐদিন বিকেল থেকে নয় তারিখ সকাল পর্যন্ত তিনজন ডাক্তার বাবু ডিউটি করেছেন। সকলেই পেটের যন্ত্রণার চিকিৎসা করেছেন। তিন নম্বর ডাক্তারবাবু রবিবার সকালে ডিউটি শেষ করে চলে যাওয়ার সময় ঐ রোগিনী তাঁকে ডেকে বলেন যে, শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। ঐ ডাক্তারবাবু রোগিণীর ভর্তির টিকিট ভালো করে দেখেন, সব রকম চিকিৎসাই করা হয়েছে। উনি রোগিনীকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে কাগজ তৈরী করে চলে যান। তারপর আসেন ডা শেখ রাজীব। রোগিনী বেশ খারাপ, বর্ধমানে রেফার করা হয়েছে, কিন্তু যাচ্ছে না। এসব খবর দিয়ে ডিউটি সিস্টার, ডা রাজীবকে বলেন যে ওনাকে বুঝিয়ে বর্ধমানে পাঠান। এসব শুনে ডা রাজীব রোগীনীকে বোঝানোর জন্য তাঁর কাছে যান। তারপরের ঘটনাকে কেউ যদি মিরাকল বলেন, বলতেই পারেন। ডা রাজীব ঐ রোগিণীর সাথে কথা বলতে বলতে একটি অত্যন্ত জরুরী রোগ লক্ষণ দেখতে পান। রুগীর দুই চোখের পাতা পড়ে আছে। ডাক্তারী ভাষায় যাকে আমরা বলি শিবনেত্র বা টোসিস। এটি কালাচ নামের একটি সাপের কামড় এর নিশ্চিত রোগ লক্ষণ। এই সাপ সাধারণত রাত্রে খোলা বিছানায় উঠে এসে কামড়ায়। একেবারে মশার কামড় এর মত সুক্ষ্ম কামড়। রোগী বুঝতেই পারে না। অনেক পরে পেটের যন্ত্রণার জন্য বা গলা ব্যথার জন্য হাসপতালে চিকিৎসা নিতে আসে। ডাক্তারবাবু সাথে সাথেই শিবনেত্র পেতে পারেন। কিংবা ভর্তি করা হলে কয়েক ঘন্টা পরও পেতে পারেন। এটা পেয়েগেলেই নিশ্চিত হয়ে যান যে এটি একটি সাপের কামড় এর রুগী। ঐ অবস্থায় সাপের কামড় এর চিকিৎসা শুরু হলে রুগী বেঁচে যান। দেরী করলে বিপদ। ডা রাজীব ঐ রোগিনিকে সাথে সাথেই সাপের কামড় এর ঔষধ আন্টিভেনোম চালিয়ে দেন। রোগিনী দুপুরের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যান। বর্ধমানে আর পাঠাতেই হয়নি।

এই রোগিণীর কাছে এটা একটা মিরাকল। সাপ কামড় নিয়ে কোন কথা নেই, কামড়ের দাগ নেই , অথচ ডাক্তারবাবু ঠিক বুঝে গেছেন! রোগিনী বা তার বাড়ির লোক এটাকে ৩০-৪০ বছর পর যদি “ মিরাকল” হয়েছিল বলেন, বলতেই পারেন। আসলে এই দুটি ক্ষেত্রেই কোন মিরাকল হয়নি। যুক্তিবাদীরা তাই “ মিরাকল” শুনলেই চোটে যান। মহারাজের ক্ষেত্রে ঐ সাধারণ বাড়ীর মহানুভব মানুষগুলির মহানুভবতার জন্যই ওনারা ঐ বিদেশে কদিন খেতে পেয়েছিলেন। খুব সম্ভবত চায়ের দোকান থেকেই ওনারা জানতে পেরেছিলেন যে, বন্যা ত্রাণ করতে এসে মহারাজ চা পাঁউরুটি খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। মহারাজ গৃহত্যাগী সন্যাসী, ভক্ত মানুষ। তাই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে সমস্তটাই ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আর আমার ডাক্তার ভাই যে কাজটি করতে পেরেছেন সেটা শুধুই তার ক্লিনিক্যাল আই ভালো হওয়ার জন্য। এই যে সামান্য কিছু রোগ লক্ষণ দেখতে পারেন, এখানেই একজন ভালো ডাক্তারের সাথে সাধারণ ডাক্তারের তফাৎ করে দেয়। এই ক্ষমতাকেই আমরা ক্লিনিক্যাল আই বলি। এর জন্য যেমন ট্রেনিং এর দরকার হয়, তেমনি ভালো ছাত্রের শেখার আগ্রহ দরকার হয়। আপাত দৃষ্টিতে মিরাকল মনে হলেও ব্যাপারটা কিন্তু একশ শতাংশ বৈজ্ঞানিক। এর মধ্যে কোন মিরাকল নেই। আমার এই রাজীব ভাইয়ের এই অভিজ্ঞতা আমি আমার ক্লাশে হাজার হাজার নতুন ডাক্তারকে শিখিয়েছি। সবাই যে ওর মত মিরাকল করছে এমন নয়। কিন্তু কয়েক ডজন ডাক্তার এটা করেও দেখিয়েছে। আমার এই একটা বিষয় নিয়ে প্রায় সতের বছর পড়ে থাকার এটাই চালিকা শক্তি।২৬.৮.২৪.

মুড়ি

পাঁচমারি বেড়াতে গিয়ে মুড়মুড়া কিনতে হিমসিম খেয়েছিলাম, লিখেছি একদিন। আমাদের আদি অকৃত্রিম মুড়ি যে হিন্দীতে মুড়মুড়া তাতো জানতাম না। ওদিকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মুড়ি শেষ। স্ত্রীর পেট খারাপ হওয়ায় মুড়িই সবথেকে উপযোগী পথ্য। কিন্তু ও বস্তু পাই কোথায়, কি বললে বুঝবে দোকানদার? এসব সমস্যায় পড়ে হোটেলের মালিক জৈনবাবুর কাছে ভাষা শিক্ষার পাঠ নিতে হল।

কয়েকবছর আগেও একটা মলমের বিজ্ঞাপন খুব দেখা যেত, " বঙ্গ জীবনের অঙ্গ" এভাবে। আমি ওটা প্রায় সারা বছর ব্যবহার করি, ঠোট ফাটে বলে। কিন্তু গ্রাম বাংলার জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে মুড়ি, তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি এখন, গত বছর কুড়ি হল শহরে থাকি; মুড়ি কিন্তু নিয়মিত খাই। ট্রেনে বা ষ্টেষনে ঝালমুড়ি বিক্রী বহু মানুষের পেশা। কদিন থেকে দেখছি, ট্রেনে চিড়ে ভাজা, বাদাম চানাচুর এসবের মত, বেশ সুন্দর প্লাস্টিক প্যাকেটে ঝালমুড়ি বিক্রী হচ্ছে। একজন ফেরিওয়ালা শুনলাম, ' নিরামিষ ঝালমুড়ি ' বলে ডাকছে। এই নিরামিষ ব্যাপারটার উৎস বোধহয় একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়। বছর দশেক আগে একবার লোকাল ট্রেনের ভেতরে একদল তিলকধারীকে দেখি ঐরকম প্রায় ব্রান্ডেড ঝালমুড়ি খাচ্ছে। ওনের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রভু, এই আম বাঙালির খাদ্যটি পছন্দ করতেন জানলাম।

মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মানোর সুবাদে, মুড়ির উপর আমার জন্মগত অধিকার বলতেই পারি। খুব ছোটবেলায় ঘুমথেকে উঠেই কোনরকমে ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মেজেই, এক বাটি মুড়ি খেতাম। অনেক সময় চাটাই পেতে পড়তে বসে, পড়তে পড়তেই মুড়ি খেতাম। যতোদূর মনে পড়ছে, আমি আর ভাই ছোট থেকেই একটু পেটরোগা ছিলাম। মুড়িও খুব সামান্যই খেতাম। আর ঐ সব হদ্দ গ্রামে মুড়ির সাথে কাঁচা লংকা বা পেঁয়াজই সাধারণত জুটত। শীতকালে কখনও কখনও কাঁচা মুলো দিয়েও মুড়ি খেয়েছি। আর শশা মুড়ি ছিল একেবারে মণিকাঞ্চন যোগের মত।

ঐ ছোট বেলায় একবার আমরা দুজন গৌরদার বাড়ী গেছলাম। গৌরদা মেজদার বন্ধু। আমাদের বাড়ীর থেকে মাইল দেড়েক দূরে বাড়ী। শুকনোর দিনে একটা মাঠ পেরিয়েই যেতাম। তখন ওসব গ্রামে ফোনের প্রশ্নই নেই। সামান্য কিছু খবর দিতেও ঐ দেড় মাইল হেঁটে যেতাম। দুটি কুটুম ছ্যানাকে ওনারা আদর করে মুড়ি খেতে দিলেন। ঘি দিয়ে মুড়ি মেখে তাতে চিনি ছড়িয়ে দেওয়া। আমি পুরোটা খেলেও ভাই কিছুটা মুড়ি ফেলে উঠে পড়ল। তাই দেখে নিতাইদা রেগেই গেল। অনেক বছর পর এই নিতাইদা কলকাতার মেসে আমার সাথে ছিল কয়েক মাস। তখন আমরা বিকেলের টিফিনে একটা পঁচিশ পয়সার কোয়ার্টার পাঁউরুটি খেতাম।

এই মুড়ি গ্রাম বাংলার দৈনন্দিন জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। খুব ছোটবেলা থেকেই দেখতাম এই মুড়ি নিয়ে বাড়ীর লোক কাজের লোক সকলে কেমন যেন ব্যতিব্যস্ত থাকে। সাধারন ধান চাষের সময় থেকেই মুড়ির জন্য বিশেষ কোন প্রজাতির ধান চাষ হচ্ছে। শুধু চাষ হলেই হবে না, ধান সেদ্ধ করার সময় মুড়ির ধান আলাদাভাবে যত্ন নিয়ে সেদ্ধ করা। এই ধান সেদ্ধ ব্যাপারটাই যারা দেখেনি,তাদের বোঝানো মুশকিল। ধান চাষের থেকেও এই ধান সেদ্ধ ব্যাপারটা অনেক বেশী যত্ন নিয়ে করতে হয়। ভাতের চাল তবু একটু শর্টকাট করে সেদ্ধ ধান থেকে পাওয়া যায়। মুড়ির চালে কোণ ফাঁকি চলবে না।

আগের সন্ধ্যায় মুড়ির চাল ধুয়ে অল্প ভেজা অবস্থায় নুন মাখিয়ে রাখা হত, পরদিন ভোরে ভাজার জন্য। এই নুনের পরিমানের ওপর মুড়ি কতোটা ফুলবে তা নির্ভর করে। এর জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাগে। আবার এই নুন মাখিয়ে ভাজা হয় বলেই মুড়িকে নোনতা খাওয়ারের শ্রেনীতে রাখা হয়েছে। হাই ব্লাড প্রেশারের রুগীদের এজন্যে মুড়ি খেতে বারন করা হয়। এই নুনের বদলে বা নুনের সাথে নানান রকম ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার হচ্ছে। এতে মুড়ি দেখতে সুন্দর হলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। চাষের সার ইউরিয়া এরকমের একটি ক্যামিক্যাল। তিরিশ চল্লিশ বছর আগেই জানতাম এই মুড়ি ফোলাতে ইউরিয়ার ব্যবহার। ঐ সময় কোন একটা স্কুলের বা কলেজের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে মুড়ির ইউরিয়া পরীক্ষা দেখেছিলাম।

শুধু লোকের বাড়ীতে মুড়ি ভেজে বেড়ানো কিছু মহিলার পেশা ছিল। সুশীলা নামের এক মহিলা বোধহয় একটানা বছর কুড়ি পঁচিশ আমাদের বাড়ীর মুড়ি ভাজত। ওর কাজই ছিল ভোর রাত্রের থেকে সন্ধ্যা আটটা নটা পর্যন্ত লোকের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে মুড়ি ভাজা। মুড়ির গুনমান ঠিকঠাক না হলে খুব মুখ করত। ঐ চাল ভিজিয়ে নুন মাখানোর প্রক্রিয়ার কোথাও ফাঁকি আছে এটাই বোঝাতে চাইত। মা অসুস্থ থাকলে বা কোন কারনে না পারলে সুশীলাদিদি নিজে আগের সন্ধ্যায় এসে ও কাজটিও করে যেত। বৌদি বা দিদির ওপর ওর ভরসা ছিল না।

মুড়ি ভাজার চালের মতই আরও কয়েকটা বিশেষ সরঞ্জাম জরুরি। মুড়ি ভাজার কাঠের উনান আলাদাভাবে বারান্দার একদিকের কোনে থাকত। রান্নাঘরের উনান বা ধান সেদ্ধ করার উনানে কখনও মুড়ি ভাজতে দেখিনি। মাটির বিরাট বড় ছড়ানো পাত্রে প্রথমে ঐ নুন মাখান ভেজা চালকে এক রকম শুকনো করা হত। ঐ বড় পাত্রের নাম খাবড়ী। বিশেষ একরকম চওড়া কাঠের হাতা দিয়ে ঐ খাবড়ীর চালকে ক্রমাগত নেড়ে যেতে হবে। সম্ভবত তিন সাড়ে তিন কেজি চাল একবারে ঐ খাবড়ীতে রোষ্ট করা হত। কখন কি দেখে ঐ প্রক্রিয়া ঠিক মত সম্পুর্ণ হয়েছে সেটা ঐ কাজের দক্ষ মহিলারাই জানতেন। এরপর ঐ খাবড়ী সহ রোষ্টেড চাল আগুন থেকে নামিয়ে রেখে উনানে চড়ানো হত বালী খোলা। সেটা হল একটু ছোট একটা মাটির পাত্র। তাতে কেজি দুই বালী পুড়ে কালো হয়ে থাকত। অল্প অল্প চাল ঐ প্রচন্ড গরম বালীর ওপর ফেলে নারকেল কাঠির গোছা দিয়ে নাড়া দিলেই চালগুলি হঠাৎই মুড়ির রূপ নিত। ঐ নারকেল কাঠির গোছাকে সুন্দর কায়দায় ব্যবহার করে ভাজা মুড়ি খোলা থেকে তুলে আনা হত। উনানে কাঠের আগুন হৈ হৈ করে জ্বলতেই থাকত। সব মুড়ি উনানের পাশেই জমা থাকত। শেষে বড় বাঁশের তৈরী চালুনিতে ভাজা মুড়ি পরিস্কার করে টিনে বা বস্তায় ভরা হত।

এই মুড়ির টিন ব্যাপারটার গুরুত্ব সবাই বুঝবে না। ঐ সব দিনে বিস্কুট বললে বৃটানিয়া থিন আরারুট বিস্কুটই বোঝাত। এখনকার মানুষের মনের মত সবকিছুই এমন ছোট আর চকচকে মোড়কের আবরনে স্মার্ট হয়ে যায়নি। গ্রামের মুদি দোকানেও বড় পাঁচ কেজির টিনে বৃটানিয়া বিস্কুট আসত। ঐ টিন খালি হলেই লোকে কিনে নিয়ে যেত, মুলত মুড়ি রাখার জন্য। আর ঐ টিনের অর্ধেক সাইজের হাফ টিন ছিল যাকে বলে স্মার্ট। বড় টিনের একটিন মাপের মুড়িই সাধারণত একবারে ভাজা হত। তার জন্য ঐ কিলো দেড়েক চাল।

উনান জ্বালা থেকে টিন ভর্তি পর্যন্ত সুশীলাদিদির ঘন্টা দুই লাগত। পরে যখন বাড়ীতে না ভেজে কারুর কাছে কেনা হত; তখনও ঐ টিনের মাপে কেনা হত। বছর ত্রিশ আগে মেদিনীপুরে থাকার সময় কেজি দরে মুড়ি কিনেছি। এখন সব জায়গায়ই দেখি পাতলা প্লাস্টিক প্যাকেটে মুড়ি বিক্রী হচ্ছে।

আমরা গ্রামে থাকতে ঐ একটিন মুড়ি আমাদের জনা আটেকের পরিবারে দিন চার পাঁচ চলত। দু চারজন মজুর লাগলে, বা বাড়ীতে কীর্তন জাতীয় কোন অনুষ্ঠান হলে বিশেষ ব্যবস্থা করে কয়েক টিন বা কয়েক বস্তা মুড়ি আগেই সংগ্রহ করা হত।একটিন মুড়ি আটজনের চার পাঁচদিন চলত, এ তথ্যটা কিন্তু অর্ধসত্য। সব বাড়ীতেই ওরকম মাত্রা মেপে মুড়ির ব্যবহার হত ভাবলে ভুল হবে। বছর পয়তাল্লিশ আগে, আমাদের গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য চার পাঁচ মাইল দূরের কোন স্কুলে যেতে হত। ছাত্র ছাত্রী, এক দুজন শিক্ষক ঐ স্কুলের কাছে কোন সম্পন্ন মানুষের বাড়ী বা প্রাইমারি স্কুলে ক্যাম্প করে থাকত ঐ কদিন।

আমাদের স্কুলের এক দিদি ওরকম পরীক্ষা দিতে গেছলেন। পরদিনই তাঁর ভাই একটিন মুড়ি সাইকেলে নিয়ে পৌছতে গেল। ওনার বড়দা একথাই সকলকে বলছিলেন যে, বোনের জন্য প্রতিদিন একটিন মুড়ি পাঠাতে হবে। এই ব্যাপারটা আমাদের বাড়ীতে বহুদিন আলোচনা হয়েছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমানের লোকেদের বেশী মুড়ি খাওয়া নিয়ে বদনাম আছে ; তবুও ঐ দিনে এক টিন মুড়ি একটু বাড়াবাড়ি। আমার মুড়ি নিয়ে যেটুকু মনে পড়ছে তাও বেশ ছোট বেলার খবর। সকালের স্কুলে যাওয়ার সময় সকলেই একটা বার্লির কৌটোয় মুড়ি নিয়ে যেতাম, টিফিনে খাওয়ার জন্য। সঙ্গে ছোট পেঁয়াজ বা কাঁচা লংকা। এক টুকরো ভেলিগুড় কোনদিন পেলে সেটা একটা বিশেষ দিন।

গুড়ের কথায় মনে পড়ল, বারো ক্লাশে পড়বার সময় যখন কলকাতায় থাকতাম, মাঝে মাঝেই হৃদয়পুরে মামার বাড়ী চলেযেতাম। মামি একবাটি মুড়ি আর এক টুকরো পাটালিগুড় দিত। গ্রামের বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান হলে মুড়ির সাথে খাওয়ার জন্য ছোলা সেদ্ধ আর শুকনো লংকা ভাজা একেবারে নিয়ম ছিল। এর সাথে বোঁদে হলে তো আর কথাই নেই। পংক্তি ভোজনে বসে ছোলা সেদ্ধ মুড়ি খাওয়ার মজাই আলাদা। আমার এক সিনিয়ার চোখের সার্জেন কয়েক বছর আমাদের চোখের শিবিরে নিয়ে যেতেন। উনি উদ্যোক্তাদের বলতেন, আমাদের স্যার চপমুড়ি খুব পছন্দ করেন। প্রায়ই শিবিরে গিয়ে চপমুড়ি খেতাম। বারাকপুর হাসপাতালে সন্ধ্যায় ডিউটি থাকলে প্রায়ই তেলেভাজা মুড়ি আনিয়ে খাওয়া হত। এখনও কলকাতার রাস্তায় তেলেভাজা মুড়ি খুব বিক্রী হয়। এই তেলেভাজার সাথে মুড়ির এমন একটা রাজ যোটক সম্পর্ক কবে থেকে হয়েছে জানিনা। কিছু মানুষ সর্সের তেল ছাড়া মুড়ি ভাবতেই পারে না।মনে আছে মেদিনীপুর শহরে থাকতে একবার আমি কোথাও গল্প করছিলাম, আমার বাসায় সর্সে তেল কেনা হয়না শুনে একজন অবাক হয়েছিলেন। উনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলেন, তাহলে মুড়ি খান কি করে? আমি নিয়মিত মুড়ি খেলেও তেল ছাড়াই খাই। মুড়ির সাথে অনেকরকম জিনিসই খাওয়া হয়। দুধ মুড়ি আমার পছন্দ নয়। বরং দই মুড়ি ভালো। আমের সময় আম মুড়ি; আহা কোথায় লাগে পিজা পাস্তা! ইটালিয়ানদের আম মুড়ি একবার খাওয়াতে পারলে ওরা পিজা ছেড়ে দিত নিশ্চিত। নারকেল মুড়ি, কলা মুড়ি, পান্তা ভাতের সাথে মুড়ি এমন সবকিছু আমিই খেয়েছি।

তবে ১৯৮৮ সালে বাঁকুড়ার এক বন্ধুর বাড়ীতে যা খেয়েছি, মেদিনীপুরিয়া অনেক মুড়ি মাষ্টারও কোনদিন খেয়েছে বলে শুনিনি। রানিবাঁধে এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী গেছলাম। ওখান থেকেই নিমডাঙ্গায় বন্ধু জয়ন্তর বাড়ীতে রাত্রে ঘুমাতে গেলাম। সকালে উঠে মাছ ভাজা দিয়ে মুড়ি খেলাম। বন্ধু অশোকের বাড়ীতে যখন নিয়মিত যেতাম, তখনও সকালে মুড়িই খেতাম। এবার পূজার সময় ওর নতুন ফ্লাটে বেড়াতে গেলাম। সকালে দুই বন্ধু মুড়ি খেলাম। সঙ্গে শশা আর কাঁচা লংকাতো ছিলই, অশোকের স্ত্রী তাড়াতাড়ি একটু তেলেভাজাও করেদিল।

মেদিনীপুরে থাকতে একবার বেলদা যাচ্ছিলাম ক্যাম্প করতে। সঙ্গি ডাক্তারবাবু বললেন, এই দেখুন বাখরাবাদ,এখানকার মুড়ি বিখ্যাত। বাখরাবাদ হল বেলদা আর নারায়নগড়ের মাঝের একটা গঞ্জের মত। পরে আর ওর কথা শুনিনি। জলপাইগুড়িতে আলাপ হল নাগরাজুর সাথে। ওর সাথে গাড়ী করে যেতে যেতে বড় বাজার পড়ল, ময়নাগুড়ি। রাজু দেখাল মুড়ির হাট। বস্তা বস্তা মুড়ি বিক্রী হচ্ছে দেখলাম। কেনার সুযোগ হল না। তবে বছর পনের আগে হলদিয়া বেড়াতে গিয়ে মুড়ির প্যাকেট কিনে এনেছিলাম। শহরের মানুষ তরিবত করে একবাটি মুড়ি মেখে আধঘন্টা ধরে খায়। আর গ্রামের মানুষ এক থালা মুড়ি জল দিয়ে ভিজিয়ে পাঁচ মিনিটে খেয়ে নেয়। এটা আসলে নিজের নিজের অভ্যেস। আমিতো সবদিন সকালে পেটভরে ভাত খেয়ে কাজে বেরই। দশ মিনিট লাগে খেতে। বাড়ীর সবাই একসঙ্গে ভাত খেতে বসলে,অন্যদের চল্লিশ মিনিট লাগে।

আমাদের দমদমের বাজারে অনেক দোকানেই মুড়ির প্যাকেট বিক্রী হয়। আজ সকালেই জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি,এক মুড়িমাসি বিরাট এক বস্তা মুড়ির প্যাকেট মাথায় নিয়ে চলেছে। এখন গ্রামে গঞ্জে মুড়ি মেসিন হয়ে গেছে। কেমন করে কাজ করে জানা হয়নি। মুড়ির বস্তা দেখলেই চোখের সামনে দেখতে পাই, তপন রুদ্র একবস্তা মুড়ি নিয়ে দিতে এসেছে। বস্তাটা রেখেই মায়ের পানের বাটা নিয়ে বসেগেল, পান সেজে খেতে। এখনও তপন আসে আমার বাসায় কির্তনের আসর হলে। ওকে দেখলেই মনে হয়, মা ওকে বলছে, তপন পান সেজে খা,আমি আসছি, খালি মুড়ির টিন বেরকরে দেব। মুড়ি, সামান্য মুড়িও যে আমাকে এভাবে জড়িয়ে আছে তাই বা কজন জানে? এখন হাজার হাজার টাকার রান্নার সরঞ্জাম বাড়ীতে; তবুও আমার পছন্দের বাসনটি হল একটি মুড়ি খাওয়ার বড় ফুল কাটা বাটি। ১৯৮৮ সালে মেদিনীপুরে কিনেছিলাম, তিনটাকা পঁচিশ পয়সা দামে।

আবার মুস্তাফা দর্জি
বেশ কয়েক বছর পর আজ আবার ওনার কাছে গেলাম। সে প্রায় বছর চারেক আগে , ওনাকে নিয়ে, এই রকম ছোট একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম; সেই নিবন্ধ পড়ে, আমার বহু পুরাতন এক বন্ধু বেশ কঠিন একটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন। একটু অবাক হলেও, অসম্ভব মনে হয়নি। কারণ, আমার মত চোখ কান খোলা লোকেদের এই এক সমস্যা। সবই দেখি, সবই বুঝি। আমাদের অবস্থা, " দেখন্তিক লাজ!" থাক সে কথা এখন। আমার প্রিয় পেশাদার মানুষটির সাথে অনেকদিন পরে দেখা হল। মাঝে গোটা পৃথিবীর উপর দিয়ে একটা মারাত্মক ঝড় বয়ে গেছে।
হ্যাঁ, আমি কোভিড ঝড়ের কথাই বলছি। কত কে যে অকালে চলে গেলেন। আঠারো সালে একটি বিখ্যাত কোম্পানির বড় অফিসার এর সাথে দেখা করতে গেছলাম। বিরাট এক প্রস্তাব নিয়ে গেছলাম। কাজটা হলে, আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না; করোনা এ রাজ্যে যত প্রাণ নিয়েছে, তার থেকেও বেশি মানুষ অকালে মারা যাওয়ার থেকে বাঁচতে পারতেন। আমাদের রাজ্যের দুর্ভাগ্য; আমাদের সেই প্রস্তাব কাজে লাগেনি সময় মত। আমার মত যে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ , সেই মারাত্মক সমস্যা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা এর মধ্যেই বুঝে গেছেন। আপনি কি জানেন? জানলেও মানেন? এই রাজ্যের নিজস্ব এন্টি ভেনম না থাকার জন্য গত সাত আট বছরে , এ রাজ্যে কত মানুষ সাপের কামড়ে মারা গেছেন! সংখ্যাটা এতটাই বেশি যে সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করা কঠিন। করোনা এ রাজ্যে যত প্রাণ নিয়েছে, সাপের কামড় এ তার অন্তত দশ গুণ মানুষ মারা গেছেন, গত সাত আট বছরে। আমরা যে বড় কর্তার সাথে দেখা করেছিলাম, তিনিও করোনায় প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর সেই কোম্পানী এখন আবার নতুন করে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই সুবাদে আবার আমার মত এক নগণ্য লোকের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। আর এই জন্যই জানতে পেরেছি, সেই বড় কর্তার শেষ খবরটা। এরকম বড় কর্তার খবরই কোন কাগজে বা টিভিতে দেখিনি। তো আমার পুরনো চেনা দর্জি, আছেন কি নেই , কে তার খবর রাখে!
আসলে ব্যপারটা ঠিক সে রকম নয়। আমাদের পোষাক কেনার ব্যাপারে , গত বছর ছয় সাতে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। আগে, বছরে গোটা তিনেক করে জামা আর প্যান্ট, দর্জিকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নিতাম। সেটা কমতে কমতে গত বছর তিনেকের মধ্যে, একেবারেই শূন্য হয়ে গেল। শেষ কবে যে দর্জির দোকানে নতুন জামা প্যান্ট বানাতে ঢুকেছি, মনেই পড়ছে না। এর মূলত দুটি কারণ আমার জন্য প্রযুক্ত। প্রথম কারনটা প্রায় সর্বজনীন। রেডি মেড পোশাকের রমরমা। আমি অবশ্য " ব্র্যান্ডেড" - এর চক্করে নেই। ব্র্যান্ডেড এর নামে , একই পোষাক সাড়ে তিন গুণ দামে কিনতে পারি না। তবুও অবস্থা বিপাকে গত তিন চার বছরে , সব পোষাকই রেডি মেড পরছি। আমি নিজে যেকটা কিনেছি, অন্যেরা তার চারগুণ কিনেছে আমার জন্য। আজও আলমারি খুললে, গোটা দুই তিন জামার প্যাকেট বেরোবে; হয়তো এক দেড় বছর আগে এসেছে, এখনও খোলাই হয়নি। যাঁরা দিয়েছেন, হয়তো ভালোবেসেই দিয়েছেন। কিন্তু একেবারেই অপাত্রে দান, বোঝাই যায়। আসলে, আর এটাই মূল কারণ; আমি লোকটা পোশাকের ব্যাপারে একেবারেই কাছাখোলা। কতবার হয়েছে, একটা জামা বা প্যান্ট পরে বেরোচ্ছি , বিয়ে বাড়ীতে যাব। আমার স্ত্রী বা ছেলে মেয়ে কেউ বলল, এটা একটা বিয়ে বাড়ীতে পরার মত জামা হল? তোমার কি আর জামা নেই? ব্যস্ততার মাঝেও ওরা কেউ আলমারি থেকে একটা জামা বের করে দিল। আমি যেটা পরে বেরোচ্ছিলাম তার থেকে এটা আলাদা কি , আমি বুঝলাম না। বিরাট কোন নামি কনফারেন্স এ যাওয়ার জন্য, কোট টাই পরে গেলাম। সেখানে পৃথিবী বিখ্যাত কোন শ্রদ্ধেয় মানুষ এসেছেন জেনেই, ছুটলাম স্যারকে প্রণাম করতে। স্যার কিন্তু পরে আছেন, খুবই সাধারণ একটা হাফ শার্ট! পোশাকের গুরুত্ব আজও আমি বুঝলাম না। পৃথিবী বিখ্যাত চোখের হাসপতালের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি, পৃথিবী বিখ্যাত প্রধান সার্জন, হাসপতালের সর্বময় কর্তা, সাধারণ প্যান্ট শার্ট পরে, একটা সাধারণ স্যান্ডেল পায়ে ঢুকলেন।
মূলত ঐ রেডি মেড পোশাকের চাপেই, আস্তে আস্তে দর্জির দোকানে যাওয়া বন্ধই হয়ে গেল। আমার গোটা তিনেক শীতের জন্য, মোটা কাপড়ের জামা আছে। গত শীতেও সবকটা বের করতেই হয়নি। মাস ছয় হল প্রায়ই পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি। তাই মনে হল , একটা শীতের জামা করেই নিই। বেশ বড় কাপড়ের দোকানের সামনে দিয়ে সপ্তাহে দুই একবার বাজারের ভেতরের দিকে হেঁটে যাই। কদিন আগে ওদের দোকানে ঢুকে, শীতের জামার কাপড় দেখতে চাইলাম। বলল, দোতলায় আছে, চলুন দেখাচ্ছি। সেদিন কেনার জন্য যাইনি, তাই বললাম , তাহলে থাক, পরে আসবো। আজ সন্ধ্যায় বাজারের দিকে যাওয়ার সময়, আমার প্রিয় মোস্তফা দর্জির দোকান খোলা আছে কি না দেখতে উঁকি দিলাম। দোতলায় দোকান। উনি আছেন কি না দেখতে দোতলায় উঠে গেলাম। প্রায় পাঁচ বছর পরে দেখা হল। প্রায় একই রকম চেহারা আছে। কাজে ব্যস্ত ছিলেন; আমিই ভদ্রতা দেখাতে দু একটা কথা বললাম। কতটা কাপড় কিনতে হবে জেনে, নেমে এলাম। আবার মিনিট পনের কুড়ি পরে কাপড় নিয়ে গেলাম। হাতের কাজ থামিয়ে, জামার মাপ নিলেন। রশিদ নিয়ে চলে এলাম। ছোট্ট দোকানে বসার কোন জায়গা নেই। ওনাকেও সব সময়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে দেখেছি। তাই ভদ্রতা দেখাতে, " বসুন" বলারও কোন সুযোগ নেই। আজও খেয়াল করলাম, যেমন গোটা কুড়ি কোট তৈরী করে ঝোলানো আছে, তেমনি

কুড়ি পঁচিশটি প্যান্টও ঝুলছে। মেঝেতেও কাটা কাপড় এর একটি স্তূপ। সেলাই মেশিন নিয়ে দুজন কারিগর সেলাই করে চলেছেন। অর্থাৎ, ওনার কাজের কোন অভাব নেই। আজই কাপড় কিনতে গিয়ে সেই দোকানের দোতলায় উঠলাম। একেবারে সিঁড়ির ধাপে ধাপে জামা কাপড় স্তূপাকার করে রাখা। বিশেষ করে চোখে পড়ল, রেডিমেড জামার প্যাকেট। কয়েক হাজার হবে। কোথায় তৈরী হয় এসব? একটার রং খুব পছন্দ হল। দাম বলল, নয়শ টাকা। যাঁরা আমাকে ভালোবেসে দিয়েছেন, তাঁরা হয়তো হাজার টাকা বা বেশী দামিও দিয়েছেন। আমি নিজে কোনোদিন পাঁচশ টাকার বেশি দাম দিয়ে জামা কিনেছি বলে মনে পড়ে না। এত হাজার হাজার রেডিমেড জামা প্যান্টের জন্য বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তো হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির সিংহ ভাগ এই রেডিমেড গার্মেন্টস এর থেকে আসে শুনেছি। বিখ্যাত লেখকের লেখা পড়ে জেনেছি, আমেরিকার বিখ্যাত কাপড়ের দোকানের জামার ট্যাগে, " মেড ইন বাংলাদেশ" লেখা দেখেছেন। ওরা যদি রপ্তানি করে, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরাও নিশ্চয়ই করে। কিন্তু শুধু সেলাই মেশিন চালানোর বিরাট বিরাট কারখানার কথা আমি অন্তত শুনিনি। এ রাজ্যের হাজার হাজার শ্রমিক " পরিযায়ী" হয়ে গোটা দেশে ছড়িয়ে আছে। এদের দিয়ে সেলাই করানো যাবে না? একটা খবর , একেবারে ভেতর থেকে বলতে পারি; অনেকেই হজম করতে পারবেন না। আমার এক নিকট আত্মীয়, ডেনমার্কের এক কোম্পানির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চাকরী করছে। বছর তিনেক হল বাংলাদেশে আছে। ওদের দেশের গণ জাগরণ বা সরকারের পরিবর্তনে , ঐ ডেনমার্কিয় কারখানায় কোন সমস্যা হয়নি। এটুকু বুঝেছি, আপনা ভালো পাগলেও বোঝে!

অনেক তো শিবের গীত শোনালাম। কিন্তু এই মুস্তাফা দর্জির জন্য আমার এত দুর্বলতা কোথায়? আমার সেই ' প্রাক্তন বন্ধু ' লিখেছিল, " দেশে কি আর ** দর্জি নেই!" তাঁর লেখা ঐ তারা চিহ্ন দেওয়া শব্দটি যে, কোন কোন সময় " অশ্লীল" ভাবে ব্যবহার করা যায়, সম্ভবত সেই প্রথম বুঝেছিলাম। আমি ঐ শব্দটির দ্বিতীয় বার , অশ্লীল ভাবে প্রয়োগ করতে চাই না। কিন্তু আমার এই দর্জিকে এত পছন্দ কেন? আজই সকালে, বিখ্যাত বাগ্মী চন্দ্রিল বাবুর একটি পুরোনো বক্তৃতা, ইউটিউবে শুনছিলাম। ওনার মতে, বাঙালির সব থেকে বড় দুর্বলতা, বা ব্যর্থতার প্রধান কারণ, " নিজের পেশার প্রতি নিষ্ঠার অভাব!" কয়েক কোটি বাঙালির মধ্যে , একটি রবীন্দ্রনাথ, একটি সত্যজিৎ বা একটি অমর্ত্য সেন! ব্যাস, তালিকা শেষ। এই ছিল , চন্দ্রিলবাবুর মূল প্রতিপাদ্য। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমার এই মুস্তাফা দর্জি মানুষটিকে পছন্দের একটিই কারণ, ওনার কাজের প্রতি নিষ্ঠা। নিজের কাজটি একশ শতাংশ সততার সঙ্গে করেন। আমার মত প্রাচীনপন্থী লোকই নয়, আমার ছেলেও ওনাকে বেশ পছন্দ করে। ব্র্যান্ডেড পোশাকের সাথেই, ওনার তৈরী পোশাকও পরে। নানান কারণে ছেলে ঐ বছর ছয়েক হল , টিটাগরে ওনার দোকানে যেতে পারছে না। কিন্তু দর্জির প্রসঙ্গ উঠলেই বলে, হ্যাঁ, সবথেকে ভালো টিটাগড়ের মুস্তাফা দর্জি!

মজার কথা কি জানেন? ভদ্রলোকের নাম কি আমরা কিন্তু জানিনা। ওনার দোকানের একটা নাম আছে, জানি, স্ট্যাটাস টেলার। কিন্তু ওনার নাম তাহলে মুস্তাফা দর্জি হল কি করে? সেই যে , " মর্জিনা - আবদাল্লা " গীতি নাটকে আছেন না, " বা - বা মু - স্তা - ফা !" যিনি মরা মানুষ বাঁচাতে পারেন না, "কিন্তু কাটা লাশ জোড়া দিতে পারেন!" 1.11.2024.

রহস্যময় কালাচ সাপ

রহস্যময় কালাচ সাপ অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে কমন ক্রেট সাপ , তাই নিয়ে এখনও বহু মানুষ প্রায় কিছুই জানেন না। ২০১৪ সালে হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে, ডা শোভন সিকদার একজন এই রহস্যময় সাপের কামড় এর রুগী পেয়েছিলেন। সকাল বেলা একজন ১৬ বছর বয়স এর ছেলে পেটে ব্যাথার জন্য এসেছিল। বাড়ীর লোকের ধারণা হয়েছিল, আগের রাতে ডিম ভাজা খেয়ে পেটের গন্ডগোল হয়েছে। ডাক্তার সিকদার রুগীর চোখের দিকে তাকিয়ে " শিবনেত্র" বা ইংরেজিতে যাকে বলে টোসিস, পেয়েই নিশ্চিত ভাবে বুঝেছিলেন, এই ছেলেটিকে আগের রাতে রহস্যময় কালাচ সাপে কামড়েছে। যেহেতু এই সাপ সাধারণত গভীর রাতে বিছানায় উঠে কামড় দেয়, কামড়ে কোন ব্যাথা লাগে না, এমনকি কয়েক ঘন্টা পর আর কোন কামড় এর দাগও দেখা যায় না, বাড়ীর লোকের ধারণা হয় ডাক্তারবাবু ভুল বলছেন।

এই ব্যাপারটি কিন্তু মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। এই ১৬ বছর বয়সের ছেলেটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ডাক্তার সিকদার অনেক বুঝিয়েও অন্টিভেনম চিকিৎসা শুরু করতে পারেন নি। উনি বলেছিলেন, একে অ্যান্টি ভেনম না দিলে একটু পরে ওর শ্বাস কষ্ট শুরু হবে। হয়েছিলও তাই। ঘন্টা দুই পরে ছেলেটির শ্বাস কষ্ট শুরু হলে বাড়ীর লোক অ্যান্টিভেনম চিকিৎসায় রাজী হন। দ্রুত দশটি অ্যান্টি ভেনম চালানো হলেও রুগীকে কলকাতায় পাঠাতে হয়। কারণ ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে, ডাক্তার সিকদার ঠিকই বুঝেছিলেন যে, ঐ রুগীকে ভেন্টিলেশনে না দিতে পারলে বিপদ আছে। উনি সবকিছু লিখে, রুগীকে কলকাতায় পাঠান। রুগী কলকাতার হাসপাতালে ভর্তিও হয়েযায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এ রুগী ভেন্টিলেশনে দেওয়ার আগেই মারা যায়। তাতেই সব সমস্যার শেষ হয়নি। কোন এক ডাক্তারবাবু একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে বসেন। তাঁর মতে এটি কোন সাপের কামড় -এর রুগী ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই রুগীর বাড়ীর লোকজন উত্তেজিত হয়ে যান, তাদের তখন মনে হয় ডা সিকদার ভুল চিকিৎসা করার জন্যই তাদের রুগী মারা গিয়েছে। আমদের সৌভাগ্য যে আর একজন বড় ডাক্তারবাবু রহস্যময় কালাচ সাপের কামড় এর বিষয়ে জানতেন, উনি এসে রুগীর বাড়ীর লোকের উত্তেজনা কমান। এরপর পোষ্ট মর্টেম করেও সাপের কামড় এ মৃত্যু ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়। আরও নিশ্চিত ভাবে কালাচ সাপের কামড় বোঝা যায়, বিকেলে ঐ ছেলের ঘর থেকে একটি কালাচ সাপ উদ্ধার হওয়ার পর।

এই খবর ২০১৬ সালে, পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য দপ্তর প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ও ছাপা হয়েছে।

জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে নানান রকমের অনুষ্ঠান করে, আমরা বছরের পর বছর এই সব রুগীর কথা বলে, কালাচ সাপ সম্বন্ধে লোকজনকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি। এই আলিপুর দুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থার মত অনেক সংগঠন ও সারা বছর এসব অনুষ্ঠান করে চলেছেন। এখন পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কর্মরত প্রায় ৯০% ডাক্তারবাবু সাপের কামড় এর বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। শুধু ঐ ছেলেটিই নয়, এরকম কয়েকশ কালাচ সাপের কামড় এর রুগীর সফল চিকিৎসা হয়েছে এ সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তারপরও আমরা রুগীর বাড়ীর লোকজন এর অজ্ঞতার খবর পাচ্ছি।

গত ২৮ .১০. ২০২১ তারিকের সংবাদ প্রতিদিন কাগজে এরকম একটি দুর্ভাগ্যজনক খবর প্রকাশিত হয়। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ধান্যকুড়িয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, সকাল বেলা একটি বছর পনের বয়সের মেয়ে চিকিৎসার জন্য আসে। বাড়ীর লোকের কথা অনুযায়ী , মেয়েটি সকালে একবার পাতলা পায়খানা করে একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে। ওর পেট খারাপের চিকিৎসার জন্যই ওকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ডা বিশ্বাস মেয়েটিকে পরীক্ষা করে দেখতে পান, শিবণেত্র। নিজের ডাক্তারী বুদ্ধিতে ডা বিশ্বাস বুঝতে পারেন যে , একবার মাত্র পাতলা পায়খানা করে এরকম একটি কিশোরী একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে এটা হয়না; নিশ্চয়ই অন্য কোন কারন থাকবে। এসময় উনি শীবনেত্র দেখে বুঝে যান যে এটি কালাচ সাপ কামড়ের রুগী। কিন্তু সেই একই রকম সমস্যা হল, বাড়ীর লোকজন বুঝতে চাননা। তারা কামড়ের দাগ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন। ডাক্তার বিশ্বাস বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, শিবনেত্র কালাচ সাপ কামড় এর লক্ষণ। বিপদ বুঝে ডাক্তার বিশ্বাস আমাকে ফোন করে সবকিছু জানান। আমি ওনাকে জাঙ্গিপাড়া হাসপাতালের ঘটনা মনে করিয়ে বাড়ীর লোকজনকে বোঝাতে বলি। এর মধ্যে আমি ঐ জেলার এক স্বাস্থ্য কর্তাকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাই। উনি ডা বিশ্বাস এর মোবাইলে ফোন করে রুগীর বাড়ীর লোকের সাথে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বাড়ীর লোকজন বুঝতে চাইলেন না। তারা লিখে দিলেন যে, তাদের রুগীর সাপের কামড় এর চিকিৎসা করার দরকার নেই। ঘন্টা তিনেক সময় নষ্ট করে, বাড়ীর লোকজন মেয়েটিকে ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ছুটি করিয়ে বড় হাসপাতালে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেন। পথে মেয়েটি মারা যায়।

২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল। সাত বছরে আমার পরিচিত ব্যাক্তি ও সংগঠন মিলে অন্তত দুই আড়াইশ বার বিভিন্ন জায়গায় ২০১৪ সালের দুঃখজনক ঘটনাটি উল্লেখ করেছি। কাজ যে খুব একটা কিছু হয়নি এই সাত বছর পর ঘটা সম্পূর্ন অবাঞ্ছিত মৃত্যুর পর আমরা বেশ বুঝেছি।

এতো গেল সাধারণ জনগণকে শেখানোর মূল্যায়ন। এবার ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে ভর্তি একজন রুগীর ঘটনা বলি। তখনও ঝাড়গ্রাম হাসপাতাল জেলা হাসপাতাল হয়নি। একদিন বিকেলে একজন ৩৭ বছর বয়সী জোয়ান মানুষ পিঠে ব্যাথার জন্য ভর্তি হলেন। সকাল থেকে মাটি কাটার কাজ করে পিঠে ব্যথা হয়েছে, এই ছিল তার রোগের ইতিহাস। রুগীকে ভর্তি করা হয় অর্থোপেডিক সার্জন অর্থাৎ অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে। উনি রুগীকে একটি ব্যথা কমানোর ইনজেকশন দিয়ে শুয়ে থাকতে বলেন। ব্যাথার ইনজেকশন পাওয়ার প্রায় ৪৫ মিনিট পর রুগী জানান যে তার পেট ব্যাথা করছে। কর্তব্যরতা সিস্টার দিদিমণি ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠান। উনি এসে রুগীর কথা শুনে মনে করেন যে ব্যাথার ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে পেটে ব্যথা হয়েছে। উনি সাধারণ কথায় আমরা যাকে গ্যাস অম্বলের ওষুধ বলি, তাই দিতে লিখে দিয়ে নিজের চেম্বার এ চলে যান। আবার ঐ রকম মিনিট পঁয়তাল্লিশ পর রুগী জানান, গলায় ব্যাথা করছে। আবার ঐ অর্থোপেডিক সার্জেন ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠান হয়। উনি হাসপাতালে এসে রুগী দেখে, নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুকে ডাকতে বলে চলে যান। নাক কান গলার বিশেষজ্ঞ এসে রুগী দেখে লিখে যান, গলায় কোন গণ্ডগোল নেই। আবারও কিছু পরে রুগী জানান যে তার শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। আবারও সেই অর্থোপেডিক সার্জেন হাসপাতালে আসেন। এবার উনি খুবই বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেন, এটা মানসিক রুগী, কাল সকালে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু এলে দেখিয়ে নেবেন। শ্বাস কষ্ট বলেছে রুগী, তাই অক্সিজেন এর একটা নল নাকে লাগিয়ে দিতে বলে হাসপাতাল থেকে চলে যান। রুগী শ্বাস কষ্ট বলতে বলতে আধ ঘণ্টা পরে মারা যান। এবার তো হাসপাতাল একটা জরুরী অবস্থা হয়ে গেল। ঐ দুজন ডাক্তারবাবু, হাসপাতালের সুপার, ইমার্জেন্সির ডাক্তার ম্যাডাম সবাই ছুটে এসে সুপার এর ঘরে জরুরী মিটিং এ বসলেন। এরকম একটি জোয়ান মানুষ ভর্তির ঘন্টা তিনেক এর মধ্যে কী কারণে মারা যেতে পারে, কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না। সন্ধ্যার রাউন্ড দেওয়ার জন্য আরও কয়েকজন ডাক্তারবাবু ও এসেছেন; সকলেই সুপার স্যার এর ঘরে মিটিংয়ে কি নিয়ে আলোচনা চলছে দেখতে বসে গেলেন। এই ভাবেই, আমাকে যে ডাক্তারবাবু এই ঘটনাটা পরে বলছিলেন , উনিও এসে বসেছিলেন। এই ডাক্তারবাবু এর আগে, ঐ হাসপাতালে অনুষ্ঠিত একটি সাপের কামড় এর বিষয়ে আলোচনা সভায় কালাচ সাপ কামড় এর অদ্ভুত ব্যাপারটি শুনেছিলেন। কালাচ সাপ কামড়ের রুগিও এরকম গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা, সারা শরীরে ব্যাথা, পেটে ব্যাথা, গলায় ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে আসতে পারে, এটা উনি জানতেন। সময়ে অন্টিভেনোম না পেলে এই সব কা লা চ কামড়ের রুগী শ্বাস কষ্ট পেতে পেতে, দম বন্ধ হয়ে মারা যান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যে তিনজন ডাক্তারবাবু হাসপাতালে এই হতভাগ্য রুগীকে ঐ দিন দেখেছিলেন, তারা কেউই আমাদের সেই প্রশিক্ষণ ক্লাশে ছিলেন না। এই যে ডাক্তারবাবুর প্রশিক্ষণ ছিল, উনি জানতে চান, এই রুগীর শিবোনেত্র দেখা যায় কি না। সত্যি বলতে কি, পিঠে ব্যাথা, বা পেট ব্যাথা রুগীর চোখের দিকে তাকালে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে, এই ব্যাপারটি প্রশিক্ষণ না থাকলে জানা সম্ভব নয়। তাই এই রুগী বেঁচে থাকার সময়ে এর চোখের দিকে কোন ডাক্তারবাবু ই ভালো করে দেখেননি। শুধু শিবনেত্র দেখেই, কয়েকশ কা লা চ সাপ কামড়ের রুগী বুঝে গিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন , এমন প্রশিক্ষিত বহু ডাক্তারবাবু এ রাজ্যের গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এখনও কাজ করছেন।

এবার এই কা লা চ সাপ কামড় এর একটি রুগীকে, শুধু নিজের অদম্য জেদ দিয়ে কেমন ভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, শালবনী গ্রামীণ হাসপাতালের ডাক্তার মহতাসিব আলম, সেই কথা বলি। দশ বছর বয়সী একটি ছেলেকে শালবনি হাসপাতালে আনা হয় একদিন সকালের দিকে। এই ছেলেটিকে তার আগে কয়েক ঘন্টা এক ওঝার বাড়ীতে রাখা হয়েছিল। খুব সম্ভবত এই ওঝা কালাচ সাপ কামড়ের ব্যাপারটি বুজতে পেরেই ছেলেটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। রুগী যখন হাসপাতালে পৌঁছয় তখন তার শ্বাস কষ্ট শুরু হয়েছে। ডাক্তার আলম দ্রুত অ্যান্টিভেনম চালিয়ে দেন। কিন্তু রুগীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে দেখে ডাক্তার আলম ছেলেটির শ্বাসনালীতে টিউব লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস চালুকরে দেন। গ্রামীণ হাসপাতালে ভেন্টিলেটর থাকে না। এই রকম রুগীকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করে সেখানে ভেন্টিলেটর মেশিন দিয়ে শ্বাস চালু রাখতে হয়। কিন্তু অনেক সময় এই সব রুগীর অবস্থা এতই খারাপ থাকে যে, শহরের বড় হাসপাতালে পৌঁছনর আগেই রুগী মারা যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা মতে এদের বড় হাসপাতালে পাঠানোর সময়, ডাক্তার আলম যে ভাবে আম্বুব্যাগ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস চালু রেখেছিলেন , সেভাবেই পাঠানো উচিত। শালবনী হাসপাতাল থেকে কাছের বড় হাসপাতাল হল, কুড়ি কিলো মিটার দূরের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ। আগেও ওখানে দু এক বার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সাপে কাটা রুগী বেড খালি পায়নি। তাই ডাক্তার আলম ছেলেটিকে সেখানে পাঠানোর আগে বেড খালি আছে কি না নিশ্চিত হতে চান। উনি আমাদের কয়েকজনের কাছে ফোন করে ব্যাপারটা দেখতে বলেন। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ আমার খুবই প্রিয়জন। ওনাকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাই। উনি বললেন, বেড খালি আছে কি না একটু পরেই জানাবেন। কিন্তু বেড খালি ছিল না। অধ্যক্ষ মশাই চেষ্টা করেন, কিন্তু পাঁচ ছয় ঘন্টা পরও কোন আই সি ইউ বেড খালি হলনা। এদিকে শলবনি হাসপাতালে ভর্তি ছেলেটির শ্বাসনালীতে টিউব লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস চালু রেখে বসে আছেন

ডাক্তার আলম। মেডিক্যাল কলেজে বেড খালি পাওয়ার আগে ছেলেটি স্বাভাবিক শ্বাস নিতে শুরু করে। ওকে শলবনী হাসপাতাল থেকেই সুস্থ করে ছুটি দেওয়া হয়, পরের দিন। ডাক্তার আলমের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ এই রাজ্যের কেন, এ দেশেই বিরল। আমার অন্তত জানা নেই, আজ পর্যন্ত এ দেশে কোন গ্রামীণ হাসপাতালে, এ ভাবে কোন রুগীকে বাঁচানো হয়েছে কি না।

আমরা ডাক্তার আলম এর এই যুগান্তকারী কাজটি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে সারা দেশে প্রচার করে চলেছি। ওনার এই উদাহরণ দেখে, পরবর্তী সময়ে আরও কএক জন ডাক্তারবাবু এরকম ভাবে সাপে কাটা রুগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। গ্রামীণ হাসপাতালে একটি করে পোর্টেবল ভেন্টিলেটর থাকলে আরও অনেক সাপে কাটা রুগীকে নিশ্চিন্তে বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এ কথা আমি এ রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এর বড় কর্তাদের চিঠি লিখে জানিয়েছি। আট নয় বছরেও সে প্রস্তাব কার্যকর করার কোন প্রচেষ্টা আমি দেখিনি।

এই যে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ এখানে দিলাম এর থেকে একটা ধারণা করা যায় না কি যে, কালাচ সাপের কামড় এর বিষয়ে শুধু সাধারণ জনগণ নয়, ডাক্তারবাবুদের মধ্যেও প্রচুর অজ্ঞতা আছে ? আবার সামান্য একদিনের প্রশিক্ষণ পেলেই, যে কোন ডাক্তারবাবু এই সাপের কামড় এর রুগীর রোগ লক্ষণ বুঝতে পারেন। আর সময় মত চিকিৎসা করা হলে রুগী বাঁচানো সম্ভব। এখন তাহলে বোঝা যাক , এই সময় মত চিকিৎসা করার ব্যাপারটি কি!

যে কোন বিষধর সাপের কামড় এর চিকিৎসা হল ,শরীরে যে বিষ কামড়ের জন্য ঢুকেছে তাকে অ্যান্টি ভেনম দিয়ে প্রতিহত করা, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে Neutralize করা। শরীরে বিষ ঢোকার পর থেকে ঐ বিষ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিকর কাজ শুরু করে। কামড়ের জায়গা থেকে বিষ একটু একটু করে রক্তে মিশতে থাকে। এক এক সাপের বিষ এক এক প্রত্যঙ্গ বিকল করতে থাকে। যেমন চন্দ্রবোড়া সাপের বিষ আমাদের কিডনী নষ্ট করে। ফণা যুক্ত সাপ, গোখরো আর কেউটের বিষ খুব দ্রুত রক্তে মিশতে পারে, এদের বিষ স্নায়ুতন্ত্রকে অকেজো করে দেয়। চোখের পাতা থেকে শুরু করে দ্রুত এই স্নায়ু অকেজো করার কাজটি নিচের দিকে নামতে থাকে। বুকের পাঁজর এর সাথের মাংস পেশী আমাদের শ্বাস কার্য চালু রাখে। সাপের বিষ এই পাঁজরের পেশী অকেজো করে রুগীর দম বন্ধ করে মেরে ফেলে। কালাচের বিষও স্নায়ুকে অকেজো করে দম বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এদের বিষ ফণাযুক্ত সাপের বিষের মত দ্রুত কাজ করে না।

কালাচ সাপের কামড় এর পর দুই থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পরও চোখের পাতা পড়ে আসা, অর্থাৎ শিবনেত্র ঘটায়। এই শিবনেত্র শুরু হওয়ার দুই তিন এমনকি চার পাঁচ ঘন্টা পরও শ্বাস কষ্ট শুরু হয়। তাই শিবনেত্র শুরুর পর যত তাড়াতাড়ি অন্টিভেনোম দেওয়া যায় তত বেশি সাফল্য পাওয়া যায়। সাধারণত শ্বাস কষ্ট শুরু হয়ে গেলে অন্টিভেনোম্ম দিলেও কৃত্রিম শ্বাস চালু করতে হয়। ডাক্তার আলম এটা করে দেখিয়েছেন। এখানে বলে রাখা ভালো, ফণাযুক্ত সাপের কামড় এর পর শুধুই অন্টিভেনোম দিয়ে শ্বাস কষ্ট আটকানো যায় না। Atropine ও Neostigmine injection দুটি না দিলে, ফণা যুক্ত সাপের কামড় এর রুগী প্রায় বাঁচানো মুশকিল।

কালা চ সাপ কামড় নিয়ে এত বিভ্রান্তির কারন হল, আমাদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা কিছু বদ্ধমূল ধারণা। আমরা প্রায় সবাই জানি, বিষধর সাপের কামড় হলে, দুটি কামড় এর দাগ থাকবেই। কালাচ সাপের কামড় এর ব্যতিক্রম। রাত্রে ঘুমের মধ্যে কামড়ের পর সকালে, অর্থাৎ কামড় এর তিন চার ঘন্টা পর আর কোন দাগ থাকে না। এছাড়া ফণা যুক্ত সাপের কামড় এর পর যেমন কামড় এর জায়গায় পোড়ানো ব্যথা হয়, কালাচ সাপ কামড় এ তমন কোন জ্বালা ব্যাথা হয় না। কালাচ সাপ কামড়ের এই সব বিচিত্র ব্যতিক্রমী ব্যাপার সবার জেনে রাখা দরকার।

ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার, জাতীয় কর্মসূচী রূপায়ণ দলের সদস্য।

ঠিক দুই মাস হল সরকারী চাকরী থেকে অবসর নিয়েছি। এর মধ্যে বহু মানুষ জানতে চেয়েছেন, কেমন আছি বা কেমন লাগছে। কোন আশ্রমে বা মিশনে যোগ দিয়ে, দু মাসেই কি বলা যায়, কেমন আছেন? দু মাসেই কি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়ে যায়? একটা দীর্ঘ দিনের অভ্যাস থেকে নতুন জীবন ধারায় পৌঁছে সেটা কেমন লাগছে, বুঝতে একটু সময় লাগবেই। আজ সকাল থেকেই বেশ মেঘলা, বর্ষা বাদলার দিন। আমার জানালার বাইরে দেখতে পাচ্ছি, কতো লোক কাজে যাচ্ছেন। সবাই সরকারী চাকরী করতে যাচ্ছেন তা তো নয়। বেসরকারি চাকরী, মিস্ত্রী, কাজের মাসি, আয়া, দোকানদার, কতো কি পেশা। আমার কিন্তু মনে হল গোপাল ভাঁড়ের একটি গল্প। এক বর্ষা বাদলার রাতে গোপাল রাজবাড়ি থেকে বাড়ী ফিরছিল। রাস্তার একটু জল জমেছে, জোরে বৃষ্টি নামার জন্য, গোপাল এক সাধারণ মানুষের কুটিরের চালের তলায় ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। গোপালের পায়ের ছপ ছপ শব্দ শুনে কুটিরের ভেতরের মহিলা বললেন, একটা কুকুর না শেয়াল আমাদের ছাঁচে এসে দাঁড়াল। ঘরের লোকটি বলল, আরে না, নিশ্চয়ই রাজ কর্মচারি; ওরা ছাড়া এই দুর্যোগে কুকুর শেয়াল কেউ বেরোয় না। সত্যিই কি আমাদের সেরকম দুরবস্থা ছিল? পিছন ফিয়ে তাকালে সেরকম কিছু দিনের কথা মনে পড়ে বৈকি। প্রথমে বর্ষার কথাই বলি।
কয়েক বছর আগে এক বর্ষার সকালে হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। পার্ক সার্কাস স্টেশনে নেমে সাত আট মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাই। ছাতা ছিল, তাই একটু একটু বৃষ্টি পড়লেও হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু মাঝ পথে প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামল। আমি একটি বাড়ির শেডের নিচে দাঁড়িয়ে গেলাম। ক্রমশ বাড়ছে বৃষ্টি। সামনের রাস্তা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি রাস্তা দিয়ে আমার সহকর্মী এক লেডি ডাক্তার হাসপাতালের দিকে চলেছেন। ছাতা আছে, কিন্তু একেবারে কাক ভেজা যাকে বলে। বুঝলাম, আমার পরের কোন ট্রেনে এসে নেমেছেন, ছাতা খোলার আগেই ভিজে গেছেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে না ভিজে সোজা হাঁটা দিয়েছেন, হাসপাতালে পৌঁছে, অপারেশন থিয়েটারের পোশাক পরে নিতে পারবেন। প্রায় তিরিশ বছর এর চাকরী জীবনে অসংখ্য বার এমন কাক ভেজা হয়ে কাজে যেতে হয়েছে, বা কাজ থেকে ফিরেছি। আর কুকুর শেয়াল বেরোতে পারেনি এমন দিনে দুবার, রাজ কর্মচারি হয়ে পথে নামতে হয়েছিল। আম্পানের দিন সকালে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তখন কোভিডে লক ডাউন চলছে। নিজেই গাড়ী চালিয়ে গেছলাম। দুপুরে আমার পরে যে ভাইয়ের ডিউটি ছিল সে ঝড়ের ভয়ে আগেই এসে গেছে। খবর ছিল দুপুর আড়াইটার পর ঝড় বাড়বে। আমি দুটো নাগাদ গাড়ী চালিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম। শহরের ভেতর দিয়ে আসতে তখন মিনিট কুড়ি লাগে, রাস্তা ফাঁকা। সেদিন তো ঝড়ের জন্য আরও ফাঁকা। শিয়ালদা আসতে আসতেই বৃষ্টি প্রচণ্ড বেড়ে গেল। তখন দাঁড়িয়ে গেলে সেদিন আর বাড়ী ফেরা হত না। প্রবল বেগে wiper চালিয়ে ছোটালাম গাড়ী। শ্যামবাজার আসার আগেই ঝড়ের বেগও বেড়ে গেল। তখন আবার টালা ব্রীজের কাজ চলছে, লকগেট দিয়ে আসতে হবে। পাখীর হাটের রাস্তা দিয়ে লকগেটে এসে দেখি বন্ধ। পাশের রাস্তা ধরে কাশীপুর ঘুরে এলাম। বাড়ী পৌঁছে গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়েই টের পেলাম ঝড়ের গতিতে সব লণ্ড ভন্ড হচ্ছে। আমার যে রাজকর্মচারি ভাই আমাকে দুপুর দুটোর আগে ছেড়ে ডিউটি ধরেছিল, সে পরদিন দুপুর দুটোর আগে বাড়ী ফিরতে পারেনি। যাবে কি করে? গাছ পড়ে কলকাতার রাস্তা সব বন্ধ। পরের ডাক্তার হাসপাতালে না এলে ও তো আর বাড়ী যেতে পারে না।
লক ডাউনের প্রথম দিকে, এক রাত্রে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে চলেছি। বেলগাছিয়া রোডে ওঠার আগে সিগন্যাল এ দাঁড়িয়েছি। এমন শুনশান কলকাতার রাস্তা আর কোনোদিন দেখিনি। সত্যিই রাস্তায় শেয়াল কুকুর নেই। হঠাৎ আমার পাশে একটি মোটর বাইক এসে দাঁড়াল। আরোহী ছেলেটি হিন্দিতে জানতে চাইল, শিয়ালদা কোন দিকে। বললাম, ডান দিকের রাস্তা ধরে যেতে। কিন্তু শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। এমন নির্জন রাতের রাস্তায় জীবনে আর কখনো বের হতে হবেনা। আমি তো আর রাজ কর্মচারি নই।
আজ সকাল থেকেই যে সকল রাজ কর্মচারি ভোটের ডিউটি করতে বেরোচ্ছেন তাঁদের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মেজদার কথা মনে পড়ল। আমরা ঐদিন দুপুরে শিশু কন্যাকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করেছি। রাত্রে হাসপাতালের পাশের দোকানে খেতে গিয়ে, ফট ফাট পটকার শব্দ শুনেছি। আমাদের খাওয়া হতেই দোকানদার বলল, আপনারা হাসপাতালে থাকবেন? তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকে যান, শব্দ শুনছেন তো! মেজদা পরদিনও হাসপাতালে এল না। কি ব্যাপার? ছোড়দা জানাল, গতকাল কলকাতায় ভোট ছিল, মেজদা ভোট নিতে গেছল। বাড়ী ফিরে অসুস্থ হয়ে গেছে। ওদের বুথের সহকর্মী এক ভোটারকে আই কার্ড দেখাতে বলেছিলেন। আনছি বলে লোকটি ফিরে গিয়ে পিস্তল হাতে ফিরে আসে। দাদার পাশেই তাঁর সহকর্মী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। যে সকল রাজ কর্মচারি আজ গণতন্ত্রের পবিত্র উৎসবে পুরোহিত হয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য আমার আজকের মত একটি নিশ্চিন্ত অবসরের প্রার্থনা করি।

আমার রাজা দেখা

দেশ স্বাধীন হওয়ার তের চোদ্দ বছর পর আমার জন্ম। ততদিনে দেশে গণতন্ত্র বেশ ভালো ভাবেই চলতে শুরু করেছে। বাহান্ন সালের পর বার তিনেক ভোট হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক রাজা তখনও থেকে গেছেন। ক্ষমতা না থাকলেও রাজাদের বড় বড় বাড়ী এখনও আছে , এগুলিকে রাজবাড়ী বলা হয়। রাজস্থান, গোয়ালিয়র, মহিশুর, কোচবিহার এসব জায়গায় অনেক বড়বড় রাজবাড়ী এখনও আছে। আমি এরকম বেশ কয়েকটি রাজবাড়ী দেখেছি। কিন্তু রাজা দেখেছি একবারই। আমার বাবা মা এর গুরুদেব ছিলেন ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী । এগারো বারো ক্লাশ এ পড়ার সময়, কলকাতায় মানিকতলা আশ্রমে একবার এই গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার জন্মের পর পরই বাবা মা দীক্ষা নিয়েছেন; তাই আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই জানি বাবা মা এর গুরুদেব কে। আমরা বলতাম, মহানাম দাদু বা মহানামদা। এই দাদুর বড় দাদা থাকতেন মেদিনীপুর শহরে। আমি তখনও স্কুলে ভর্তি হইনি; হয়তো চার পাঁচ বছর বয়স হবে। ভাই আমার থেকে বছর তিনেকের ছোট। আমাদের দু জনকে নিয়ে, বাবা মা গুরদেবকে প্রণাম করতে, মেদিনীপুর শহরে গেছলেন। বার্জ টাউন এ, দাদুর বড় দাদা অবিনাশ দাদুর বাড়ীতে আমরা এক দুদিন ছিলাম। সেই সময়ই জীবনে প্রথম রাজা দেখা। সেই শৈশবের কথা সব স্পষ্ট করে মনে নেই। সে সময় মহানাম দাদুকে তো দেখেছিলাম। কিন্তু আমার একটুও মনে নেই । মা বোধহয় বলেছিল, আজ রাজা আসবে। তাই আমরা দুজন বারান্দায় বসে ছিলাম। মনের মধ্যে হয়তো আশা ছিল, রাজা আসবেন রথে চড়ে। কিন্তু আমার পরিষ্কার মনে আছে, রাজা এসে নামলেন, রিক্সা থেকে। যাত্রা দলে যেমন ঝলমলে ' হাকোবা ' জামা কাপড় পরা রাজা দেখা যায়, এই রাজা সেরকম ছিলেন না। তবে বেশ লম্বা চওড়া একজন মানুষ ছিলেন এটা মনে আছে। তারপর আর কোন কথাই মনে নেই। রাজা কত সময় ছিলেন, কোথায় বসেছিলেন, কিছুই মনে নেই।

এই রাজার কথা তারপর জানলাম , সেজদা কলেজে ভর্তির সময়। তার আগে এক আধ বার শুনেছি, গ্রামে পোষা হাতি এলে। একটি কি দুটি হাতি নিয়ে মাহুতরা আসত, বাড়ী বাড়ী ঘুরে ধান বা টাকা পয়সা চেয়ে নিত। লোকে বলত, ওগুলি রামগড়ের রাজার হাতি। পরে আর মিলিয়ে দেখা হয়নি, সত্যিই ওগুলি রামগড়ের রাজার হাতি কি না। সেজদা মেদিনীপুর শহরে কলেজে পড়ার জন্য গেল। তখন বাড়ীর যা অবস্থা একটি টাকাও ওকে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। দাদা মেদিনীপুরে গিয়ে জানতে পারল, রামগড়ের রাজার মায়ের নামে একটি কলেজ আছে। কৈবল্যদায়ীনি কলেজ, লোকে বলে কে ডি কলেজ। রাজা বাবার গুরু ভাই। সেই রাজাকে ধরে বেতন মুকুব হল। শহরে থাকা খাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছিল, সেটা বললে এখন লোকে ' ভূতের ' গল্পের মত অবিশ্বাস করবে। কিন্তু যে রাজার নিজের একটা কলেজ আছে, তাঁকে রাজা ভাবতে আমাদের এতটুকু সমস্যা হয়নি।

তারপর প্রায় বছর পনের কেটে গেছে। আমি ডাক্তার হয়ে মেদিনীপুর শহরে এলাম, একটা দাতব্য সংস্থার হাসপতালে চাকরী করতে। ওদের ঐ একই বাড়ীতে মন্দিরও আছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ভক্তেরা কীর্তন করতে আসে। একদিন শুনলাম, রাজার জামাই ও আসেন কীর্তন করতে। আলাপ হল। রাজা মশাই আমার বাবার গুরু ভাই, এ কথাও জানালাম। জামাইবাবু বললেন, এইতো সামনেই থাকেন, একদিন আসুন। এই জামাইবাবু কিন্তু অমায়িক ভদ্রলোক। সরকারী আপিসে কি একটা চাকরী করতেন, অন্যদের কাছে জেনেছি। আমি বড় রাস্তার ওপর যেখানে চেম্বার করতাম তার থেকে দেড়শ গজ দূরেই রাজা মশাই এর বাড়ী। একদিন বিকেলে গিয়ে হাজির হলাম। অতি সাধারণ একতলা একটা বাড়ী। বাইরে কোন রং করা ছিলনা। বাইরের বারান্দায় বসে গল্প করলাম। বাবার পরিচয় দিলাম। আমার এক দাদা ওনার কলেজে বিনা বেতনে পড়েছে, সেটা মনে করতে পারলেন। কিন্তু জানালেন, আমি এখন সন্যাস দীক্ষা নিয়েছি। কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যা আরতী দেখে যেতে বললেন। বাড়ীর ভিতরের দিকে সাধারণ ঠাকুর ঘরই বলা যায়; সেখানে সন্ধ্যা দেখানো হল। রাজা মশাই নিজে খোল বাজালেন। তারপর আমি একটু পূজার প্রাসাদ পেলাম। সেদিন রাজার কাছে গৌর লীলার ব্যাখ্যা শুনে ভালো লেগেছিল। গুরুদেবের লেখা "উদ্ধব সন্দেশ " বইটি বাবাকে পড়তে দেখেছি। ঐ উদ্ধব নিয়েও প্রথম কিছু জানলাম। গুরুদেবের ভাগবত পাঠ কিংবদন্তির মত ছিল। তাই নিয়ে একটি সুন্দর মজার ঘটনা বললেন। সে কথা আর একদিন হবে।

মেদিনীপুরে থাকতেই একদিন আমার বন্ধুর গ্রামের বাড়ি রামগড়ে গেছলাম। রাজবাড়ী এখনও আছে কি না বলতে, বন্ধু নিয়ে গেল দেখাতে। বেশ কয়েক বছর আগে ডাকাতে আক্রমণ করার পর থেকে রাজা মশাই শহরে চলে গেছেন জানতাম। রাজা মশাই এর হাতে বড় কাটা দাগও দেখেছি। ডাকাতের টাঙ্গির কোপ পড়েছিল। রাজবাড়ী সেই তিরিশ বছর আগেই একেবারেই বাসযোগ্য অবস্থায় ছিল না। বিরাট জমিদার বাড়ি। কিন্তু দরজা জানালা প্রায় ছিল না। কয়েকটা চামচিকা উড়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে। এতদিন রাজা মশাই হয়তো আর বেঁচে নেই। খোঁজও নেওয়া হয়নি। ৭.১০.২৪.

dayalbm@gmail.com

এখনও রেডিও শোনা

আজ সন্ধ্যেয় আকাশবাণী কলকাতায় আমার একটা সাক্ষ্যাৎকার বাজবে। শোনা হবে না। ঐসময় আমি ট্রেনে করে টিটাগড়ে যাবো। টিটিগড়ে নেমেও শোনার সম্ভাবনা নেই। মোবাইলে এফ এম শোনাগেলেও,কলকাতা ক শোনা যায় না। এবারই আকাশবাণীর কৌশিকবাবু জানিয়েছেন, সেট টপ বক্সে এখন রেডিও শোনার একটা ব্যবস্থা আছে। বাড়ী এসে, ও যন্ত্রটার কার্যকৌশল নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা হল। ছেলেমেয়ে ওসব বোঝে ভাল; ওরাও হার মানল। অগত্যা আদি অকৃত্রিম বন্ধু, আমার রেডিও সেট। কিন্তু এখন তো একটা প্রমান সাইজের ট্রানজিস্টার সেট আমার বাড়ীতে আছে। ওটা নিয়ে রাস্তায় বেরলে,কুকুরে তাড়া করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

মনে পড়ে যায় আমার পুরনো ভালোবাসার মারফি বেবি ডিলাক্সকে। কলেজে ভর্তি হয়ে, বোধহয় বছরখানেক পর থেকে ঐ একটা ছোট্ট রেডিওয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। আমাদের ক্লাশের মানসের একটা বেবি ডিলাক্স ছিল। ওটা দেখেই শুরুটা হয়েছিল। ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে একদিন মানসকে বলেছিলাম; ও যদি ওর পুরনো রেডিওটা বাতিল করে কখনো, আমি কিনতে চাই। ও খুবই বিরক্ত হয়েছিল ঐ কথায়। ওটা যে ওরও কতো ভালোবাসার জিনিস, সেদিন একটু আন্দাজ পেয়েছিলাম। কারো, কোন জিনিসের ওপর কতোটা ভালোবাসা থাকে, কেউ কি কোনদিন বুঝতে পারে?

" মনকি বাত" লিখতে শুরু করেছি প্রায় আড়াই মাস হল। আমার মনের কথা, দু চারজন সমমনস্ক মানুষ পড়ছেন। তাঁদেরও নানা জনের নানান প্রতিক্রিয়া। কাউকে খুশী করার, কাউকে আঘাত দেওয়ার কোন অভিপ্রায় নেই। এই ধরনীর ধূলীমাখা পথে সাতান্ন বছরধরে হাঁটছি। পায়ে ধুলো লেগেছে, বারবার ধুয়েও ফেলেছি। কেউ ঐ ধুলোকে," বৈষ্ণব ভক্তজনের পদরেণু" ভেবে গড়াগড়ী দিচ্ছেন। কেহ আবার নাকে মুখোশ পরছেন। কারুর ওতে হাঁচি হয়; কেউ আবার পরম শ্রদ্ধায় কপালে তিলক লাগান। এমনকি জিভে লাগানোর মানুষেরও অভাব নেই। ধুলোকে ধুলো বলতে, আমার অন্তত কোন অপরাধ বোধ নেই।

রেডিওর গল্প বলতে গিয়ে কোথায় নিয়ে এলাম আপনাদের! ঐ স্বপ্নের বেবীডিলাক্স কিনতে পেরেছিলাম,বাঁকুড়ায় যখন আমি জুনিয়ার ডাক্তার। এখন জুনিয়াররা পয়সা জমিয়ে মোটর বাইক কেনে। তখন ঐ একটা শ' দেড়েক টাকার রেডিও কিনতেও অনেক কষ্ট করে টাকা জমাতে হয়েছিল। অনেক বছর ঐ ছোট রেডিওটা আমার সাথে সাথে ঘুরেছে। মনে আছে, একদিন আজহারউদ্দিনের সেন্চুরী শুনেছিলাম,বম্বে রোডে ট্রাফিক জ্যামে পড়েও। সেও ঐ বেবীডিলাক্সেই। আর সেই মস্কো অলিম্পিকের হকি ফাইনাল। গ্রামের বাড়ীতে, সন্ধেবেলা, একা একা শুনছিলাম। শেষের দিকে ক্রমশ শব্দ ক্ষিণ হয়ে আসছিল। আমি কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরে,মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের একটা মাটির বাড়ীতে বসে, চোখ বন্ধ করে দেখতেপাচ্ছি, অলিম্পিক স্টেডিয়ামের," কোনে কোনে মে, ভারতকা তেরঙ্গা লহরতে হুয়ে!" টান টান উত্তেজনার খেলা। শেষ মিনিটেও দেশ জিতছে চার- তিনে। এবার ইংরেজীর ধারাভাষ্যকার উত্তেজনায় ফুটছেন। শেষ দশ সেকেন্ড বাকী; উনি শুরু করলেন কাউন্ট ডাউন। নাইন,এইট, সেভেন,সিক্স, ফাইব..... গোল্ড! ঐ শেষ দশ সেকেন্ডে আমার হৃদকম্পন কতোতে উঠেছিল জানিনা। ওনার পাঁচ গোনার পর আর রেডিওর শব্দকানে এসেছিল কিনা জানি না; তখন বুকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দই কানে আসছিল। বয়সটা নেহাতই বছর চব্বিশ ছিল; আজকের বয়স হলে নিশ্চিত হার্ট আটাক হতো। সেই বেবীডিলাক্সও কবে যেন আমাকে ছেড়ে গেল। কিন্তু রেডিও শোনার নেশা আজও কাটেনি। আমরা যারা পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের কাছে এসে গেলাম, রেডিও আমাদের রক্তে মিশে আছে। জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই , আমাদের দুর্গাপূজা শুরুহত, এক ভোরে, আধো ঘুমে আধো জাগরনে ভদ্রবাবুর অলৌকিক উচ্চারনে, "আশ্বীনের শারদপ্রাতে......."শুনেই। তখন গোটা গ্রামে একটা কি দুটো রেডিও। মিত্রা মাসির ঢাউস রেডিওটা ঐ দিন রাত্রে আমাদের বাড়ীতেই থাকতো। বহু বছর পরেও, বাঁকুড়ার হস্টেলের থেকে, ঐদিন ভোরে একদল ছেলে বেরিয়ে পড়েছি। ঘোষালের হাতে একটা বড় রেডিও। কয়েকজনের হাতে টর্চ। হাসপাতাল, নার্শিংহোস্টেল ছাড়িয়ে, ধানক্ষেতের আল ধরে চলেছি দারকেশ্বর নদীর দিকে। উন্মুক্ত প্রান্তরে ঐ ব্রাম্ভমুহূর্তে দশদিক আমোদিত করে ছড়িয়ে পড়ছে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের পবিত্র শ্লোক উচ্চারন, " ইয়া দেবী, সর্বভূতেসু শক্তিরুপেন সংস্থিতা"। শব্দ, ব্রম্ভ কিনা জানিনা। কিন্তু শব্দ যে একটা শক্তি, এতো সাধারন শিক্ষিতমানুষ মাত্রেই জানেন। ঐ সকল টি ভি, মোবাইল, ইন্টারনেট বিহীন সময়ে, একটা রেডিও সেটের মাধ্যমে যে প্রবল মর্মভেদী শব্দ আমাদের চেতনাকে উজ্জিবিত করতো,আজকের বধির করা ডি জে শব্দে উদ্দাম নৃত্য করা প্রজন্ম তার মর্ম কখনোই বুঝবে না। ১৬.৭.২০১৭.

লেখার তারিখটা রেখেই আজকের কথা লিখছি। ওটা সাতান্ন বছর বয়সে লেখা। এখন তো আমি অবসর প্রাপ্ত, বরীষ্ঠ নাগরিক। মাঝখানে গঙ্গা দিয়ে যেমন অনেক জল বয়ে গেছে, তেমনি কোভিড নামে এক মহা ঝড়ে পৃথিবী তোলপাড় হয়ে গেছে। আমার সেই বড় রেডিও, সেটাও বাতিল হয়েছে কয়েক বছর হল। রেডিও অনুষ্ঠান আমিও খুব একটা শুনি না।

সকালের বাংলা খবরটা মাঝে মাঝে শুনি। ক'মাস আগে আবার একটা সাক্ষাতকার এর জন্য গেলাম , আকাশবাণী ভবনে। মানস প্রতীম বাবু একটা লিংক পাঠিয়ে দিলেন। এখন মোবাইলেই খুব পরিষ্কার শোনা যায়, যে কোন জায়গা থেকেই। আজই আমার ডাক্তার ভাই প্রসূন, ছবি দিয়ে জানিয়েছে, মহালয়া শোনার জন্য একটা বড় রেডিও সেট কিনেছে। ওকে allindiaradiolive এর লিঙ্ক পাঠালাম।
আমার বন্ধু সেই মানস, মাস ছয়েক আগে হঠাৎ ই হার্ট অ্যাটাক এ মারা গেল। নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার সময়টুকুও পাওয়া যায়নি। বছর তিনেক আগে শেষ একবার দেখা হয়েছিল। ওর সেই রেডিও নিয়ে কোন কথা ওঠেনি।
dayalbm@gmail.com
আমাদের অনেকেরই এখনও রেডিও নিয়ে কিছুটা আদিখ্যেতা আছে। কিন্তু খুব কম লোকেরই " হ্যাম রেডিও" ব্যাপারটা জানা আছে। এই রাজ্যের হ্যাম রেডিও ক্লাবের প্রধান, অম্বরিশবাবুর সাথে আমার আলাপ আছে। ওনারা মাঝে মাঝেই ওদের ঐ হ্যাম রেডিও ক্লাবের মাধ্যমে, বহু বছর আগে হারিয়ে যাওয়া, স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষদের বাড়ীতে ফেরান। খবরের কাগজের সাত বা আট নম্বর পাতায় একটা ছোট্ট খবর বেরোলে অম্বরিশ বাবু আমাকে পাঠান। তখন বুঝতে পারি, কতো মানুষ কতো ভাবে সমাজ সেবা করে যাচ্ছেন, আমরা কতোটুকু খবর রাখি! ৫.১০.২৪.

কাজীরাঙ্গা থেকে আমাদের তিনটি মিনি বাস সকাল আটটায় রওনা দিল শিলং শহর এর উদ্দেশ্যে। গুয়াহাটি থেকে যে রাস্তা দিয়ে গেছলাম, সেই রাস্তা ধরেই ফেরা। শুধু গুয়াহাটি শহরে না ঢুকে এক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া। ফেরার পথে বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটেনি। ঘন্টা দুই চলার পর বড় রাস্তার পাশে অনেক ডাব বিক্রী হচ্ছে দেখে নামা হল। এক বুড়িমা ডাব বিক্রী করছিলেন। আমার আগে মুখার্জীবাবু দাম জেনে ডাব কেটে দিতে বলেছেন; দাম জানলাম তিরিশ টাকা। আমিও একটা কেটে দিতে বললাম। মুখার্জী বাবু একটা একশ টাকার নোট দিলে বুড়িমা চল্লিশ টাকা ফেরৎ দিলেন। তাই নিয়ে অশান্তি। বুড়িমা বারবারই বলছেন দাম শাটি টাকা। আর মুখার্জী বাবু বুঝছেন থার্টি টাকা। আমি বুঝে গেলাম শাটি মানে উনি ষাট বলছেন। আবার একটা বড় ধাবায় দুপুরের খাওয়া হল। তারপর একটানা ঘন্টা চারেক চলে শিলং শহর। গুয়াহাটি থেকে এক ঘন্টা মত চলার পর পাহাড়ী রাস্তা শুরু হল। আকাবাঁকা রাস্তা ক্রমশ উপরে উঠতে থাকল। এক জায়গায় না থেমেই ডান দিকে দেখতে বলল ড্রাইভার। দেখলাম একটা নদীর মত; ড্রাইভার বলল, বড়া পানী লেক। পরে জেনেছি ওর নাম উমিয়াং লেক। অনেকে ওখানে বোটিং ও করে। শিলং শহর এর রাস্তা বেশ সরু, গাড়িও প্রচুর। শহরে ঢুকে আমাদের হোটেলে পৌঁছতে ঘন্টা খানেক লাগল। সন্ধ্যায় আর কোথাও বেরলাম না। পাহাড়ী শহর হিসেবে যেমন ঠান্ডা লাগবে ভেবেছিলাম তেমন ঠান্ডা ছিল না। রাত্রে ডিনার হলেও সোয়েটার লাগলো না। ভোরে উঠে রাস্তায় হাটতে বেরোনোর সময় সোয়েটার গায়ে বেরোলাম, কিন্তু আট টায় আর সোয়েটার গায়ে রাখা গেল না।

শিলং এর দ্বিতীয় দিনে আমরা চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত দেখে এলাম। সকাল আটটায় বাস ছাড়ল। শহরের রাস্তায় এই সকালেই গাড়ীর জ্যাম। আমরা সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শিলং এর ঠাকুর বাড়ী পৌঁছে গেলাম। একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়ীতে ছিলেন। এখন সেই বাড়ীতে একটি ছোট মিউজিয়াম হয়েছে। অত সকালে মিউজিয়াম খোলা ছিল না। বাড়ীর সামনে কবির পূর্নাবয়ব মূর্তি; সবাই সেখানে ছবি তুলেছিলাম। তারপর গাড়ী চলল চেরাপুঞ্জির পথে। গোটাটাই আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা। আমরা ঘন্টা তিনেক চলে পৌঁছলাম, নৌয়াকালিকাই জলপ্রপাতের কাছে। ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে দেড়শ মিটার মত হেঁটে ভিউ পয়েন্ট। অনেক ওপর থেকে জলপ্রপাত দেখলাম। সকল ভ্রমণ স্থানের মত এখানেও বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানে স্থানীয় জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমরা দারচিনি কিনলাম। ফেরার পথে পাশেই সোহরা রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট এলাকা। আমরা সবাই নেমে স্কুল আর মন্দির দেখে এলাম। এই মিশন ১৯৩১ সালে তৈরী। অতদিন আগে ঐ দূর্গম জায়গায় এই মিশন স্থাপন করা হয়েছে ভাবলে রোমাঞ্চ বোধ হয়। এক মহারাজের ভাষণে শুনেছি, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে, সপ্তাহে একবার জীপ গাড়ী নিয়ে গৌহাটি শহরে বাজার করতে আসা হত।
এরপর আমরা পৌঁছলাম একটা গুহার কাছে। টিকিট কেটে গুহার একদিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক দিয়ে বেরোলাম। একশ পঁয়ত্রিশ মিটার রাস্তা , বেশ রোমাঞ্চকর। ভেতরটা বেশ আঁকাবাঁকা। এক এক জায়গায় একটু অসাবধান হলেই মাথায় ঠোক্কর লাগার সম্ভাবনা। আমাদের দলের চার পাঁচ জনই গুহায় ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেড়িয়েছি। সামনে বিরাট চত্বরে গাড়ী রাখার জায়গা। বেশ কিছু গাছের তলা সিমেন্ট বাঁধানো। কুণ্ডুর লোক আমাদের হাতে হাতে দুপুরের খাওয়ার প্যাকেট দিল। ঐ সব বাঁধানো গাছের তলায় বসে সকলে খেয়ে নিলাম। মিনিট পনের চলার পর বড় রাস্তার পাশে এক জায়গায় বাস থামল। সবাই নেমে উল্টো দিকে সেভেন সিস্টার ফলস দেখতে গেলাম। জলপ্রপাত একেবারেই জল শুন্য। একটু বৃষ্টি হলে সাতটা ধারায় জল নামে জানলাম। আমাদের অনেকের ধারণা ছিল, চেরাপুঞ্জি তে বৃষ্টি দেখা যাবে। এপ্রিল এর এগারো তারিখ এক টুকরো মেঘ ও আকাশে ছিল না। শিলং এর অনেক কাছে এসে, বড় রাস্তা থেকে বাম দিকের ছোট রাস্তা ধরে একটি ভেতরে ঢুকলাম। এখানে এলিফ্যান্ট ফলস জলপ্রপাত। তিনটি ধাপে জলপ্রপাত। এখানে বেশ জল ছিল। এক এক করে আমরা একেবারে নিচে পর্যন্ত নেমে দেখে এলাম। ওঠার সময় গুণে দেখলাম , একশ ছিয়াশি সিঁড়ি। ওখান থেকে সোজা শিলং এর হোটেলে ফিরে এলাম। শহরে সকালের থেকে বেশী জ্যাম, হোটেলে পৌঁছতে বিকাল পাঁচ টা বেজে গেল। আমাদের দলের কয়েকজন ট্যাক্সি নিয়ে পুলিশ বাজার ঘুরতে গেলেন, আমার উৎসাহ ছিল না।

পরদিন সকালে উঠে আমরা হোটেল থেকে নিচের দিকে হাঁটতে গেলাম। কিছুটা উৎরাই নেমে আবার চড়াই রাস্তায় উঠলাম। বেশ কিছুটা হেঁটে একেবারে একটা পাহাড়ের মাথায় পৌছে প্রায় সমতল রাস্তা পেলাম। হাটতে হাটতে একটা বড় ফুটবল মাঠে পৌঁছে গেলাম। কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে, অনেকে মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওখান থেকে দু দিকেই পাহাড় দেখা যায়, বেশ সুন্দর দৃশ্য। দ্বিতীয় দিনে আমরা চললাম মাউলিংনন গ্রামের দিকে। এটা অনেক টা চেরাপুঞ্জি র রাস্তায় এগিয়ে চল্লিশ কিমি মত গিয়ে বাম দিকের রাস্তা ধরতে হয়। মাঝে পাঁচ কিমি মত রাস্তা খুব খারাপ। ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝে রাস্তার পাশে একটা খুব ঝক ঝকে হোটেলের সামনে গাড়ী দাঁড়াল। সকলে হোটেলের টয়লেটে গিয়ে প্রস্রাব পায়খানা করে নিলাম। এমন বিচ্ছিন্ন জায়গায় এত সুন্দর ব্যবস্থা দেখে সকলেই প্রশংসা করলাম। এখন থেকে আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে, বড় রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে বেশ সরু রাস্তায় গাড়ী ঢুকল। এই রাস্তা শুধু সরুই নয়, একেবারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলল। দশ কিলোমিটার মত চলার পর আমরা মাওলিংনন গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামে ঢুকতে একটা চেক পোষ্ট, এখানে মাথা

পিছু তিরিশ টাকার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। একটু পাহাড়ী রাস্তা একশ গজ মত নেমে একটা বেশ ছড়ানো, পিচ ঢালা মাঠে পৌঁছল। ওখানে সবাই গাড়ী থেকে নামলাম। ঠিক দুপুর বেলা। ঝক ঝকে রোদ, কিন্তু কলকাতার মত আগুন গরম নয়। একজন ম্যানেজার জানিয়ে দিল, এক ঘন্টা গ্রাম ঘুরে আবার সেই জায়গায় ফিরে আসতে হবে। ওখানেই একটা হোটেলে দুপুরের খাবারের আয়োজন। আমরা সোজা গ্রামে ঢুকব না পিছন ফিরে ঘুরে ঢুকব তাই নিয়ে একটু টানা টানি হল। শেষে দলবেঁধে সোজাই ঢুকলাম। একটু এগিয়ে বাঁশের তৈরী ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পেলাম। এটা আমি আগে ইউটিউবে দেখেছিলাম। ওঠার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন কারণে বন্ধ ছিল। আমরা আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটেই গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের ঢালে ঢালে বাড়ী। প্রতিটি বাড়ীতেই ফুল আর পাতা বাহার এর গাছ। গ্রামটা পরিচ্ছন্ন গ্রাম বলে প্রচার পেয়েছে। আমার কিন্তু গ্রামটাকে পরিষ্কারের থেকেও সুন্দর বেশী মনে হয়েছে। গ্রামের চার্চের এলাকায় ঢুকে ঘুরে দেখলাম। ফুটবল মাঠে ঐ দুপুরের রোদেও ছেলেরা ফুটবল অনুশীলন করছিল, আমরা মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে অন্য দিকে গেলাম। গ্রামটাতে ঘুরে বেড়ালে ও লোকজন প্রায় দেখাই গেল না। প্রায় প্রতিটা বাড়ীতেই হোমস্টের ব্যবস্থা করেছে। একটা দোতলা বড় হোটেলও দেখলাম। গ্রাম ঘুরে এসে একটা বড় হোটেলের চালার নিচে আমরা সবাই খেয়ে নিলাম ঘন্টা খানেক পর গাড়ী ছাড়ল। মিনিট পাঁচ সাত চলেই পৌঁছে গেলাম লিভিং রুট ব্রীজের কাছে। এই গাছের শেকড় দিয়ে তৈরী সেতু একটি দর্শনীয় জিনিস বটে।একটি তিরিশ ফুট মত চওড়া ঝোরার উপর এই সেতু। মনে হল এক পাশের দুটি গাছের শিকড় দিয়েই সেতুটি তৈরী। সেতু পেরিয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে, নিচে নেমে , নানান ভাবে অনেক ছবি তোলা হল।সেতু তৈরীর গাছ দুটিকে বট গাছের মত লাগল। হাতের কাছে একটা নতুন ডালে কিছু পাতা দেখা গেল। অনেক টা আমরা যাকে রবার গাছ বলি, সে রকম পাতা। তবে আকারে অনেক ছোট। এই সেতু দেখার জন্য আমাদের চল্লিশ টাকা করে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়েছে। আমাদের গাড়ী অনেক টা নীচে একটা ছোট্ট মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমাদের বেশি হাঁটতে হয়নি। হয়তো একশ ধাপ ও নামতে হয়নি। কিন্তু আমাদের সাথে থাকা বয়স্ক লোকজন অনেকে ওখানে নামার সাহস পাননি।

ঐ দিন আর নতুন কিছু দেখা হয়নি, ঐ রুট ব্রীজ থেকেই সোজা শিলং এর হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন তো সকালে রওনা দিয়ে গুয়াহাটি ফিরে এসে দুপুরের প্লেন ধরে বিকেলে কলকাতা চলে এলাম। ঐ Mawlainong গ্রামের থেকে আবার চল্লিশ কিমি মত গেলে ডাউকি নামে একটি ভালো বেড়ানোর জায়গা আছে; আমাদের যাওয়া হয় নি। শিলং থেকে প্রথমদিনই চেরাপুঞ্জি গিয়ে আবার শিলং ফিরে না এসে, ঐ দিন ওদিকেই মাওলাইনোং গ্রামে গিয়ে থাকতে হত। তা হলে দ্বিতীয় দিনে ওখান থেকেই সকালে ডাউকি গিয়ে বিকেলে শিলং ফেরাটা কম পরিশ্রমের হত। সম্ভবত Mawlainong এ এত লোকের এক সাথে থাকার মত হোটেল না থাকায় কুণ্ডু স্পেশাল ওখানে রাত্রে থাকার কথা ভাবেনি। সব মিলে কুণ্ডুর ব্যবস্থাপনা ভালো। বিশেষ করে একটু বয়স্ক লোকজন এর জন্য তো আদর্শ। আর ওদের সাথে যেহেতু বাঙালি রান্নার লোক আর সরঞ্জাম যায়, খাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু পাঁচ ছয় মাস আগে থেকেই ট্যুর বুক করাটা সবার কাছে বাস্তব সম্মত না ও হতে পারে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে ডিরেক্টর স্যার যখন বললেন যে, আবার একবার গোটা রাজ্যে সাপের কামড় এর প্রশিক্ষণ হোক তখন এটাকে আর একটা দায়িত্ব হিসেবেই নিয়েছিলাম। গোটা তিনেক মিটিং এর পর, আগস্টের দশ তারিখ সমগ্র কাজটার রূপরেখা ঠিক হয়ে গেল। আগস্টের ১৬ তারিখ থেকে শুরু হবে। খড়্গপুর আর মেদিনীপুর দিয়ে শুরু।

এর মাস দুই আড়াই আগেই ঠিক হয়েছিল, ১৫ ই আগস্ট বন্ধু প্রশান্তর বাগান বাড়ীতে যাওয়া হবে। ১৫ তারিখ অদিকে গিয়ে আর ফিরে আসতে চাইছিলাম না।

১৬ তারিখ খড়গপুর এ ক্লাশ, তাই পনের তারিখ রাত্রে ওদিকেই থেকে যাব ঠিক করেছিলাম। খড়গপুর এর সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স এর অসীম বাবুকে জানাতেই উনি ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় Khargapur IIT তে একটা অনুষ্ঠান ঠিক করে ফেললেন। ঐ দিন রাত্রে ঐ IIT এর Guest House এই থাকা ঠিক হল।

বহু বছর পর, ১৫ ই আগস্ট বাইরে থাকলাম। সকাল সাতটায় বেরিয়ে বন্ধুদের সাথে চললাম, মকারাম পুর। এই পাঁচ জন বন্ধুর সাথে গাড়িতে প্রায় একশ কিমি যাওয়া টাই বেশ উপভোগ্য হল। বন্ধুর বাগান বাড়ীতে কয়েক ঘন্টা আনন্দে কাটিয়ে, বিকেলে খড়গপুর এলাম। অসীম বাবুদের সাথে মোটর সাইকেলে IIT গেলাম। ওদের রামন হলে প্রায় পাঁচ শ লোকের সামনে সাপের কামড় নিয়ে বললাম। পরে অসীম বাবুদের সাথে IIT এর ভেতরেই একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে Guest House এ ঢুকলাম। IIT এর এই Guest House গুলি বেশ ভালো। ওখানে আগেও একবার থেকেছি। এবার আমার এক আত্মীয়, ওখানকার ছাত্র রাতের দিকে এসে গল্প করে গেল। সকালে উঠে IIT এর ভেতরে হাঁটার অভিজ্ঞতা মনোরম। প্রচুর গাছ পালায় ভরা ওদের এই চত্বরে সকালে হাঁটতে বেশ ভালো লাগে।

দশটার পর আমার সহ প্রশিক্ষক ডা শুভেন্দু গাড়ী নিয়ে এসেগেল। ওর গাড়ীতে খড়গপুর হাসপাতালে গেলাম। এবারকার রাজ্য ব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হল এখন থেকেই। বিকেল সাড়ে চারটায় রওনা দিয়ে এক ঘন্টা পর মেদিনীপুর শহরে পৌঁছলাম। মেদিনীপুরের জেলা পরিষদের তমাল নামের ঘরটি আমার জন্য ঠিক করা ছিল। বেশ ক্লান্ত ছিলাম, তাই ঘন্টা খানেক ঘুমিয়ে নিলাম।

মেদিনীপুর শহরে আমার তিনজন ভাগ্নী থাকে; এবার ওদের এক দু জনের সাথে দেখা করব, ভেবেই গেছলাম। ছোট ভাগ্নীকে স্কুটার নিয়ে আসতে বলেছিলাম। ওর স্কুটারে গেলাম ওর কোয়ার্টারে। ওর ছোট্ট মেয়েটিকে এবারই প্রথম দেখলাম। রাত্রে আমার হোটেলে থাওয়ার কথা থাকলেও ছোট ভাগ্নীর বাড়িতেই খেয়ে এলাম। রাত হয়ে যাওয়ার জন্য , পাশেই বড় ভাগ্নীর বাসায় যাওয়া হলনা। মেজ ভাগ্নী ছেলেকে নিয়ে এসেছিল , ওদের সাথে অনেক কথা হল। এই নাতি টি পরদিন সকালে আমাকে মোটর সাইকেলে দিদির বাড়ী নিয়ে যেতে পারে জানাল।

পরদিন বেশ সকালে উঠে হাঁটতে শুরু করলাম। কলেজের উল্টো দিকে প্রয়াত বিপ্লবী পূজনীয় বিমল দাশগুপ্ত মহাশয়ের মূর্তির ছবি তুললাম। এর মধ্যে নাতি টি এসে গেল মোটর সাইকেল নিয়ে। ওকে নিয়ে চললাম পাঁচ খুরী। সেখানে ছোট ভাগ্নীর নির্মীয়মান বাড়ীটি দেখলাম। তারপর চললাম দিদির বাড়ী।

১৯৯৯ সালে দিদি মারা যাওয়ার পর ঘন্টা খানেক এর জন্য গেছলাম; তারপর ভাগ্নে আর জামাই বাবুও মারা গিয়েছে, ওদিকে আমার আর যাওয়ার সময় হয়নি।

আমার ছোট বেলার খুব সুন্দর কিছু স্মৃতি আছে এই বনোপুরার দিদির বাড়ীতে। জামাইবাবু আলা ভোলা মানুষ ছিলেন, আমাকে খুব স্নেহ করতেন। খুব সকালে পৌঁছে প্রয়াত ভাগ্নের স্ত্রী আর ছেলেদের বেশ চমকে দিলাম। বেশী সময় ছিলনা হাতে, মেদিনীপুর শহরে ফেরার তাড়া ছিল। নাতির মোটর বাইকে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

দিদি, জামাইবাবু, একমাত্র ভাগ্নে সবাই চলে গেছে। ভাগ্নের বিধবা বউটি দাঁত কামড়ে পড়ে আছে শশুর এর ভিটায়। এ জীবনে আর কোনোদিন ঐ গ্রামে যাওয়া হবে কিনা জানিনা। দেড় মাসের জেলা সফরের দ্বিতীয় দিনে, নাতির মোটর বাইকের কল্যাণে তবুও একবার যাওয়া হল। এই নাতি টা paramedical পড়ার সুযোগ পেয়েছে বলেছিল। ওকে Optometry পড়ার পরামর্শ দিলাম। শেষে আমাকে নাতিও বলল, আমার সাথে ঘন্টা দুই ঘুরে ও খুব খুশী হয়েছে। পরে আমাকে জানিয়েছে, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে Optometry পড়ার সুযোগ পেয়েছে। আমার একটা হঠাৎ দিদির বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার জন্য একটা ছেলের জীবনের গতি পথই পাল্টে গেল।

দিদির বাড়ী থেকে ফিরে সোজা গেলাম বড় ভাগ্নীর কোয়ার্টারে। ওর ছেলে মেয়েকে খুব ছোট বেলায় দেখেছি; এখন সব বড় হয়ে গেছে। কলেজের পড়া শেষ করে এখন পেশাদারী শিক্ষা নিচ্ছে। ওদের ওখানে আধ ঘন্টা থেকে ফেরার রাস্তা ধরলাম। ফেরার পথে পুরনো বন্ধু ডা সিনহার বাড়ী ঘুরে আসতে চাইলাম। আঠাশ বছর আগে মেদিনীপুরে থাকার সময় বহুবার গিয়েছি ডা সিনহার বাড়িতে। এবার কিন্তু আর ওনার বাড়ীটা খুঁজেই পাওয়া গেল না। তমাল ঘরে ফিরে এলাম। এবার কাজের জন্য তৈরী হতে হবে। নাতিটি জানাল, ওর বাবা একবার অবশ্যই আমার সাথে দেখা করে তাঁর চোখের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছে। ওর বাবাকে আধ ঘন্টা পর আনতে বললাম।এর মধ্যেই আমার স্নান সারা হয়ে গেল। ওরা এলেন তার পর।
এই ভাগ্নী জামাইয়ের চোখে এখন সমস্যা হচ্ছে; তাই আমার পরামর্শ চায়। ওদের সাথে কথা বলতে বলতেই ড্রাইভার এসে ডাক দিলেন। দু চার মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পরলাম।
মেদিনীপুর জেলার CMOH অফিসে আগেও এরকম প্রশিক্ষণ দিতে এসেছি। আমি পৌঁছনোর কিছু পরেই ডা শুভেন্দু ও এসে গেল।এবারের প্রশিক্ষণে বারে বারে একেবারে নতুন ডাক্তারবাবুদের পাঠাতে বলা সত্ত্বেও মেদিনীপুর জেলার দু একজন পুরাতন ডাক্তারবাবুকে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় জুলুম করে পাঠানো হয়েছে জেনে প্রথমেই মনটা বিরূপ হয়ে গেল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ঘন্টা তিনেক চলল প্রশিক্ষণ। এটা শুভেন্দু র পুরনো কাজের জায়গা। সেখানে ও এবার প্রশিক্ষক হিসেবে এসেছে, এটা আমার বেশ ভালো লাগছিল।
মেদিনীপুরে প্রশিক্ষণ শেষ করে বিকেল চারটা নাগাদ কলকাতায় ফেরার রাস্তা ধরলাম। শুভেন্দুর গাড়িতেই ফিরলাম। মেদিনীপুর থেকে কলকাতা গাড়িতে আসার সময় শুভেন্দুর সাথে অনেক গল্প হল। গত দশ বারো বছর ধরে সাপের কামড় নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছি। সরাসরি সামনে ক্লাশে বসে, আর অনলাইনে মিলে হাজার আট ডাক্তারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি; ডা শুভেন্দু র মত এমন নিষ্ঠাবান ছাত্র আর পাইনি। এবার ওর একার ওপর বেশ কয়েকটি জেলার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়ার সময় দুবার ভাবতে হয়নি। কলকাতায় পৌঁছে একটা মেট্রো স্টেশনে নামার সময় শুভেন্দু আমাকে একটা কাজের জিনিস উপহার দিল। তিন দিনের একটা ভ্রমণ সেরে বাড়ী ফিরলাম।
এর পরের প্রশিক্ষণ পুর্ব মেদিনীপুর জেলার জন্য, তমলুকে। এখানেও গেলাম শুভেন্দু র গাড়ীতে। আগে একবার তমলুক গেছলাম; তবুও একেবারেই অপরিচিত একটা শহর। গ্রাম আর ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলেছে। হঠাৎ ই একটা শহর এসে গেল। একেবারেই সাধারণ ঘিঞ্জি একটা জেলা শহর। শহরের ভেতরের রাস্তায় পাশাপাশি দুটি গাড়ি চালানো প্রায় অসম্ভব।শহরে ঢুকে মনে পড়ল, আমার কলেজের দাদা ডা অমল বেরা তমলুক এ থাকেন। দাদাকে ফোন করে জানালাম , আমি ওখানে গিয়েছি। তমলুকের রাস্তাও আর সব জেলা শহরের মত টোটোর দখলে । একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম; মিউনিসিপ্যালিটি বললে স্কুলের মেয়ে জানিনা বলছে; পৌর সভা বললে দেখিয়ে দিল।
তমলুকের প্রশিক্ষণ ও ভালোই হল। শেষের দিকে ডা বেরা এলে, তাঁকে আমাদের সাথে শিক্ষকের আসনেই বসতে বললাম। উনিও আমাদের ক্লাশ বেশ উপভোগ করলেন। ফেরার সময় দুপুর বেলা বলে তমলুকের রাস্তাও একটু ফাঁকা পেলাম।
কদিন পরই চললাম নন্দীগ্রাম। অতি বিখ্যাত এই গঞ্জে আগে কোনোদিন যাইনি। এবার চললাম ভাড়া করা গাড়িতে। শুভেন্দু এর মধ্যেই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে যোগ দিয়েছে, ও আমাদের গাড়িতে উঠবে কোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে থেকে। আমরা মিনিট দশেক ওখানে অপেক্ষা করার পর শুভেন্দু এল। এই সুযোগে কোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তোরণদ্বারটি দেখা হল। সেখানে দেখলাম, মাননীয় সাংসদ এর বদান্যতায় মাত্র পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ করে ঐ তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে।
আমাদের ধারণা ছিল, নন্দীগ্রাম যেতে চার ঘন্টার বেশি সময় লাগবে; বাস্তবে আমরা তিন ঘন্টায় ই পৌঁছে গেলাম। ওখানে কিন্তু একটু হতাশ হতে হল; শিক্ষার্থীর সংখ্যা পঁচিশ ও হলনা। ফেরার পথে শুভেন্দু কে কোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে নামিয়ে আমি একাই কলকাতায় ফিরলাম।এর পরের বাকী জেলা গুলিতে আমি আর শুভেন্দু একা একাই যাব।

এবার সিউড়ি। বীরভূম জেলার আর রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার ডাক্তারবাবুদের ট্রেনিং। অনেক আগেই ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছি। প্রতিদিনই সকালে দেখি বাড়ীর সামনে দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস গাড়ীটা যায়। এবার ঐ গাড়ীতে আমদপুর হয়ে সিউড়ি যাব। খুব সকালে বাড়ী থেকে বের হতে হল। শিয়ালদা থেকে গাড়ী ছাড়ার সময় থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়েই গেল। বর্ধমান থেকে বেশ কিছু ডেইলি প্যাসেঞ্জার আমাদের রিজার্ভ কামরায় উঠে বসে পড়ল। ট্রেনও ক্রমশ লেট করতে থাকল। সাড়ে নটার গাড়ী প্রায় সাড়ে দশটায় আমেদপুর পৌঁছল। স্টেশনের বাইরে CMOH office এর গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। বৃষ্টি না থাকলেও আকাশ মেঘলা। পুরোটাই প্রায় দুপাশে ধানের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে রাস্তা। মাঝে মাঝেই একটা করে চাল কল। কোন চাল কল কোন নেতার বা নেতার আত্মীয়ের, ড্রাইভার সে সব আমাকে জানাতে জানাতে চলল। এগারোটা নাগাত সিউড়ি শহরে পৌঁছলেও, প্রসূন এর বাড়ী পৌছাতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। সব জেলা শহরের মত এখানেও রাস্তার তুলনায় গাড়ী বেশী।

প্রসূনের বাড়ী কেন? প্রসূন সিউড়ি সদর হাসপাতালের ডাক্তার; আমার আর এক প্রিয় ছাত্র। ওকেও এবার আমার আর এক সহপ্রশিক্ষক করে নিলাম। সিউড়ি শহরে গেলে ওর বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। প্রথমে যাওয়া হবে না বলেছিলাম। পরে মনে হল, বিরিয়ানী এড়াতে হলে প্রসূনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণটা নেওয়াই নিরাপদ। এই বিরিয়ানী এড়ানো ব্যাপারটা একটু বলা দরকার। এই সব প্রশিক্ষণ শিবিরে দুপুরে খাওয়ার ব্যাপার থাকলে , সাধারণত একটা বিরিয়ানীর প্যাকেট দিয়ে দেওয়া হয়। একটা জেলায় মাসে দু মাসে একদিন একটা অনুষ্ঠানে বিরিয়ানী খাওয়া চলতে পারে; কিন্তু আমি প্রতি সপ্তাহে দু তিনটি করে জেলায় ঘুরেছি; এখানে সব জায়গায় ঐ সব গুরুপাক খাওয়া কষ্টকর। তাই প্রসুনকে জানিয়েছিলাম, ওর বাড়ীতে মাছ ভাত খেয়ে তারপর অফিসে যাব। প্রসূনের বাড়ীতে ঢুকলাম ছাতা মাথায় দিয়ে। ওর বাড়ীতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েই ছুটলাম ক্লাশে।

অন্য জেলায় আগে গিয়ে বসে থাকতে হয়েছে। এখানে দশ মিনিট পরে ঢুকেও দেখি তখনও অর্ধেক লোক আসেনি। CMOH Sir একটু বিরক্ত ই হলেন। যদিও শুধু নতুন ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ, এখানেও একজন প্রায় অবসরের কাছে চলে আসা একজন এসে বিরক্তি প্রকাশ করেন। এই লোকগুলোকে কি ভেবে BMOH রা পাঠায় সত্যিই বোঝা যাচ্ছে না। বিকেলে আবার আমেদ পুরে ফেরার ট্রেন ধরতে হবে, তাই সময় হাতে রেখেই রওনা দিলাম। সিউড়ির মেজ মাসিও চলে গেছেন বছর চারেক হল। মাসীর ছেলে বিশ্বজিৎ ক্লাশ এর শেষে এসে দেখা করে গেল। সময় মত স্টেশন এ পৌছে গেলাম। হাওড়া হয়ে বাড়ী ফিরতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল।

এবার সাপের কামড় এর প্রশিক্ষণ দিতে দুবার উত্তর বঙ্গে গেলাম। তার আগে একদিন গেলাম কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট এ বলতে। ঐদিন সকালেই, আমার কম্পিউটার শিক্ষক হিমাদ্রী এসেছিল, ওর চোখ দেখাতে। হিমাদ্রী ঐ দিকেই থাকে, ওকে আসতে বললাম আমার বক্তৃতা শুনতে। কলকাতার মধ্যে এত বড় জায়গা নিয়ে এমন একটা কলেজ আছে, আমার জানা ছিল না। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের লোক এখানে আসে পড়তে। ওদের সাপের কামড় এর মত একটা প্রান্তিক জনগণের সমস্যা নিয়ে আগ্রহ থাকার কথা নয়। তবুও একশ জন মত শ্রোতা শুনলেন। ওদের জন্য আমার একটা বিশেষ বার্তা দেওয়ার ছিল। গোদা গোদা বাংলা সিনেমায় যেমন দেখায়, মুখ দিয়ে চুষে সাপের বিষ বেরকরে দিল, সেটা যে একেবারেই সম্ভব নয়, এতে সমাজে একটা ভুল বার্তা যাচ্ছে, এ খবরটা ওদের জানানো গেল।

এবার প্রথমে তিনদিন উত্তর বঙ্গে গিয়ে, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আর আলিপুর দুয়ারে বললাম। মাস দেড়েক আগে ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছি; দার্জিলিং মেলে গিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এ নামলাম। ওখান থেকে CMOH অফিসের গাড়িতে স্টেট গেস্ট হাউসে। সকালেই পৌঁছে গেলাম। স্নান করে নিচে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে প্রাতরাশ খেয়ে এলাম। এই গেষ্ট হাউসকেই এরা সার্কিট হাউস বলে। ওখান থেকে সাড়ে দশটায় বেরিয়ে গেলাম উত্তরকন্যায়। অনেক নাম শুনেছি, এবারই প্রথম ঢুকলাম ঐ বাড়িতে। শিলিগুড়িতে নেমে থেকেই মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছিল। উত্তরকন্যায় পৌঁছে গাড়ী থেকে নামতে নামতে CMOH এর সাথে আলাপ হল। উনি আমার কলেজের ভাই, আগে আলাপ ছিল না। বারোটার ক্লাশ বারোটা পনের নাগাত শুরু হল। এখানে OSD ডা রায় শুরু করলেন। খুবই সুন্দর কনফারেন্স রুমে ট্রেনিং হল। উত্তর কন্যায় খেয়ে বিকেলে স্টেট গেষ্ট হাউস এ ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় একটু হাঁটতে বেরনোর ইচ্ছা থাকলেও টিপ টিপ বৃষ্টির জন্য বেরনো হল না।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ বেরিয়ে জলপাইগুড়ি যাওয়ার কথা। শিলিগুড়িতে একদিনের বেশী থাকলাম আর বন্ধু প্রোফেসর গোস্বামীর বাড়ি যাব না, এ হয় না। সন্ধ্যায় ওর সাথে কথা বলে ঠিক করলাম, পরদিন সকালে ওর গাড়ী এসে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি ভোরে উঠে তৈরী, ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিলাম। বন্ধুর বাড়ী জলপাইগুড়ি যাওয়ার রাস্তায়, তাই গেষ্ট হাউস এ আর ফিরব না ঠিক করে ড্রাইভারকে ফোনে জানিয়ে দিলাম, আমাকে মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে তুলে নিতে। আমার হিসেবের প্রায় এক ঘন্টা পরে বন্ধুর গাড়ী নিতে এল। সকালে শহরের রাস্তা ফাঁকা পেলাম, আধ ঘন্টার কম সময়ে পৌঁছে গেলাম।

বন্ধুর এই বাড়িতে আমি আগে যাইনি। তাছাড়া এবার ওর নাতিটি ওখানে থাকায় ঘন্টা দুই খুব আনন্দে কাটিয়ে জলপাইগুড়ি যাওয়ার জন্য মেডিক্যাল কলেজের দিকে গেলাম। ওখানে কারো সাথে কথা বলার সময় ছিল না। তবুও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রোফেসর বেরার সাথে দেখা হয়ে গেল। সামান্য মিনিট চারেকের আলাপে বুঝলাম, ওনার সাপেদের সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ আছে। জলপাইগুড়িতে বারোটা থেকে ক্লাশ, তাই ইচ্ছা থাকলেও দু চার মিনিট বেশী থাকা গেল না।

জলপাইগুড়ি শহরে ঢোকার আগে পর্যন্ত বেশ ভালো চওড়া রাস্তা। কিন্তু শহরে ঢুকে দেখলাম, সেই ঘিঞ্জি রাস্তা। গোটা রাস্তাই টোটোর দখলে। এবার জেলায় জেলায় ঘুরে সব জায়গায়ই একই অবস্থা দেখলাম। শহরে ঢুকে ড্রাইভার হাসাপাতালের রাস্তা ভুলে যাওয়ায় বেশ এদিক ওদিক ঘুরে প্রায় বারোটায়ই পৌঁছলাম। OSD ডা রায় এর আপিসে এককাপ কফি খেয়ে ডেপুটি CMOH অফিসে চললাম। এখানে দেখলাম, নতুন মেডিকেল কলেজের দু একজন শিক্ষকও সাপের কামড় এর প্রশিক্ষণ নিতে এসেছেন। Anatomy বিভাগের বয়স্ক শিক্ষককে চিনতে পারলাম। এখানে ক্লাশ শেষ করে খেতে যাওয়ার আগে প্রায় দশ জন সাংবাদিক আমার কথা শুনতে চাইলেন। আমাদের এই চরম অবহেলিত বিষয় নিয়ে লোকে কিছু জানতে চায়, এটা দেখে ভালো লাগল। এখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন জলপাইগুড়ির বিখ্যাত সর্পবন্ধু মানস বন্ধু মজুমদার।

জলপাগুড়িতে দুপুরের খাওয়া শেষ করেই আলিপুর দুয়ারে যাওয়ার জন্য গাড়ীতে উঠিলাম। মানসবাবু ও চললেন আমার সাথে। এবারের উত্তরবঙ্গে এই রাস্তাটাই সবথেকে বেশী লম্বা ছিল। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা CMOH অফিসের গাড়িতে। মনসবাবু গাড়ীতে ওঠার আগেই একটা অনুরোধ করেছিলেন; যাওয়ার পথে সর্পবন্ধু নন্দবাবুর সাথে দেখা করে যেতে হবে। নন্দ বাবুর দলের ছেলেরা মূলত লোকালয়ে চলে আসা সাপেদের উদ্ধার করে জঙ্গলে ছাড়েন। এ বছর ওরা কুড়ি পঁচিশ টি কিং কোবরা সাপ উদ্ধার করেছেন জানালেন। সব জায়গায় যা শুনতে হয় এখানেও তাই। স্থানীয় হাসপাতাল নিয়ে অনেক অভিযোগ। ওনাদের ওখানে মিনিট দশেক থেকে আবার রওনা দিলাম। মানস বাবু ময়নাগুড়ি থেকেই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই গাড়ী আবার জলপাইগুড়ি ফিরে আসবে জেনে উনি আলিপুর দুয়ারে চললেন। সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত এই রাস্তাটা খুবই সুন্দর। গয়েরকাঁটা চা বাগানে আমি আগেও একবার গেছলাম। হাই ওয়ের পাশে পাশে মাইল এর পর মাইল সবুজ চা বাগান। আলো কমে এলেও, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ছবি তুললাম। এই গয়েরকাঁটা চা বাগানই সমরেশ মজুমদার মশাই এর স্বর্গছেঁড়া চা বাগান। ওখানে দাঁড়িয়ে ভাবতেই রোমাঞ্চ অনুভব করলাম।

রাস্তায় পড়ে মাদারীহাট। বছর পঁচিশ আগে একবার জলদাপাড়া জঙ্গল বেড়াতে এসে এই মাদারীহাট এর সরকারী ট্যুরিষ্ট লজে ছিলাম। মানস বাবু ওখানকার একটি বিশেষ দোকানের কমলা ভোগ মিষ্টির খুব সুখ্যাতি করলেন। ওখানে মিনিট পাঁচ দশ দাঁড়িয়ে সেই বিখ্যাত মিষ্টি আর চা খেয়ে আবার চললাম। এবার পুরোপুরিই সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাস্তাটাও ওদিকে একটু খারাপ। আরও বোধহয় দু ঘন্টা পর আলিপুরদুয়ারে পৌঁছলাম। আমাকে সার্কিট হাউসে পৌঁছে দিয়ে মানস বাবু জলাইগুড়িতে ফিরে গেলেন।

পরদিন ভোরে উঠে হাঁটতে বেরোলাম। সার্কিট হাউসে র পাশেই বিরাট প্যারেড গ্রাউন্ড। অনেকটা বহরমপুর এর স্কোয়ার ফিল্ড এর মত। গোটা মাঠটা একপাক ঘুরতেই প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগল। সকালে রাস্তাঘাট খুবই ফাঁকা। ঘন্টা খানেক হেঁটে একটা চায়ের গুমটি পেলাম। এই সার্কিট হাউসে স্নান করার সাবান নেই দেখেছি। অনেক খোঁজা খুঁজির পর একটা ছোট্ট দোকান খোলা পেলাম। সকালে স্নান সেরে তৈরী হওয়ার পর কৌশিকের বাড়ী রওনা হলাম। ওর বাড়ীতে সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার কথা ছিল। ওখানে গিয়ে দেখি ওরাও একটা ছোট খাট সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছে। ওরাও বেশ কয়েক বছর ধরে সাপের কামড় নিয়ে কাজ করছে। প্রথম দিকে শুধুই সাপ উদ্ধার করেছে; পরে সাপের কামড় এর সচেতনতা নিয়েও ভালো কাজ করছে। আগে একবার দুবার গেলেও আলিপুর দুয়ার শহরটা তেমন দেখা হয়নি। কৌশিকের বাড়ী র সামনে থেকে একটা টো টো ভাড়া করা হল। ওদের একটি ছেলে আমার সাথে চলল। মিনিট চল্লিশে শহরটা দেখা হল। শহরের ভেতরের কাল জানি নদীর সেতু পেরিয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে বিবেকানন্দ কলেজ দেখা হল। ফিরে চললাম শহর লাগোয়া একটি চা বাগান দেখতে। এই চা বাগান টি গয়েরকাঁটা চা বাগান এর দশ ভাগের একভাগ হবে মনে হয়। বাইরে থেকে একটা চা কারখানাও দেখা গেল।

দুপুর বারোটার আগে CMOH আপিসে পৌঁছে গেলাম। এখানকার ক্লাশে কুচবিহার জেলার ডাক্তার বাবুদেরও ডাকা ছিল। তাই ঘর ভর্তি ছিল। ওখানেই খেয়ে সার্কিট হাউসে ফিরে এলাম। বিকেলের পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছিলাম। ঐ গাড়ী ছাড়ার সাথে সাথে এবারের উত্তরবঙ্গে ভ্রমণের প্রথম পর্ব শেষ হল।

বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ী ফিরে এলাম। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে। ঐ দিন রাত্রে হাসপাতালে ডিউটি। শনি রবি দুদিন সকালে ডিউটি করে আবার রবিবার রাত্রের ট্রেনে রওনা দিলাম, মালদার উদ্দেশ্যে। এবার গঙ্গারামপুর, মালদা আর জঙ্গিপুরের তিনটি ক্লাশ। সকাল বেলায় মালদা ষ্টেশনে নেমে CMOH আপিসের গাড়ীতে সার্কিট হাউসে গেলাম। ওখানে স্নান সেরে ঘন্টা তিনেক পরে ঐ একই গাড়ীতে রওনা দিলাম গঙ্গারামপুর।
রাস্তা প্রায় পুরোটাই বেশ ভালো, গাজলের ভেতরে একশ মিটার মত রাস্তা ভয়ংকর ভাবে ভাঙ্গা। গঙ্গারামপুর আমার চেনা জায়গা। পুনর্ভবা নদীর সেতু পেরিয়ে আর গাড়ী চলার রাস্তাই যেন নেই। গোটা রাস্তা টোটোর দখলে। নদী থেকে হাসপাতাল দেড় কিমি রাস্তা যেতে মিনিট কুড়ি সময় লাগল। হাসপাতাল চত্বর যেন মেলা; গাড়ী রাখার জায়গা নেই। এই রকম লোকের মেলা থাকবে আশা করেই নিতাইবাবুকে আমার সাথে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের দুজনেরই, আগের দিন সন্ধ্যায়ই নিতাই বাবু ফোন করে জানিয়েছেন, শরীর ভালো নেই। সকালেও ফোন করে জানিয়েছেন, সুস্থ হননি, ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছেন। মালদার সর্পবন্ধু নিতাই হালদারবাবু মাঝে মাঝেই ফোন করে নানা রকম সমস্যার কথা বলেন। এবার মালদা হয়ে গঙ্গারামপুর যাওয়ার পরিকল্পনা হতেই ওনাকে বলেছিলাম, চলুন, ওখানে হাসপাতালে রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে প্রচার করবেন। এ কাজটা করতে উনি ভালোবাসেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রকম কাজ করতে গিয়েই উনি বিপদে পড়ে গেলেন। ঐ দিনই মালদা হাসপাতালে একটি সাপে কাটা রোগীর মৃত্যু হলে বেশ অশান্তি সৃষ্টি হয়। নিতাই বাবু সেই সময় উপস্থিত হলে পুলিশ ওনাকে আটক করে। শুধু আটকানোই নয়, বেশ মারধরও করে। এসব খবর আমি পরে জেনেছি মালদা মেডিক্যাল কলেজের MSVP, আমার বন্ধু ডা সাহার ফোনে।
গঙ্গারামপুর হসপিটাল এ ক্লাশ শুরু হতে একটু দেরী হল, CMOH অফিসের লোকজন দেরী করে আসায়। ওখানে আমার সহ প্রশিক্ষক ডা ভৌমিক খুবই উৎসাহী মানুষ। ছোট ঘরে এত বেশী লোক হয়ে গেল যে অনেকে ঢুকতেই পারেনি, পরে শুনেছি। এখানেও দুই দিনাজপুর জেলার ডাক্তার বাবুরা প্রশিক্ষণ নিতে এসেছেন। আমার পুরোনো জায়গা ইটাহার থেকেও দুজন ডাক্তার বাবু এসেছিলেন। সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল, একবার ইটাহার ঘুরে আসতে পারলে বেশ হয়। বিকেলে ফেরার সময় ড্রাইভারকে কথাটা বললে উনি রাজী হয়ে গেলেন। ফেরার পথে সোজা গাজল না এসে মাঝখান থেকে ডান দিকের রাস্তা ধরলাম। প্রায় সূর্য ডোবার আগে ইটাহার পৌঁছলাম। আগের সে হাসপাতাল এখন অনেক বড় হয়েছে। বাড়ী ঘর অনেক বেড়েছে। আমি যে কোয়ার্টারে থাকতাম সেখানেই সোজা গেলাম। এখন যে ডাক্তারবাবু থাকেন তিনি আমার পরিচিত হলেও সে সময় কোয়ার্টারে ছিলেন না। ওনার স্ত্রীকে পরিচয় দিয়ে, আমার লাগানো জলপাই গাছ আর কামিনী ফুলের গাছের ছবি তুললাম। চলেই আসছিলাম আমার পরিচিত বর্তমান BMOH আছেন জেনে আবার হাসপাতাল ঢুকলাম। ওর সাথে কথা বলতে বলতে হাসপাতাল চত্তরের চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। সেই প্রায় তেইশ বছর আগে দেখা দোকানদার আমাকে চিনতে পারল। ওখানে বসে বিকাশ বাবুকে ফোনে পেয়ে গেলাম। বিকাশবাবু ওখানকার প্রাক্তন কর্মচারী, আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। বিকাসবাবু এলে আরও মিনিট দশেক গল্প করে উঠলাম। ঘন্টা খানেক লাগল মালদা ফিরতে।
মালদায় ঢুকেই দেখেছি, রাস্তা জুড়ে ম্যারাপ বেঁধে বেঁধে নানান দোকান পাটের বিজ্ঞাপন। ছোট বড় সব রাস্তা জুড়েই, দশ পনের ফুট অন্তর অন্তর বিজ্ঞাপন। পূজার আগে অনেক কটা জেলা শহর ঘুরলাম, মালদার মত এত বিজ্ঞাপন আর কোথাও দেখিনি। সন্ধ্যা সাতটার পরে আমার বন্ধু উৎপল এল গল্প করতে। ওর সাথে ঘটা দেড় দুই গল্প হল। পরদিন সকালে এলেন ডেপুটি CMOH2 ডা মন্ডল। এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে চললাম মালদা মেডিকেল কলেজে। লিফটের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল প্রিন্সিপাল স্যার এর সাথে। উনিও আমাদের সাপের কামড় এর হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে আছেন। মালদায় ও ভালো হল ট্রেনিং। দুপুরের পর সার্কিট হাউসে ফিরে এলাম। বিকেলে জঙ্গিপুর যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরতে স্টেশনে এলাম। মালদা থেকে জঙ্গিপুর ট্রেনে দু ঘন্টা। সন্ধ্যার ট্রেন , বাইরে দেখার মত কিছুই নেই। প্রায় ঠিক সময়েই জঙ্গিপুর পৌঁছলাম। সরকারী গাড়ী ষ্টেশন এর বাইরে দাঁড়িয়েই ছিল; সোজা হোটেলে উঠলাম। এ বছর এই প্রথম কোন বেসরকারি হোটেলে থাকলাম। জঙ্গিপুরের ACMOH আপিসের ওপরে একটা গেষ্ট হাউস আছে জানতাম; পড়ে জানলাম ঐ সময়ে ঐ গেষ্ট হাউস এর পাম্প খারাপ থাকায় বেসরকারি হোটেলে থাকতে হল। সকালে উঠে বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম, গঙ্গা নদী দেখতে। নদীর ওপর সেতু, সেতুর ওপর থেকে গঙ্গা নদী দেখতে সুন্দর হওয়া উচিত। কিন্তু সেতুর মাঝামাঝি পৌঁছনোর আগেই একটু একটু করে বৃষ্টি শুরু হল। সেতুর উপর মিনিট খানেকের বেশী থাকা হল না। হোটেলে ফিরে স্নান সেরে তৈরী হওয়ার পর ই গাড়ী এসে গেল। SDO আপিসের বড় মিটিং হলে ট্রেনিং হল। লোক ভালোই হয়েছিল। ওখানেই মাছ ভাত খেয়ে গাড়িতে লালগোলা স্টেশনে ট্রেন ধরতে রওনা হলাম। স্টেশনে গাড়ী দেওয়ার আগেই পৌঁছে গেলাম। ঠিক সময় গাড়ী ছাড়ল। এবারের মত উত্তর বঙ্গের ভ্রমণ সেরে রাত নটার পর বাড়ী ফিরলাম।

আর দুটি জেলায় আমার যাওয়ার ছিল। এক শনিবার সকালে গাড়ী করে রওনা দিলাম বর্ধমান। ভবানী ম্যাডাম কে তাঁর ফ্ল্যাটের নিচে থেকে নেওয়া হল। বর্ধমান শহরও আর যে কোন জেল্য শহরের মত ঘিঞ্জি; টোটো আর টোটো। অনেক কষ্টে CMOH আপিসে পৌঁছে দেখা গেল সব সুনসান। এদিক ওদিক ফোন করে জানা গেল, ক্লাশ অন্য জায়গায়; বড় রাস্তার ওপর সে আপিসের সামনে দিয়েই আমরা এসেছি, অন্তত পনের মিনিট আগে। আবার সে বিরক্তিকর রাস্তা দিয়ে ফিরে চললাম। সে আপিসে পৌঁছে দেখা গেল, কোন আধিকারিক নেই, একজন সাধারণ কর্মচারীকে দ্বায়িত্ব দিয়ে বড় বড় অফিসার সব বড় বড় কাজে ব্যস্ত। এবারকার আমার ঘোরা তেরোটি জেলার মধ্যে সবথেকে বাজে অভিজ্ঞতা হল। করার কিছুই নেই। ক্লাশ শুরু হল। একজন লেডি ডাক্তারকে একটা প্রশ্ন করে বুঝলাম, কিছুই শুনছেন না। জানা গেল, উনি কোন এক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আয়ুশ ডাক্তার, কোনদিন ইনডোর এ কাজ করেন নি। ওনার BMOH একজনকে পাঠাতে হয় তাই পাঠিয়েছেন। ক্লাশের মাঝে এলেন, ভাতার হাসপাতালের BMOH ডা সংঘামিত্রা।COVID অতিমারির জন্য আমার সাথে মাঝে বছর তিনেক দেখা হয়নি। আমার অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী। এখন গোটা রাজ্যের যত BMOH কে চিনি, সবথেকে করিৎকর্মা। ক্লাশের শেষে ওর সাথে অনেক কথা হল। ভবানী ম্যাডাম কে শহরের ভেতরের এক জায়গায় ওনার দাদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমরা ফেরার রাস্তা ধরলাম। যাওয়ার সময় আর ফেরার সময়, দু বাড়ী কার্জন গেট এর সামনে দিয়ে গাড়ি গেল। কোনোদিনই ওখানে নেমে ঐ স্থাপত্যটি দেখা হয়নি। এখন গেটের দু পাশে রাজা আর রানীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বাড়ী ফিরে এলাম। বর্ধমান আর কলকাতায় কোন বৃষ্টি ছিলনা, কিন্তু মাঝে ডানকুনির কাছে প্রচুর বৃষ্টি হল।

আমার শেষ ক্লাশ ছিল কৃষ্ণনগর এ। বাড়ীর সামনে থেকে একটা লোকাল ট্রেন প্রতিদিন সকালে ছাড়ে দেখি, ওটাতেই গেলাম।লোকাল ট্রেন হলেও , ভাঙ্গা রাস্তায় গাড়ীতে যাওয়ার থেকে ভাল।ঠিক সময়েই পৌঁছলাম। এখানে এখন CMOH আর ডেপুটি একজনই। উনি ক্লাশ শুরু করে দিয়ে আপিসে চলে গেলেন, ফেরার সময় আর আমার সাথে দেখা হল না। কৃষ্ণনগর শহরেও সরু রাস্তার জন্য প্রায় ট্রেন ফেল করার মত অবস্থা হয়েছিল।লোকাল ট্রেনে বেশ কষ্ট করে ই ফিরতে হয়েছে।

পরদিনই রানাঘাটে একটা অন্য রকম কাজ ছিল। রানাঘাটের SDO আপিসের একজন আধিকারিক উদ্যোগ নিয়ে একটা জন সচেতনতার সভা আয়োজন করেছিলেন। কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার সময় ওখানে থেকে যেতে পারি জানিয়েছিলাম, কোন কারণে ওরা সে ব্যবস্থা করেননি। যাইহোক রানাঘাটে ঐ লোকাল ট্রেনেই গেলাম। ওনার বেশ খাতির যত্ন করলেন। অনুষ্ঠান যাই হোক, ওখানকার দুটি ব্যাপার বহুদিন মনে থাকবে। স্টেশন থেকে সেই টোটো ঠাসা রাস্তা দিয়ে গাড়িতে যাওয়ার সময় জানলাম, ওখানকার SDO একজন ডাক্তার। বছর চল্লিশের ভদ্রলোকটি ছিলেন অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ। কেন যে এমন একজন স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে নিজের পেশা ছেড়ে আসতে হল, জানা হয়নি।

SDO সাহেবের বাস স্থানে দুপুরে খেতে গিয়ে জনলাম ওটি একটি ঐতিহাসিক বাড়ী। কবি নবীন চন্দ্র সেন মশাই ওখানে SDO বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় , কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার ওখানে এসেছিলেন। ১৮৯৪ সালে। সেই ঘটনার শত বার্ষিকী উপলক্ষে ঐ বাড়ীর বাগানে দুই কবির মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এবারের মত সাপের কামড় এর ভ্রমণ শেষ হল একম একটি বিখ্যাত মণীষীদের স্মৃতি বিজড়িত জায়গায়। আমার প্রিয় একটি কাজ এমন সুন্দর এক জায়গায় শেষ করে ভালো লাগছে।

হাজার রামায়নের গল্প

অশেষ পূণ্যবলে মহাভারত সম্বন্ধে আগ্রহ তৈরী হয়েছে আমার। আর এই অমৃতকথা শোনার আগ্রহ হয়েছে আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই এর লেখা পড়ার থেকে। মহাভারতের কাহিনী আর ঘটনা যতটা আজ পর্যন্ত পড়েছি বা জেনেছি তার এক শতাংশও রামায়নের ক্ষেত্রে হয়নি। আজই সকালে ভাদুড়ী মশাই এর কথকতা শুনতে গিয়েই রামায়নের একটি অজানা গল্প শুনলাম।

প্রসঙ্গটি এসেছে, কত রকম রামারণ আছে , সেই নিয়ে আলোচনার সময়। আরও মজার কথা হল, রামানুজন নামে একজন পৃথিবী বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন জানতাম; ঐ নামে যে একজন বিখ্যাত দার্শনিকও ছিলেন, আমি আজই জানলাম। ভাদুড়ী মশাই বসে বসে প্রায় কুড়ি পঁচিশ রকমের রামায়নের নাম বলে গেলেন। এখনও সম্ভবত তিনশ রকমের রামায়নের খোঁজ পাওয়া যায়। আবার কেউ কেউ বলেন , তিন হাজার রকমের রামায়ন আছে। এই আলোচনাতেই এল আমার নতুন জানা গল্পটি।

রাজা রামচন্দ্র রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সুনামের সঙ্গে রাজ্যের শাসন কাজ চালাচ্ছেন। এমন একদিন অসাবধানে রাজার হাত থেকে একটি রাম নাম লেখা আংটি মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেল। ভগবানের পায়ের কাছে বসে ছিলেন ভক্ত হনুমান। উনিও চমকে উঠে দেখলেন , আংটিটি গড়িয়ে গিয়ে একটি সরু গর্তে ঢুকে গেল। রাজা রামচন্দ্র বললেন, হনুমান , আমার আংটি ফিরিয়ে আন। গোটা গন্ধমাদন পর্বত যিনি তুলে আনতে পারেন, তাঁর কাছে এ আর কঠিন কাজ কি! ভক্ত হনুমান প্রভুর নাম নিয়ে ক্ষুদ্র দেহ ধরে সেই গর্তে ঢুকে পড়লেন। গর্তের মধ্যে যতই নেমে যান গর্ত আর শেষ হয়না। হনুমান চলেছেন তো চলেছেন। একসময় উনি যেন একটু নিচে ধুপ করে পড়লেন। ওখানে কিছু মহিলারা কাজ কর্ম করছিলেন। তারা বললেন, আরে দেখ দেখ, একটা ছোট্ট বাঁদর কোথা থেকে এই পাতালে এসে পড়ল! হনুমান জানলেন, তিনি আংটির খোঁজে পাতালে এসে পৌঁছেছেন। মহিলারা কদিন ঐ ক্ষুদ্র বাঁদর নিয়ে মজা করে খেললেন। তারপর একদিন ঐ ক্ষুদ্র বাঁদরটিকে তাঁদের রাজার খাওয়ার থালায়, অন্যান্য অনেক খাওয়ার এর সাথে সাজিয়ে, রাজাকে খেতে দিল। হনুমান চাইছিলেন, ভূতের রাজার সাথে দেখা করতে। আংটির খোঁজ পেতে হলে, রাজার সাথেই দেখা করতে হবে, এটা উনি ভালোই বুঝেছিলেন। রাজাও খাওয়ার হিসেবে এরকম সুন্দর একটি প্রাণী পেয়ে বেশ মজা পেলেন। উনি হনুমানকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে আমার এই পাতাল রাজ্যে এলে? হনুমান জানালেন, তিনি তাঁর প্রভু , ভগবান রামচন্দ্রের আংটি ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। ভূতের রাজার বুঝতে অসুবিধা হলনা ব্যাপারটি। উনি হনুমানকে একটি বিশেষ ঘরে নিয়ে গেলেন।

সেখানে একটি বিরাট থালায় কয়েক হাজার আংটি রাখা আছে। সব আংটি একই রকম। সবকটিতেই রাম নাম লেখা। ভূতের রাজা বললেন, তোমার প্রভুর আংটি বেছে নিয়ে চলে যাও। হনুমান দেখলেন , অসম্ভব, এই হাজার আংটির মধ্যে কোনটি তাঁর প্রভুর আংটি, বোঝা সম্ভব নয়। তিনি তখন ভূতের রাজাকেই করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন, আংটি খুঁজে দিতে। ভূতের রাজা তখন ঐ বিরাট থালায় হাজার হাজার আংটির রহস্য জানালেন। তিনি হনুমানকে বললেন, তুমি আংটি খুঁজে পেলেও তোমার প্রভুকে আর দেখতে পাবে না। এই যে এত আংটি দেখছ , এ সবই যুগে যুগে যত রামচন্দ্র মর্তে এসেছেন , তাঁদের আংটি। তাঁদের মর্তলিলা শেষ হওয়ার সময় , প্রত্যেকবারই তাঁদের আংটি খুলে পড়ে পাতালে এসে, এই থালায় জমা পড়েছে। তুমি মর্তে ফিরে যাও, দেখ তোমার প্রভু আছেন কি না।

হনুমান ফিরে এলেন। দেখলেন , সেই রামও নেই, সে রামরাজ্যও নেই। বহু বছর আগে ভগবান রামচন্দ্র দুই পুত্র লব আর কুশকে রাজ্য ভাগকরে দিয়ে, সরজু নদীতে লীলাসম্বরণ করেছেন। ঐ যে, পাতালের থালায় কয়েক হাজার রাম নাম লেখা আংটি আছে, সেরকমই কয়েক হাজার রামায়ণও আছে। ৩.৮.২০২৪.

ভেন্ডার কামরায়

কলকাতার শহরতলীতে আমার প্রায় পঁচিশ বছর থাকা হয়ে গেল। এই পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বার শহরতলীর লোকাল ট্রেনে চড়েছি। আরও আগে, সেই 1976 সাল থেকেই এই সব লোকাল ট্রেনে আমার যাতায়াত। তবে কিনা, এই সব ট্রেনে যে আলাদা করে একটি বা দুটি ভেন্ডার কামরা থাকে, সেটা ঠিকঠাক বুঝেছি এই শেষ বছর পঁচিশ আগে। ভেন্ডার কামরা মানে , মাল পত্র নিয়ে ওঠার জন্য নির্দিষ্ট একটি ট্রেনের কামরা। এই কামরায় ওঠার বিশেষ কিছু নিয়ম বা আইন থাকলেও সে আইন আমার জানা নেই। আর শহরতলীর ট্রেনে সেসব আইন না মানাটাই আইন। বিশেষ করে অফিস টাইমের ট্রেন বলে এক ভয়ংকর ভিড়ে ঠাসা ব্যাপার আছে; সেই সময় কোন বিশেষ আইন বা নিয়ম কেউ মানেও না, মানা সম্ভবও হয় না। অফিস টাইমের ট্রেন বলতে মোটামুটি যা বোঝায় , তা হল কলকাতায় সরকারী অফিস খোলার সময় সেই অফিসে কাজ করতে আসা কর্মচারীরা কলকাতার দিকে যে ট্রেনে করে আসে ,আর আপিস ছুটির সময় যে সব ট্রেন কলকাতার দিক থেকে বাইরের দিকে যায়। বাস্তবে কয়েক বছর আগে থেকেই দেখছি, এই আপিস টাইম ব্যাপারটা আর সরকারী অফিস এর উপর নির্ভর করছে না। সরকারী অফিস ছাড়াও হাজারো কাজ কর্মে লোকে শহরের বাইরে থেকে শহরের দিকে আসে। তাই সকালের দিকে কলকাতামুখি আর বিকেলের দিকে উল্টো দিকের ট্রেন মানেই ঐ দম বন্ধ করে দেওয়া ভিড়। ঐ সময়গুলিতে আজকাল আর ভেন্ডার কামরা বলে আলাদা কিছু বোঝার উপায় নেই। সব কামরাতেই গাদাগাদি লোকের ভিড়। এই সময়গুলোতে ভেন্ডার কামরায়ও মালপত্র নিয়ে ওঠার সুযোগই থাকে না। এই যে ' মালপত্র ' কথাটা বারবার বলছি, এটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। আপনি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন, সাথে একটি বড় ট্রলি ব্যাগ, আরও ছোটখাট দু' একটা ব্যাগ বা পোটলা থাকতেই পারে ; এগুলি কিন্তু ঐ ভেন্ডার কামরায় নেওয়ার মালপত্র বলতে যা বোঝায় , সেই জিনিস নয়। সম্ভবত রেলের নিয়মে, যে সব ব্যবসায়িক বড় বোঝা নিয়ে রেলে যাতায়াত করতে হলে আলাদা করে ' মালের জন্য ভাড়া ' দিতে হয় , সেই সব ভাড়া দেওয়া মালপত্রই বৈধ ভাবে ঐ ভেন্ডার কামরায় নেওয়ার কথা। মাঝে মাঝে শুনি, সাধারণ যাত্রী টিকেট নিয়ে ভেন্ডার কামরায় ওঠা বেআইনী। ব্যাপারটা আমার ঠিক জানা নেই। আমি সচেতন ভাবে কখনও ভেন্ডার কামরায় উঠতে চাই না। কিন্তু এক এক সময় পরিস্থিতি এমনই হয় যে, প্লাটফর্মে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক সেই জায়গায় ভেন্ডার কামরা পড়ে গেল; প্লাটফর্মে প্রচণ্ড ভিড় থাকলে, পরের দরজায় যাওয়ার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিতে পারে। সে রকম ব্যতিক্রমী দুই এক বারই আমি ভেন্ডার কামরায় উঠতে বাধ্য হয়েছি। তার আগে, ঐ যে আইন এর কথা বলছিলাম, সেটা সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা জানাই। অনেক বছর ধরেই শহরতলীর ট্রেন পরিষেবায় , লেডিস স্পেশাল, অর্থাৎ শুধুই মহিলা যাত্রীদের জন্য পুরো ট্রেনই সংরক্ষিত , এরকম কিছু ট্রেন চালু হয়েছে। বিশেষ করে ঐ অফিস টাইমের প্রচণ্ড ভিড়ের সময়ে দুই এক জন পুরুষ যাত্রী ঐ লেডিস স্পেশাল ট্রেনে উঠে পড়েন। সাধারণত বয়স্ক মানুষ হলে, কিংবা ভদ্রলোক বুঝতে না পেরে উঠে পড়েছেন বুঝলে, মহিলারা সেরকম কিছু বলেন না। যারা না বুঝে উঠে পড়েন, তারাও নিজের ভুল বুঝে, পরের স্টেশনেই নেমে যান। কিন্তু বেশ কিছু বছর থেকেই দেখছি। অফিস টাইমে, ঐ লেডিস স্পেশাল ট্রেনের ভেন্ডার কামরায় শুধু পুরুষ যাত্রীরাই যাতায়াত করেন। সাধারণ ভাবে ঐ ভেন্ডার কামরায় পুরুষদের ওঠা ব্যাপারটা যেন আইনসিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে বিশেষ ধরপাকড় হয়; সে সময় লেডিস স্পেশাল ট্রেনে চাপার অপরাধে কিছু পুরুষ যাত্রীকে রেল পুলিশ আটক করে, জরিমানাও করে। সম্ভবত এই ব্যতিক্রমী ব্যাপারটিকে নিয়েই, সাধারণ যাত্রীর ভেন্ডার কামরায় ওঠা বেআইনী, এই কথাটা চালু হয়ে গেছে।

ভেন্ডার কামরার বৈশিষ্ট কি? খালি ট্রেন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়, আমি ভেন্ডার কামরায় উঁকি দিয়ে দেখেছি, অনেকবার। এই কামরার ভেতরে বসার আসনগুলি শুধুই কামরার দেওয়াল ঘেঁসে লম্বালম্বি করে সাজানো। মাঝখানে বড় বড় বোঝা ইত্যাদি রাখার জন্য অনেকটা জায়গা থাকে। বড় বড় বোঝা, ঝুড়ি এমনকি খাট পালঙ্কের এক একটি ভাগ তোলার সুবিধার জন্য দরজার মাঝের লম্বা ধাতব খুঁটি থাকে না। আজকাল অবশ্য কখনও কখনও সাধারণ যাত্রী কামরার বসার আসনও ঐ ভাবে দেওয়াল ঘেঁসে লম্বালম্বি করে সাজানো দেখেছি। ঐ রকম কামরায় উঠতে গিয়েও অনেকে ওটাকে ভেন্ডার কামরা ভেবে অন্য কামরায় চলে যায়। ওঠার পর, কখনও কখনও বাইরে থেকেও একটা পুরনো পচা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগলেই বোঝা যায়, ওটা ভেন্ডার কামরা। আমি যে কয়েকবার নানান কারণে এই ভেন্ডার কামরায় উঠে দুই একটা স্টেশন গিয়েছি, চোখ - কান - নাক খোলা থাকার জন্য, ঐ কামরার ভিন্ন পরিবেশ লক্ষ করেছি। চাপে পড়ে, কিংবা শুধুই বিড়ি সিগারেট খাওয়া নিয়ে কেউ কিছু বলে না তাই,কিছু তথাকথিত ভদ্রলোক ভেন্ডারে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়; কিন্তু ঐ ভেন্ডার কামরায় একটি সম্পূর্ন আলাদা সমাজ ব্যবস্থা। মূলত কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলির ওখানে নিয়মিত যাতায়াত। ওদের নিজেদের কথা বলার ধরণ আলাদা, পোষাক আসাক আলাদা, খাদ্য তালিকায় যাত্রি কামরার লোকেদের থেকে আলাদা রকম সকম। ওদের রসিকতা ঠিক পাশের কামরার মানুষগুলির থেকে আলাদা। ওদের ধুমপান মূলত বিড়ি। অবশ্য সিগারেট খাওয়ার সুযোগ থাকে বলেই, তথাকথিত ভদ্রলোক, বাবু শ্রেণীর মানুষেরা ঐ পচা দুর্গন্ধওয়ালা কামড়ায়

যাতায়াত করেন। ঐ একটি, বা দুই মাথায় অর্ধেক অর্ধেক ভেন্ডার কামরা, যেন গোটা ট্রেনের থেকে আলাদা একটি জগৎ। আমি নিজের তিনটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ জগতের যে সব বিচিত্র রকমের জীবন লক্ষ করেছি, তার বাইরেও ঐ কামরায় নিয়মিত যাতায়াত করেছেন, এমন কিছু মানুষের কাছেও অনেক গল্প কাহিনী শুনেছি। আসলে এই ভেন্ডার কামরা নিয়েই একটি উপন্যাস লেখা যায়। বা ভালো রকমের একটি তথ্য চিত্র তৈরী করা যায়। বারাকপুরের এক ভদ্রলোক এক সময় ঐ কামরায় নিয়মিত যাতায়াত করেছেন। উনি সে সময় বেশ কিছু টাকাপয়সা নিয়ে, কলকাতার বাজারে, ব্যবসার কাজে যেতেন। উনি বলেছিলেন, ঐ কামরার পুরনো যাত্রীরাই ওনাকে প্রায় শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন। ওনারাই ওকে বলেছিলেন, টাকাপয়সা নিয়ে মার্কেটে যাওয়ার সময়, জেনারেল কামরায় যাস না, ওখানে পকেটমার তোর টাকা নিয়ে নেবে। ভেন্ডার কামরায় ভুল করেও কোনো পকেটমার উঠবে না।
এবার আমার দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। বছর দুই আগে, হাসপাতাল থেকে ফেরার সময়, পার্ক সার্কাস ষ্টেশন থেকে ভেন্ডার কামরায় উঠেছিলাম। একটাই ষ্টেশন; ঠিকমত গাড়ী চললে মিনিট সাতেক লাগে। কখনও কখনও একটা সিগন্যাল এ দাঁড়ালে দশ বারো মিনিট। সেদিন ঐ কামরায় তেমন ভিড় ছিল না। আমরা এটুকু রাস্তার জন্য সাধারনত ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতাম না। উঠেই শুনি একজন ফেরিওয়ালা কি একটা নতুন জিনিস বিক্রী করছে। নাম বলছে, " জাঙ্গী হরীতকী।" ট্রেনের ফেরিওয়ালার মার্কামারা ' সাড়ে বত্রিশ রকমের উপকার হবে ' বলে নিজের জিনিস বিক্রী করছে। ঐ যেমন বলে, ক্ষিদা বাড়বে, ঘুম ভালো হবে, চোয়া ঢেকুর কমবে, মেয়েদের গোপন রোগ সারবে, চাই কি লুকানো ক্যান্সার সারিয়ে তুলতে পারে, ইত্যাদী। এসব শুনতে , আমার মত ঐ কামরার প্রায় সবাই অভ্যস্ত। শিয়ালদা স্টেশনে ঢোকার আগে, হাঁটুর উপরে লুঙ্গী তোলা একজন, পরিশ্রমী মানুষ , এই বিশেষ হরীতকী বিক্রেতাকে একটি মোক্ষম প্রশ্ন করে ফেলল। চূড়ান্ত আদি রসাত্মক সেই প্রশ্ন, লোকটি কি অনায়াসে, উদাত্ত কন্ঠে সকলকে শুনিয়ে করে ফেলল; একমাত্র ঐ ভেন্ডার কামরায় নিয়মিত যাতায়াত না করলে ভাবাও যাবে না।
আর একবার, সে প্রায় বছর পনের আগে; আমরা চারজন জোয়ান লোক, লোকাল ট্রেনে কৃষ্ণনগর থেকে ফিরছিলাম। আমার সাথে আমার বড় ভাইপো আর আমাদের দুই জামাই। যাওয়ার সময় শিয়ালদা থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ওরা তিনজন বসে এসেছিল; আমি বারাকপুর থেকে উঠে, ওদের সাথে তিনজনের সিটে চার জন বসে গেছলাম। ফেরার সময়, ট্রেন প্লাটফর্মে ঢোকার আগেই দেখেছি, অসম্ভব ভিড়। উঠে সিট পাবো কি না জানিনা। যে যেখানে সিট পাবো বসে পড়তে হবে, এরকম কথা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে আমাদের সামনে ভেন্ডার কামরা পড়ে গেল। ঐ ভিড়ে, অন্য দরজায় যাওয়ার চেষ্টাই করা গেল না। আসলে ঐ জায়গায় ভেন্ডার কামরা পড়ে, এটা ওখান থেকে যারা নিয়মিত ওঠে তারা জানে। তাই ঐ জায়গায় ভিড় একটু কম ছিল। আমরা উঠে ঐ দেওয়াল ঘেঁসে লম্বালম্বি করে সাজানো সিটে বসেও পড়লাম। আর প্রায় কেউ উঠলো না। একটি ছেলে উঠে আমাদের ভালো ভাবেই বলল, এটা ভেন্ডার কামরা, পরের স্টেশনে ছানা উঠবে, এখানে থাকতে পারবেন না, এখানেই নেমে পরের কামরায় চলে যান। আমরা তখন কাজ সেরে ফিরছি, ছানার জলকে আর ভয় কি, এসব ভেবে বসেই থেকে গেলাম। আর তখন নেমে পরের কামরায় গিয়ে, ভিড়ে ঢুকতেই হয়তো পারবো না। নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করলাম, সিটের উপর তো আর ছানা রাখছে না, আমরা বসেই থাকি। পরের স্টেশনে ট্রেন পৌঁছতেই টের পেলাম, ঐ ছেলেটি কেন নেমে যেতে বলেছিল। শ, থানেক লোক, বড় বড় কাপড়ের পোটলা করে ছানা তুলছে তো তুলছেই। আমরা যে সিটে বসে ছিলাম তার উপর প্রায় তিন চার থাক করে ছানা সাজিয়ে ফেলল। তখন সিটে বসে থাকা তো দূরের কথা, দৌড়ে ট্রেন থেকে নামতে নামতেই আমাদের সবার প্যান্ট ছানার জলে ভিজে একাকার। কোন রকমে পরের দরজায় উঠে দাঁড়াতে পারলাম। বারাকপুর পর্যন্ত গোটা রাস্তা চারজনে দাঁড়িয়েই ফিরেছিলাম। ৫.১২.২৪.

আমার ভোলাদা

আমার বন্ধু ভোলাদা, আমার ছেলের ভোলাদা জ্যেঠু। মেদিনীপুরের বিখ্যাত ভোলা রায়। আমাকে শিখিয়েছিলেন, কাজের বাইরে ," পঞ্চায়েতি " করতে। সেই বনের মোষ তাড়ানো পঞ্চায়েতি করতে গিয়েই একদিন অকালে চলে গেলেন। আমি এখনও মোষ তাড়ানোর নেশা থেকে বের হতে পারিনি। আজও মনে আছে সেই প্রথম দিনের কথা। ডাক্তারী পাশ করেছি, সরকারী চাকরীর কোন খবরই নেই। বাড়ীর থেকে টাকা নিয়ে একটা চেম্বার খুলে বসব সেরকম কোন সম্ভাবনা নেই। ১৯৮৭ সালের শেষ দিনটাতে ভোলাদার ল্যাবরেটরিতে আসতে বললেন কলেজের এক দাদা। ল্যাবরেটরির উল্টো দিকে, ঐ দাদার একটা চেম্বার ভাড়া নেওয়া ছিল; সেটার অর্ধেকে আমি বসতে পারি। মনে আছে, মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া ফেরার পুরো ভাড়াও ছিল না। মায়ের কাছে কুড়ি টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। পরের সপ্তাহে মেদিনীপুরে চলে এলাম। চেম্বারের চেয়ার টেবিল এর ব্যবস্থা করে দিলেন ভোলাদা। একটু একটু করে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে হয়েছে। শহরের অনেক পুরনো চোখের ডাক্তারদের পাশে , নতুন আর একটা ডাক্তারের চেম্বারে রুগী আসতেই চায় না। সে সময় ওনার পরিচিত লোকজনকে উনি আমার কাছে পাঠাতেন। মাস দুইয়ের মধ্যে আমার সেই কলেজের দাদার চেম্বারে একটা ঝামেলা হল। ওখানে থাকতে পারলাম না। একটু দুরে শহরের অন্য প্রান্তে চলে গেলাম। দাদার সাথে যোগাযোগ কমে গেল। কিন্তু মেদিনীপুরে চেম্বার করতে হলে রবীন্দ্র নগরেরই কোথাও করতে হবে। মাস দুই পরে এদিকে ফিরে এলাম। এই সময় দাদা একটি পুরোনো বাড়ি কিনে নার্সিং হোম খুললেন। পরে আমার পশার বাড়লে যখন অপারেশন করা শুরু করলাম, সবই প্রায় দাদার রায় নার্সিং হোমেই করতাম। এরকম নার্সিং হোম এর মালিক, আর তার সাথে ডাক্তারদের ভালো সম্পর্ক জেলায় জেলায় প্রচুর আছে। আমার এই দাদা বন্ধুটি একেবারেই ব্যতিক্রম। প্রায় একই সময়ে আমরা দুজন মেদিনীপুর লায়ন্স ক্লাবের সদস্য হই। লায়ন্স ক্লাব বহু বছর আগে থেকেই চোখের ছানি অপারেশনের শিবির করে। আমরা দুজনে যখন ওদের সাথে যুক্ত হয়েছি তার আগে দশ এগারো বছর ধরে ওরা এই অপারেশন শিবির করে আসছেন। আমরা দুজনে বছরে একটার বদলে আট নটা করে শিবির করা শুরু করলাম। শহরের বাইরে, ছোট ছোট গঞ্জ এলাকার স্কুলে শিবির করা শুরু করলাম। একটা শিবির শেষ করে, ওখান থেকেই বাক্স প্যাটরা আর একটা শিবিরে চলে যেত। আমরা মজা করে বলতাম, যাত্রা পার্টি। লায়ন্স ক্লাব চোখের অপারেশন শিবির করে, এটা নতুন কোন খবর নয়। আমরা দুজনে ক্লাবের কর্ম কর্তাদের রাজী করালাম, কুষ্ঠ রোগীদের ছানি অপারেশনের শিবির করা হল। এরও একটা ইতিহাস আছে। একজন অঙ্গ বিকৃত রুগীর ছানি অপারেশনের জন্য কোন নার্সিং হোম পেলাম না। বাধ্য হয়ে শহরের প্রান্তে, একজন ঠিকাদারের কোদাল ঝুড়ি রাখার টালীর চালায় অপারেশন করতে বাধ্য হলাম। এখনকার আইনে অবশ্য এটা করলে আমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ঐ রুগীর ছানি অপারেশনের সময় আমাকে সাহায্য করেছিল, রায় নার্সিং হোমের ম্যানেজার জয়দেব। জয়দেব এর কাছেই প্রথম জানলাম, শহরের বাইরে একটি কুষ্ঠ আশ্রম আছে। ঐ আশ্রম কথাটাও কিন্তু ভোলাদার সৃষ্টি। জয়দেব আমাকে পূজ্যপাদ অরুণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সাথে আলাপ করিয়ে দিল। উনিই কুষ্ঠ আশ্রম এর প্রাণ পুরুষ। ভোলাদা বলতেন, " অরুণ বাবুর মত মানুষরা আছেন বলেই এখনও সূর্য চন্দ্র উঠছে।" আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ মানব দরদী। অরুণ বাবু জানালেন, এরকম কয়েকশ কুষ্ঠ রোগীদের চোখে ছানি অপারেশন করা হচ্ছে না। লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে অরুণ বাবুর আশ্রমে দু বার শিবির করা হয়। দু বারই পঞ্চাশ এর উপরে রুগীর ছানি অপারেশন করা হয়। একবার আমাদের সেই শিবির উদ্বোধন করেন, তৎকালীন রাজ্যপাল , অধুনা প্রয়াত রঘুনাথ রেড্ডি মহাশয়। এই শিবিরে আমার সাথে ছিলেন আমার বন্ধু ডা বিজ্ঞান বেরা। কয়েক মাস পর সরকারী চাকরীর চিঠি পেলাম। যেতে হবে সুদূর উত্তর বঙ্গে। দাদা ভাবলেন রসিকতা করছি। মেদিনীপুর ছেড়ে চলে যেতে পারি, এটা উনি ভাবতেই পারছিলেন না। এক নেতাকে ধরে চেষ্টা করলেন, আমাকে কাছাকাছি কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেখে দিতে। যেদিন পরিবার নিয়ে মেদিনীপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম, সে দিনটার কথা আজীবন ভোলা যাবে না। আমাদের বিদায় জানাতে উনি স্টেশনে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়ার বাঁশী বাজার পর দেখলাম, প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন। আমি চাকরীতে যোগ দিয়েই বুঝলাম, এখানে সিংহ নয় , ভেড়া হয়েই থাকতে হবে। ভোলাদা কিন্তু মেদিনীপুরে সিংহ হয়ে থেকে গেলেন। পরের শীতে আমাকে মেদিনীপুরের শিবিরে আসতেই হল, ঐ দাদার টানেই। চাকরিতে ক্রমশ জড়িয়ে গেলাম। মেদিনীপুরের সাথে যোগাযোগ ক্ষীন হয়ে গেল। কিন্তু দাদার সাথে যোগাযোগ একটা থাকলই। আবার মেদিনীপুরে যাতায়াত শুরু করলাম, কলকাতার দিকে ফিরে এসে। সে সময়ও কেশপুরে যেতে হল, বনের মোষ তাড়ানোর জন্য। এই দিনগুলিতে ও দেখতাম, ভোলাদার সেই পঞ্চায়েতি কাজ চলছেই। নতুন করে মেতেছেন, থ্যালাসেমিয়া সোসাইটির কাজে। লায়ন্স ক্লাব আর কুষ্ঠ আশ্রম তো আছেই।

আমি আবার নতুন একটা কি আকামে মেতেছি, দেখার জন্য একটা অনুষ্ঠানে মেদিনীপুরের গোলগ্রামে এলেন একদিন। ওখানেও আছেন,আমাদের পাগলের দলের আর এক গুরু বিমলবাবু। ওনারা প্রতি বছর ১৬ ই আগষ্ট একটা শিবির করেন। আমাকে বললেন, সাপের কামড় নিয়ে বলতে। আমি তো ল্যাপটপ প্রজেক্টর ছাড়া বলিনা। মেদিনীপুর শহরে

ভোলাদার সাথে যোগাযোগ করতে বললাম। উনি নিজেই গাড়ী নিয়ে, যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে গেলেন। সে সময় লোয়াদায় নদীতে সেতু হয়নি। বাঁশের পাটার উপর দিয়ে গাড়ী নিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, আপনি আবার নতুন কি পঁঙ্গায়েতি শুরু করেছেন, দেখতেই এলাম। শেষ দেখাহল কলকাতায় একটা মিটিংয়ে। লায়ন্স ক্লাবের চোখের হাসপাতাল খোলার জন্য খুব ছোটাছুটি করছেন। আমার এক সহকর্মী চোখের প্রফেসরের একটা পুরোনো মাইক্রোস্কোপ ওনারা কিনে নিতে চাইলেন। চুঁচুড়া শহরে এসে একবার দেখেও গেলেন, এটুকু জানতাম। সেটা আর নিয়ে গেলেন কি না, জানা হয়নি। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, ওনার সেই মোষ তাড়ানোর কাজে বেরিয়ে আর ফেরেননি। লায়ন্স ক্লাবের জন তিনেক একটা গাড়ী করে দিঘার দিকে যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিয়েছিল। অনেক সুকৃতি থাকলে এরকম একটা বন্ধু পাওয়া যায়। পুনর্জন্ম বলে যদি কিছু থাকে, ভোলাদার মত একটা বন্ধু পাওয়ার জন্যই আবার জন্মাতে চাই। ১০.১০.২৪.

চতুর্থ পর্ব।

সুন্দর নামের আমাদের ড্রাইভার। আমরা দুজন মাত্র যাত্রি, কিন্তু গাড়ি আট জন বসার মত, টাটা সুমো। সামখার বাজার থেকে ডান দিকে, সাতাশ মাইল এর রাস্তা ধরল। গাড়ির ভাড়া থেকেই বোঝা গেল আজ বেশ দূরে যাচ্ছি। পাহাড়ের ঢালে ঢালে গাড়ী নেমেই চলল। সাতাশ মাইল একেবারে তিস্তা নদীর পাড়ে। এখানে তিস্তা নদী পেরিয়ে আবার পাহাড়ী রাস্তায় উপরে ওঠা। এসব রাস্তায় কোনদিন আসিনি। ড্রাইভার কাকে যেন ফোনে বলল, মংপো হয়ে যাচ্ছে। আমি আমার স্ত্রী কে বললাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত জায়গাটা মংপু। তাই কোনরকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। হঠাৎ দেখি পাহাড়ী রাস্তার পাশে একটি উঁচু তোরণে লেখা, রবীন্দ্র ভবন। হৈ হৈ করে গাড়ী থামাতে বললাম। এমন একটি পুন্যতীর্থের পাশ দিয়ে চলে যাবে, নামবে না, এমন আহাম্মক বাঙালি পাওয়া যাবে না। ডান দিকের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম রবীন্দ্র ভবন এর দিকে। একজন মহিলা ডেকে টিকিট নিতে বললেন। পঁচিশ টাকা করে টিকিট। পুরনো বাড়ীটি এখন একটি সংগ্রহশালা , আমরা দু জনই শুধু যাত্রী। নিজেরাই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাগানে কয়েকটা ছবি তুলে ফিরে এলাম। আমাদের উচ্ছাসের কারণটা ড্রাইভার বুঝলই না। এই মঙপু কে ড্রাইভার মঙ্গপো বলছিল। এমন আর একটি জায়গা আছে, রংপো। গত অক্টোবরে পুর্ব সিকিম থেকে ফেরার সময় ধ্বসে রাস্তা আটকে ঋষিখোলা থেকে ফেরার সময়, রংপো ঘুরে ফিরেছিলাম। সে এক উৎকন্ঠার যাত্রা ছিল। মঙ্গপু থেকে জোড়বাংলো পর্যন্ত রাস্তাটা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। ঘন পাইন বনের ভেতর দিয়ে মাইল এর পর মাইল রাস্তা। মাঝ মাঝে মেঘ এসে রাস্তা ঢেকে দিচ্ছিল। জোড়বাংলায় এসে দার্জিলিং এর মূল রাস্তায় গাড়ি চলল। এটাই ঘুম। ঘুমে রাস্তায় একেবারে কলকাতার রাস্তার মত গাড়ীর ভিড়। কিছুটা এগিয়েই আমরা বাম দিকে ছোট রাস্তায় ঢুকে গেলাম। পরে জেনেছি, ওটাই মিরিক যাওয়ার রাস্তা। কয়েক কিমি এগিয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকল গাড়ী। এখন থেকে রাস্তা বেশ খারাপ। মাঝে মাঝে রাস্তা সারানোর কাজ চলছে। বেশ ঘন বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা। ফেরার সময় ড্রাইভার তার মোবাইলে ছবি দেখিয়েছে, সন্ধ্যার পর ঐ রাস্তায় চিতা বাঘ দেখা যায়। ঋষিহাট ঘুম থেকে অনেকটা নিচে। পিচের রাস্তা Rishihat ছাড়িয়ে চলে গেছে। একটা মোড়ের কাছের থেকে রাস্তা খাড়া উঠে গেছে, হোমস্টের নিচে পর্যন্ত। তারপরও প্রায় পঞ্চাশ গজ হেঁটে উঠতে হয়। ওদের ছেলেরাই লাগেজ তুলে নিয়ে যায়। এদের ও কয়েকটা কটেজ আর একটি তিনতলা বাড়ী। আমরা তিন তলার একটি ঘর পেলাম। এদের বাড়ী আর কটেজগুলি চা বাগানের মধ্যে, উপর নিচ সব দিকেই চা বাগান। এখানেও সামনে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ। একটু বাঁ দিকে তাঁর দেখা পাওয়ার কথা। দেখা যাক, দেখা যায় কি না।

আগের পর্বগুলো পড়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। কেই 25 বছর আগে ললেগাও ঘুরে এসেছেন। কেউ যেতে চান। আমার কাছে যেটা সবথেকে বড় খবর মনে হয়েছে তা হল, আবহাওয়া। কলকাতায় তখন 40-42 চলছে। আমরা ওখানে কম্বল গায়ে ঘুমিয়েছি। সন্ধ্যার পর সোয়েটার আর মাথায় টুপি। চারটি জায়গার মধ্যে ঋষিহাটেই সবথেকে বেশী ঠাণ্ডা পেয়েছি।

মরনোত্তর চক্ষু দান

প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধবাবুর মরনোত্তর চক্ষু দান এর ফলে দুজন অন্ধ মানুষ চোখে দেখবেন। এই খবর দেখে, আমার স্কুলের বন্ধুদের গ্রুপে এক বন্ধু একটি প্রশ্ন করেছে। প্রশ্নটি দেখেই বুঝলাম, এ নিয়ে আজও প্রচুর শিক্ষিত মানুষেরও অনেক ভুল ধারণা আছে। আমরা চোখের ডাক্তাররা কুড়ি পঁচিশ বছর আগে এ নিয়ে খুব প্রচার, আলোচনা, লেখালেখি করতাম। আমি নিজে গত ১৬-১৭ বছর সাপের কামড় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গিয়ে এই নিয়ে ভাবার অবকাশ পাইনি। গত কয়েকদিন ধরেই, সরকারী সিনিয়র সিটিজেন এর স্বভাব মত, রামায়ন মহাভারত নিয়ে কটি ছোট ছোট লেখা লিখেছি। বন্ধুর প্রশ্ন দেখে মনে হল, এই নিয়ে আরও লিখতে হবে। @ দয়াল বন্ধু
মরনোত্তর চক্ষু দান নিয়ে অনেক কথাই লেখার আছে। কত সংক্ষেপে আলোচনা করা যায় , চেষ্টা করে দেখি। প্রথম কথা হল, একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরই তাঁর চোখ দান করা যায়। কোন অবস্থাতেই জীবিত মানুষের চোখ দান করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ আমি নিজে কখনোই নিজের চোখ দান করতে পারব না। আমি মারা যাওয়ার পর, আমার মৃতদেহ যার অধিকারে যাবে, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব আমার চোখ দান করা। আমি আমার পার্থিব সব কিছুই মরার আগে দানের জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করে যেতে পারি; কিন্তু চোখ নয়। আমি চোখ দান করতে, আগেই অঙ্গীকার পত্রে লিখে গেলেই আমার চোখ দান করা হয়েছে, এটা ঠিক নয়। ঐ যে বললাম, আমার মৃত দেহের অধিকারী যে হবে, সবটাই তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আবার আগেই অঙ্গীকার করে যেতে হবে, এমন কোন আইন নেই।
এবার আসি বিজ্ঞান এর কথায়। মরনোত্তর চক্ষু দান মানে কিন্তু কোটর থেকে গোটা চোখ দুটি খুঁড়ে তুলে নিয়ে যায় না। চোখের সামনের স্বচ্ছ অংশ, অর্থাৎ কর্নিয়া কেবল কেটে নেওয়া হয়। এই দান করা কর্নিয়ার সবটাই গ্রহীতার চোখে প্রতিস্থাপন করা হয় না। দরকার মত, সংগৃহীত কর্নিয়ার কিছু অংশ কেটে নিয়ে, গ্রহীতার চোখে প্রতিস্থাপন করা হয়। যে মৃতদেহ থেকে কর্নিয়া সংগ্রহ করা হয়, তার চোখে ঐ জায়গায় একই রকম দেখতে প্লাষ্টিকের কর্নিয়া লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাই কর্নিয়া সংগ্রহ করা হলেও, দাতার চোখ দেখতে একই রকম লাগে।
এবার আসি মারা যাওয়ার কত সময়ের মধ্যে মৃত দেহের থেকে কর্নিয়া সংগ্রহ করতে হবে , সেই কথায়। চার ঘন্টার মধ্যেই নিতে হবে কর্নিয়া। মৃত্যুর পর দেহের প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গই একটু একটু করে নষ্ট হতে থাকে। আমাদের সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে যাকে, পচে যাওয়া বলা হয়। বেশী দেরী করে কর্নিয়া সংগ্রহ করা হলে, কর্নিয়ার কোষগুলি বেশী নষ্ট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ঐ কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে কোন ফল হবে না। তাই, মৃতদেহের আইনি উত্তরাধিকারী যদি সময় মত কর্নিয়া সংগ্রহ করতে বলে খবর না দেন, সবটাই বৃথা যাবে। খবর কোথায় দেবেন? সংক্ষেপে বলা যায়, সবথেকে কাছের চক্ষুদান কেন্দ্র বা আই ব্যাংক এ।
এর পরের প্রশ্ন, সবার চোখের কর্নিয়া কি দান করা যাবে? বা দান করলেও কাজে লাগবে? এবার কিন্তু আমাদের একটু একটু করে চোখের গঠন আর অন্ধত্বের কারণ ইত্যাদি জানতে হবে। অন্ধত্বের বহু কারণ আছে। একমাত্র কর্নিয়ার অস্বচ্ছতার জন্য যদি অন্ধ হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে মৃতদেহ থেকে নেওয়া স্বচ্ছ কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব। আমি কর্নিয়া কথাটা এই লেখায় অনেকবার উল্লেখ করেছি। Google Search করে চোখের সাধারণ গঠন দেখে নিন, ব্যপারটা বুঝতে সুবিধা হবে।
https://lookafteryoureyes.org/eye-care/how-your-eye-works/

আমাদের চোখের সামনে যে স্বচ্ছ অংশ আমরা দেখতে পাই, অনেকটা হাতঘড়ির সামনের কাঁচের মত, এটাই কর্নিয়া। এটা নানান অসুখে বা আঘাতে ঘোলা হয়ে যেতে পারে। তখন বাইরের কোনো জিনিসের ছবি চোখের ভেতরে যেতে পারে না। দাতার চোখ থেকে নেওয়া কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে, গ্রহীতার চোখের অস্বচ্ছ কর্নিয়া পাল্টে দিলে আবার ঐ চোখে দেখা সম্ভব হয়।
চোখে না দেখা বা অন্ধত্বের বহু কারণ এর মধ্যে এই কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা মাত্র দুই শতাংশ। শতকরা প্রায় আশি ভাগ অন্ধত্বের কারণ চোখের লেন্স ঘোলা হয়ে যাওয়া, যাকে আমরা ছানি বা ক্যাটারাক্ট বলি। সেক্ষেত্রে চক্ষু দান বা কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে কোন লাভ নেই। ঐ অস্বচ্ছ লেন্স সরিয়ে সেখানে পরিষ্কার প্লাষ্টিকের লেন্স লাগাতে হয়। যাকে আমরা ছানি অপারেশন বলে জানি। এছাড়া কোন অসুখে চোখের ভেতরে থাকা রেটিনা কিংবা চোখের নার্ভ নষ্ট হয়ে গেলেও অন্ধত্ব আসে। সে ক্ষেত্রে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন বা ছানি অপারেশন করে কোন কাজ হয় না।

উল্টো দিকে যদি ভাবা যায়, কেউ যদি রেটিনা বা লেন্সের অসুখে অন্ধ হয়ে যায়, তার কর্নিয়া স্বচ্ছ থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐ স্বচ্ছ কর্নিয়া, ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর দান করা সম্ভব। সেই স্বচ্ছ কর্নিয়া কোন গ্রহীতার চোখে প্রতিস্থাপন করে দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব।
তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়াল? দাতার কর্নিয়া স্বচ্ছ থাকলেই চলবে, তিনি নিজে লেন্স বা রেটিনার অসুখে অন্ধ বা প্রায় অন্ধ হলেও কোন অসুবিধা নেই। আবার গ্রহীতার চোখের লেন্স, রেটিনা, নার্ভ সব ঠিক থাকলে তবেই কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব।
এবার একটু অন্য কটি কথা বলি। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধবাবু আমার উত্তর কলকাতার স্কুলের দাদা ছিলেন। উনি ১৯৬১ সালে , শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। আমি ঐ স্কুল থেকে প্রথম ব্যাচের বারো ক্লাশ পাশ করি ১৯৭৮ সালে।
আর আমার বুড়ো বয়সের বাতিক, রামায়ন মহাভারত এ কি অন্ধ ছিলেন না? অন্ধ মুনির ছেলেকে শব্দভেদি বান মেরে হত্যা করেছিলেন, রাজা দশরথ। সেই অন্ধ মুনির অভিশাপে রাজা দশরথ পুত্রশোক পেয়েছিলেন। আর মহাভারতের অন্ধ? সবাই জানেন। খুব সম্ভবত ধৃতরাষ্ট্র জন্মগত ভাবে অক্ষিগোলক ছাড়াই জন্মেছিলেন। কিংবা তাঁর অক্ষিগোলক খুবই ক্ষুদ্র ছিল। এরকম কয়েকটি অন্ধ বাচ্চা আমি দেখেছি। এদের কিন্তু কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।
১১.৮.২০২৪.

মহামতি বিদুর

মহাভারত মহা কাব্যের মহানায়ক কে? পণ্ডিতেরা বলবেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর কেউ না। এতো ভক্ত জনের কথা। আমার নায়ক কিন্তু মহামতি বিদুর। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম , দুর্যোধন এত সব মহা মহা কুশিলব ছেড়ে বিদুর কেন? সাধারণ মহাভারতের গল্পে এই ক্ষুরধার বুদ্ধির মানুষটিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হয় না। মহাভারতকে পশ্চিমের পণ্ডিতদের মত করে এপিক বা মহাকাব্য বলেই বেশী প্রচার করা হয়েছে। ওদের ইলিয়াড আর ওডিসির সাথে মহাভারতকে এক করে দেখাটা একেবারেই ভাসা ভাসা ধারণা থেকে হয়েছে।

মহাভারত আমাদের জীবন দর্শনের বিশ্বকোষ, অর্থাৎ Encyclopedia! আমাদের জীবন দর্শনের মূল আমাদের এই সব প্রাচীন গ্রন্থ। মাঝখান থেকে দু'শ বছরের পরাধীনতা, আর পশ্চিমী সভ্যতার আগ্রাসন আমাদের ভিত নাড়িয়েই দেয়নি, আমাদের প্রায় মূলচ্ছেদ করেছে। মহাভারতের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্র আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় জীবন দর্শনের পথ। একেবারে ভগবৎ বিশ্বাসের মত আধ্যাত্মিক পথ যেমন আছে, তেমনি রাজার জন্য রাজ ধর্ম, সৈনিকের কর্তব্য, স্বামীর কর্ত্যব, স্ত্রীর কর্তব্য, সাধারণ গৃহস্থ কেমন করে আদর্শ জীবন যাপন করবেন, সবই আছে। মহামতি বিদুর মূলত ছিলেন , কুরু রাজসভার একজন মন্ত্রী। সেই চার হাজার বছর আগের সমাজ ব্যবস্থায় বসে , একজন মন্ত্রী যেভাবে রাজার আর রাজ্যের শুভ চিন্তায় একটা জীবন যাপন করে গেছেন, সেটা আজও প্রাসঙ্গিক।

বিদুরের জন্মের কাহিনী মহাকাব্যের মতোই তাৎপর্য বহন করে। লৌকিক আর অলৌকিক দুই দিক দিয়েই মহামতি বিদুর -এর জন্মের ঘটনা চিত্তাকর্ষক। ওনার জন্মের পিছনে যে অলৌকিকতা আছে, সেটাও একটা মহাকাব্যিক অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে। মহাকাব্যের বিভিন্ন ঘটনার মত এখানেও গল্পের মধ্যে আর একটা গল্প নিয়ে তৈরি। সংক্ষেপে বলা হলেও ব্যাপারটা বেশ সুন্দর। অনিমান্ডব্য ঋষি এক রাজার ভুল বিচারে, শুলে চড়ানোর মত কঠিন শাস্তি ভোগ করেও নিজের যোগ বলে প্রাণে বেঁচে যান। শুলে মারা না যাওয়ায় রাজা বুঝতে পারেন, ইনি একজন মহাত্মা । শুল কেটে নামানো হলেও , শুলের মাথাটি (অণি) শরীরের ভেতরে নিয়ে মুনি চলে ফিরে বেড়াতে থাকেন। অকারণে এত কঠিন শাস্তি কেন, এটা জানতে মুনি, ধর্ম দেবতার কাছে যান। ধর্ম দেবতা জানান যে পূর্ব জীবনে এই মুনি, পতঙ্গদের ধরে তাদের পিছনে কুশাগ্র ঢুকিয়ে মজা করতেন, তাই এই শাস্তি। মুনি জানতে চান , যখন তিনি পতঙ্গদের নিয়ে খেলতেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল? বালক বয়সে কিছু অন্যায় করার জন্য এত বড় একটা শাস্তি দিয়ে ধর্ম দেবতা অবিচার করেছেন। এর জন্য মুনি, ধর্ম দেবতাকে অভিশাপ দেন যে, তাঁকে সাধারণ মানুষ হয়ে জন্ম নিতে হবে। এই জন্যই ধর্ম দেবতা বিদুর হয়ে মর্তে জন্ম নেন। এই অলৌকিকতার পিছনে দুটি লৌকিক যুক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজও যে বালক অপরাধীদের আলাদা করে জুভেনাইল কোর্টে বিচার করা হয় , তাদের জন্য আলাদা আইন; এসব ঐ অনীমান্ডব্য মুনির ঘটনা থেকে প্রচলিত হয়েছে। দ্বিতীযটি হল, একেবারে মাটির সাথে যোগ না থাকলে বিচারকেরও ভুল হতে পারে। তাই ধর্ম দেবতা, বিদুর জন্ম নিয়ে, সাধারনের মধ্যে মিশে ছিলেন।

এখানে এই ধর্ম কথাটা বারবার আসছে, তাই এই কথাটা পরিষ্কার করা দরকার। আজ আমরা ধর্ম বলতে যে ফুল- বেলপাতা- আজান বুঝি, মহাভারতের " ধর্ম" তা নয়। মহাভারতে ধর্ম বলতে বোঝায়, ন্যায় নীতি অবলম্বন করা। এই বস্তু যেহেতু আমাদের প্রজন্মের অনেক আগেই পৃথিবী থেকেই লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই আমাদের কেউ যদি রাস্তায় ঢালা কালো পিচ কে ধর্ম বলে, আমরা ভবি, হতেও পারে। আজও আমাদের সমাজে, ধর্মাবতার, ধর্মাধীকরণ আছে; সব কিছুর শেষে আমরা ঐ ধর্মাধীকরণ এর দিকেই তাকিয়ে থাকি।

মহামতি বিদুর -এর জন্মের লৌকিক কাহিনী তো আমরা সবাই জানি। রাজবাড়ীর দাসীর গর্ভে জন্ম হয় বলে, বিদুরকে ক্ষত্তা বা দাসিপুত্র বলেও ডাকে হত। এমনকি মহারাজ যুধিষ্ঠির , যিনি কাকা বিদুরকে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের মতোই সম্মান করে চলতেন, তিনিও তাঁকে ক্ষত্তা বলে ডেকেছেন অনেক জায়গায়।

বাস্তবে কিন্তু বিদুর ছিলেন, কুরু রাজ সভার একজন মন্ত্রী। পাণ্ডু রাজা থাকার সময়ও তিনি মন্ত্রী; আর ধৃতরাষ্ট্র যতোদিন সরাসরি বা বকলমে রাজা ছিলেন, বিদুর তাঁর মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ বেদব্যাস তাঁর জন্ম দাতা পিতা। কিন্তু মা শূদ্রা দাসি হওয়ায় মহামতি বিদুরকে 'পারসব' শ্রেনীর লোক বলা হত। পৈতৃক সূত্রে তিনি পেয়েছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা। তাঁর এই মগজাস্ত্রের জন্যই প্রবল পরাক্রমী ভীষ্মও তাঁকে সমীহ করে চলতেন।

বিদুরের দুই দাদা ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুর বিয়ের ব্যাপারে, ওদের পিতৃতুল্য ভীষ্ম , বিদুরের সাথে পরামর্শ করছেন, এমন কথা মহাভারতই বলছে।

" স্থান কাল পাত্র" সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকার জন্য অনেক পন্ডিত মানুষ নিজে বিব্রত হন, আবার অন্য জনেরও বিরক্তির কারণ হয়ে যান। মহামতি বিদুর এই ব্যাপারটিতে একেবারে আদর্শ। মহাভারতের বড় বড় চরিত্ররা এই স্থান কাল পাত্রের মাত্রা জ্ঞান অনেক সময় রাখতে পারেননি। কিন্তু মহামতি বিদুর একটি মুহূর্তের জন্যও এই মাত্রা জ্ঞান হারাননি। কুরু রাজ বাড়ীর অভিভাবক ভীষ্ম , পুত্রসম তিন জনেরই যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ায় রাজা হতে পারেননি। মহারাজ পাণ্ডু নিজে রাজা থাকার সময়ে ভাই বিদুরকে মন্ত্রীর মর্যাদায় রেখেছিলেন। রাজ্য ছেড়ে বনে পাহাড়ে যাওয়ার সময় মহারাজ পাণ্ডু , ধৃতরাষ্ট্র আর বিদুর দুজনকেই রাজ্য দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান। সাধারণ ভাবে মহাভারত এর কাহিনী তে দেখলে মনে হয়, ধৃতরাষ্ট্রই পাণ্ডুর পরে রাজা ছিলেন। বিদুর প্রায় তার আজ্ঞাবহ দাসের মত জীবন কাটিয়েছেন। তীক্ষ্ণ বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন মহামতি বিদুর প্রথম থেকেই জানতেন, দাদা ধৃতরাষ্ট্রের রাজা হওয়ার প্রবল লোভ ছিল। তাই মহারাজ পাণ্ডু চলে যাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই বিদুর একেবারে চাকর বাকর এর মত , রাজার মাথায় চামর দোলাতে শুরু করেন। প্রজারা বিদুরকে অনুসরণ করেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে রাজা বলে মানতে শুরু করে। প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে রাজার মতোই সম্মান করেছেন । বেশির ভাগ সময়ই বিদুর ছিলেন কুরু রাজবংশের অর্থ মন্ত্রী আর আজকের মত হোম মিনিষ্টার। কুরু বংশ যে দুর্যোধনের জন্যই ধ্বংস হবে, সে কথা বিদুর , দুর্যোধনের জন্মের সাথে সাথেই বলেছিলেন। মহাভারতের কিছু কিছু জায়গায় এরকম কিছু অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে, যা দেখে অভিজ্ঞ জন বলতে পারেন, ভবিষ্যতে কি বিপদ ঘটবে। বালক বয়স থেকেই বোঝা যায় যে দুর্যোধন একজন ভয়ংকর নীচ ও হিংস্র প্রকৃতির লোক। একমাত্র এই দুর্যোধনই বেশ কয়েক বার মহামতি বিদুরকে অশ্লীল ভাবে গালাগালি করেছে। দুর্যোধনের প্ররোচনায় দু-একবার স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কটু কথা বললেও শেষ পর্যন্ত বিদুরের গভীর জ্ঞান আর ভদ্র ব্যবহারের জন্য বারবারই বিদুরের সাথে পরামর্শ করে বুদ্ধি নিতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রায় কোনোদিনই তিনি বিদুরের দেওয়া সৎ পরামর্শ শোনেননি। একেবারে শেষ সময়ে ভীমের বলা কটু কথা আর সহ্য করতে না পেরে, বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র বনে যেতে রাজী হন। বনেও বিদুরই তাঁদের একমাত্র ভরসা ছিলেন।

শতশৃঙ্গ পাহাড়ে পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুর পর পাঁচ বালক পুত্রকে নিয়ে রাজ বাড়িতে ফিরে এলেন কুন্তি। জন্ম সূত্রে বংশের বড় ছেলে হওয়ায় যুধিষ্ঠির ই পরে রাজা হবেন, এই সত্য দুর্যোধন কোনদিন মানতে পারেনি। বালক বয়স থেকেই বাহু বলে ভীম অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দুর্যোধন তাকে বিষ খাইয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিল। সন্ধ্যের পরও ভীম বাড়ী না ফেরায় কুন্তি আর যুধিষ্ঠির বুঝে যান , দুর্যোধনই মারাত্বক কিছু করেছে। ঐ বিপদের দিনে প্রথমেই তাঁদের মাথায় আসে মহামতি বিদুর এর কথা। বিদুরও শুনেই বুঝে যান,এটি দুর্যোধনের কুকীর্তি। কিন্তু ঘটনা মারাত্বক হলেও, চুপ চাপ থাকতে বলেন। এই শুরু হল দুর্যোধনের হিংস্র চক্রান্তের সাথে মহামতি বিদুর -এর মগজাস্ত্রের লড়াই। দুর্যোধন আর ধৃতরাষ্ট্রের সব নোংরা রাজনীতি বিদুর আগে থেকেই বুঝে যেতে থাকেন। জতুগৃহে কুন্তি সহ পান্ডবদের পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত বিদুর সময় মত ধরতে না পারলে, পান্ডবদের ইতিহাস বারণাবতেই শেষ হয়ে যেত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রী কৃষ্ণের কৌশল দেখানোর সুযোগই থাকত না।

বিদুর তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে যেভাবে জতুগৃহ চক্রান্ত বুঝে যান, সেই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাই বিদুর কে মহাকাব্যের নায়ক বলতে আমাদের বাধ্য করেছে। শুধু চক্রান্ত ধরে ফেলাই নয়, যে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় বিদুর সব কিছু যুধিষ্ঠিরকে জানান, তারপর " কোড ল্যাঙ্গুয়েজ" ব্যাবহার করে নিজের বিশ্বস্ত খনক পাঠিয়ে জতুগৃহ থেকে জঙ্গল পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটার ব্যবস্থা

করেন, আজকের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথেই তা তুলনীয়। একই ভাবে রাতের অন্ধকারে সুড়ঙ্গ থেকে জঙ্গলে বেরনোর পর বিদুরের পাঠানো লোকই পান্ডবদের যন্ত্র চালিত নৌকায় করে গঙ্গা নদী পার করে দেয়। শুধু এই জতুগৃহ কাণ্ডে বিদুরের ভূমিকা নিয়েই একটি বই লিখে ফেলা যায়। আগ্রহী পাঠকদের বলব, ভাদুড়ী মশাইয়ের "কথা অমৃত সমান" থেকে পড়তে। রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর " কোড ল্যাঙ্গুয়েজ" এখানে প্রকাশ করে অপরাধী হতে চাই না।

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করার পর , পান্ডবদের বেঁচে থাকার খবর আসার সাথে সাথে বিদুরই প্রথম ধৃত রাষ্ট্রকে বলেন, পাণ্ডবদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে। প্রজারা বুঝে যান লোভী রাজা ধৃতরাষ্ট্রই পান্ডবদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার আগেই, পান্ডবদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে, প্রজাদের ক্ষোভ প্রশমিত করার পরামর্শ বিদুরেরই।যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ চলার সময় কাকা বিদুরই হিসেব পত্র সব দেখাশোনা করেন। মহাভারতের সব থেকে কষ্টের জায়গাটা হল পাশা খেলা। এই পাশা খেলা যে ভয়ংকর পরিণতিতে যেতে পারে সেকথা ঠিকই বুঝেছিলেন বিদুর। রাজার, রাজ্যের, তার থেকেও বেশী করে কুরু রাজবংশের কল্যাণের কথা মনে রেখে বিদুর চেষ্টা করেছিলেন পাশা খেলা যাতে না হয়। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে যুধিষ্ঠরকে পাশা খেলার জন্য ডেকে আনতে বিদুরকেই পাঠান ধৃতরাষ্ট্র। দূত এর কর্তব্য হিসেবে ,রাজার আদেশ পালন করতে তাঁকে যেতেই হয় যুধিষ্ঠিরকে ডাকতে। দূত এর কাজ করার পরই তিনি রাজ চক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার অন্ধকার দিকটি মনে করিয়ে দেন। ক্ষত্রিয় রাজার কর্তব্য পালন করতে, নাকি জেঠামশাই –এর ডাক অমান্য না করতে , নাকি নিয়তির অমোঘ আকর্ষণে, যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে চলে গেলেন।

কুরু বংশ ধংসের শুরু ঐ পাশা খেলা থেকেই। আরও নির্দিষ্ট করে বললে,দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণই দুর্যোধন,কর্ন ইত্যাদি মহাবীরদের চরিত্রের কুৎসিত দিকটি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দুর্যোধনরা যেন ঐদিনই মৃত্যুকে আবাহন করল। কিন্তু ঐ রাজ সভায় ভীষ্ম দ্রোণের মত কুরু বৃদ্ধেরা সবাই চুপ করে থাকেন। প্রবল প্রতিবাদ করেন মহামতি বিদুর। এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিদুর রাজ সভার মধ্যে চুড়ান্ত অপমানিত হলেন, দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধন অপমান করে বিদুরকে রাজ সভা থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করলেও বিদুর বুঝতে পারেন, উনি সভা ছেড়ে গেলে দুর্যোধনের অসভ্যতার প্রতিবাদ করার কেউ থাকবে না। তাই শত অপমান সহ্য করেও উনি সভায় বসে থাকলেন। বিদূরই প্রথম বলেন যে, দ্রৌপদীকে পণ রাখাটা বেআইনি। এই আইনের প্রশ্নটাই পরে দ্রৌপদী সভায় তুলেছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন। পরে মহাযুদ্ধ শুরুর আগে, কৌরব দূত সঞ্জয় ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে পান্ডবদের কড়া বার্তা শোনালে, রাজ সভায় তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হল। এই একটি বারই বিদুর পিতৃ তুল্য ভীষ্মকে কড়া কথা শোনান। পাশা খেলার সময় চুপ করে থেকে, ভীষ্ম তাঁর সযত্নে আগলে রাখা কুরু বংশের বিনাশ-এর সূচনা করেন, এ কথাই বিদুর তাঁর স্বাভাবিক বাগ্মিতা দিয়ে বুঝিয়ে দেন। একই কথা পরে শ্রীকৃষ্ণও পান্ডবদের দূত হয়ে এসে কুরু রাজ সভায় বলেছিলেন। ঐ সভাতেই, দুর্যোধন বারবার "আমার রাজ্য, আমার রাজ্য" করতে থাকলে, ভীষ্ম কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন যে, এ রাজ্য আসলে ভীষ্মের। পাণ্ডুর পরে রাজ্যের দেখাশোনার ভার ধৃতরাষ্ট্র আর বিদুর দুজনকেই দেওয়া হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে রাজ্যের অর্ধেক অধিকার বিদুরেরও। সেই বিদুরের কথা যথাসময়ে না শোনার জন্যই আজ সকলে এই ভয়ংকর যুদ্ধে জড়িয়ে যাচ্ছেন।

এই যে যুদ্ধের উদ্যোগ পর্বে দূতদের আসা যাওয়া, এ সময় কিন্তু বিদুরকে দূত হিসেবে পাঠানো হয়নি। কারণ ধৃতরাষ্ট্র জানতেন, তাঁর চালাকি বিদুর ধরে ফেলবেন। তাই সঞ্জয়কে পাঠানো হয়েছে, যুধিষ্ঠিরের সরলতার সুযোগ

নিয়ে, যেন তেন প্রকারে যুদ্ধটা আটকাতে। ব্যর্থ সঞ্জয় সন্ধ্যায় ফিরে একবার মাত্র ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করে , “খবর ভালো না, কাল সভায় সব বলব”, বলেই ঘুমাতে চলে যান। দুশ্চিন্তায়, উৎকণ্ঠায় ধৃতরাষ্ট্র ঘুমাতে পারছেন না; বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। যদিও বিদুর জানেন, তাঁর বলা ন্যায় নীতির কথা দাদা কিছুই মানবেন না ; তবুও রাজার ডাকে মন্ত্রীকে আসতেই হয়। এই রাত্রে বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রকে যে সব কথা বলেন, সেগুলি " বিদুর নীতি" নামে বিখ্যাত। এই বিদুর নীতিই আমাদের মত সাধারণ মানুষ-এর জন্য শ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ। মহাভারতের মধ্যেই গীতা আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজের বলা কথা, তাই একে বলা হয় " শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা”। সেখানে মূলত কর্ম যোগের কথা বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার একটা স্তর না পেরোলে, গীতা বোঝা সম্ভব বা পালন করা সম্ভব নয়। যক্ষ-যুধিষ্ঠির কথোপকথনটিও আমাদেরকে ধর্মের অনুসারী হতে সাহায্য করে। শর শয্যায় শুয়ে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিকে যে সকল উপদেশ দেন তাও আদর্শ রাজার জন্য। বিদুর নীতি আমাদের সবার জন্য। আজ চার হাজার বছর পরেও কত প্রাসঙ্গিক।

ঐ রাত্রে ধৃতরাষ্ট্র, আমার ঘুম আসছে না বিদুর বলায়, বিদুর বলেন, রাজা , চার রকম লোকের ঘুম আসে না। এক, যাদের ওপর প্রবলের অত্যাচার হয়েছে বা যে প্রবলের চাপে আছে। দুই, যার সর্বস্ব চুরি গিয়েছে। তিন, কামুক লম্পট লোক, আর চার, চোরের। রাজা, আপনি কি এই চার প্রকারের কোন দলে পড়ছেন? প্রথম দুই প্রকারে পড়বেন পাণ্ডবরা। তাদের তের-চোদ্দ বছর বিনিদ্র কেটেছে। ধৃতরাষ্ট্র আসলে চার নম্বর দলে পড়ছেন। উনি অন্যায় ভাবে পান্ডবদের সর্বস্ব গ্রাস করেছেন।

ঐ রাত্রে বিদুর, যুধিষ্ঠিরের গুণাবলি আর দুর্যোধনের সমস্যা নিয়ে অনেক কথা বলার পর, ধৃতরাষ্ট্র বিদুর কে বলেন, আমার মনে বৈরাগ্য এসেছে, তুমি আমাকে কিছু আধ্যাত্মিক কথা শোনাও। বিদুর জানান যে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি সেই জ্ঞান অন্যকে দেওয়ার অধিকারী নন। সে জ্ঞান শুনতে হলে ঋষীর কাছেই শোনা উচিত। এই যে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, এটাই আমাদের থাকে না। স্কুল কলেজের শিক্ষক, ডাক্তারকে ডাক্তারী শেখাতে শুরু করেন। ডাক্তা লোকজনকে নাস্তিকতা শেখাতে ব্যস্ত। এই যেমন এই অধম, সংস্কৃতের বর্নপরিচয় সম্পূর্ন হয়নি, মহাভারত নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। যাই হোক, ঐ রাত্রে ধ্যানস্থ হয়ে বিদুর স্মরণ করা মাত্র সনৎসুজাত ঋষী এসে , ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক পারমার্থিক জ্ঞান দান করেন।

পান্ডবদের দূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধন অনেক সোনা দানা, রথ , হাতি দিয়ে বস করার পরিকল্পনা করলেও, শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের বাড়িতে ওঠেন। খুব প্রচলিত " বিদুরের খুদ কুঁড়া" কাহিনী এই বিদুরের বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণের অতিথি হয়ে আসা নিয়েই । এই কাহিনী মূল মহাভারতে নেই। আমাদের কবি কাশীরাম দাস , বিদুরের বিনয় আর কৃষ্ণ ভক্তি দেখাতে গিয়ে এসব গল্প কথা লিখেছেন। বিদুরও মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে আসা অনেক ব্রাহ্মণের ভোজন দক্ষিণা ইত্যাদির আয়োজনও করতে হয়েছিল। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের সাথে আসা ছোটখাট সেনা দলও বিদুরের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে। শ্রীকৃষ্ণের খাওয়ার সময় সূত-মাগধেরা গান বাজনাও করেন। বিদুরই শ্রীকৃষ্ণকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, দুর্যোধন তাঁকে বন্দি করে রাখার মতো নোংরা পরিকল্পনা করছে।

এই প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ আটকাতে বিদুর অনেক চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। যুদ্ধের আঠারো দিন তিনি সব কিছু থেকে দূরে সরে থেকেছেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কৌরব পক্ষে হাহাকার শুরু হল। সকল পুত্র আর আত্মীয় স্বজনদের হারিয়ে ধৃতরাষ্ট্র একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। বিদুর আর দূরে থাকতে পারলেন না। ধৃতরাষ্ট্র সহ সমস্ত স্বজনহারা মহিলাদের শান্তনা দিতে এগিয়ে এলেন বিদুর। মহিলাদের রথে করে নিয়ে গেলেন কুরুক্ষেত্রে। মৃত সৈনিকদের সৎকারের ব্যবস্থা করলেন।

যুধিষ্ঠির রাজা হলেন। ধৃতরাষ্ট্র অধিরাজা হয়ে পরম শ্রদ্ধায় হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে থাকলেন। কিন্তু ভীম সুযোগ পেলেই কেমন করে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের গদার আঘাতে মেরেছেন, তার বর্ননা দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে মানসিক যন্ত্রনা দিতেন। বিদুর ব্যাপারটা বুঝেই ধৃতরাষ্ট্র , গান্ধারী আর কুন্তিকে নিয়ে বনে চলে গেলেন। এই যে পরিণত বয়সে বনে যাওয়া, এই ব্যাপারটি বিদুরের জন্মদাতা মহর্ষি বেদব্যাসের অনুকরণে করা। বিদুর বনেও দাদা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখাশোনা করতেন। যুধিষ্ঠিরও মাঝে মাঝেই বনে গিয়ে সকলের সাথে দেখা করে আসতেন। একবার যুধিষ্ঠির গিয়ে জানলেন , বিদুর আরও গভীর জঙ্গলে অনশনে দিন কাটাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির বিদুরের জন্য খুবই উৎকন্ঠিত হলেন। এমন সময় দূরে এক জটাজুটধারী, অস্থিচর্মসার ব্যক্তিকে দেখে যুধিষ্ঠরের মনে হয় উনিই বিদুর। যুধিষ্ঠির তাঁকে অনুসরণ করে আরও গভীর বনে পৌঁছে যান। যুধিষ্ঠির বারবার ঐ মহাত্মা কে নিজের পরিচয় দিয়ে থামতে বলেন। একসময় বিদুর একটি গাছের তলায় যোগস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। যুধিষ্ঠির কাছে গিয়ে তাঁকে দেখে নিশ্চিত হন। তখন বিদুর নিজের সঞ্চিত যোগবল যুধিষ্ঠিরের মধ্যে চালনা করে , দেহ ত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির বুঝতে পারেন , মহামতি বিদুর তাঁর যোগবল যুধিষ্ঠিরের মধ্যে আধান করলেন। যুধিষ্ঠিরের শরীরে এক অদ্ভুত যোগ শক্তি সঞ্চার হল। কাঠ জোগাড় করে বিদুরের নশ্বর দেহ অগ্নি সংস্কার করার চেষ্টা করতেই , দৈব বাণী হল। "উনি সন্যাস নিয়েছেন, ওনার দেহের অগ্নী সংস্কার করা যাবে না, ওনাকে ভূমিতে সমাধিস্থ করতে হবে।"

এই যোগসিদ্ধি আধান করার ব্যাপারটি নিয়ে আচার্য্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই অনেক কিছু লিখেছেন। পিতা পুত্রকে বা গুরু শিষ্যকে যোগ সিদ্ধি দান করতে পারেন। যুধিষ্ঠির ছিলেন মহামতি বিদুর -এর শিষ্যের মত। তাই মহামতি বিদুর তাঁর সকল যোগ সিদ্ধি যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে গেলেন। আমার একটি সামান্য জিজ্ঞাসা আছে। চরণ স্পর্শ করে কি প্রনম্য ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু আহরণ করা যায়? এই "কিছু" জিনিসটি কি আমি জানিনা। আমার স্কুলের পণ্ডিত মশাই একবার বলেছিলেন, "যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে, শ্রীকৃষ্ণ সকল অতিথির চরণ ধুয়ে দেওয়ার কাজটি নিয়েছিলেন। আত্মম্ভরী ব্রাহ্মণেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে পারেন নি। তিনি কিন্তু ঐ চরণ স্পর্শ করার সুবাদে ব্রাহ্মণ দের ব্রহ্ম তেজ সব হরণ করে নেন।" পরের পঞ্চাশ বছরে , পণ্ডিত স্যারের সেই কথার সমর্থনে কোথাও একটি বাক্যও পড়িনি বা শুনিনি। কোন গুরুজন না চাইলে কি তার যোগ সিদ্ধির সামান্য অংশও শিষ্য বা ভক্ত জনের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে? সম্ভবত না। কিন্তু আচার্য্য ইচ্ছা করলে তাঁর সিদ্ধি বা জ্ঞান শিষ্যের মধ্যে সামান্য একটু হলেও সঞ্চারিত হতে পারে। এ আমার গভীর গোপন বিশ্বাস। জীবনে যে কয়েকজন মহৎ প্রাণ মানুষের চরণ স্পর্শ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাঁদের কিছু কিছু প্রভাব নিজেই অনুভব করি।

ভাদুড়ী মশাই লিখেছেন, মহাভারত মূলত শান্ত রসের কাব্য গ্রন্থ। আর এই শান্ত রসের মূর্ত প্রতীক মহামতি বিদুর। তিনি কিন্তু পরম জ্ঞানী, পরম ভক্ত। অথচ আমাদের ধারণায় একজন বৈষ্ণবের যে ছবি আঁকা হয়েছে, " তৃণ হতে দীনতর", মহামতি বিদুর তো সেরকম নন। তিনি পাশা খেলার সময় দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনির মত প্রবল -এর অন্যায় -এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ভীষ্ম দ্রোণের মত মহা বীর সকল যেখানে নীচ দুর্যোধনের কাছে অপমানিত হওয়ার ভয়ে চুপ করে থাকেন, সেখানেও আমরা বিদুরকে ভয় পেতে দেখি না। শেষ সময়ে সকল কৌরব বীর স্বীকার করে গেছেন যে, বিদুরের কথা লঙ্ঘন করার জন্যই তাঁদের চরম পরিনতি হয়েছে। মহাভারতের মহা কবি, তাঁর আপন তেজজাত পুত্রটিকে যেন পরম মমতায় নিখুঁত মানুষ করে গড়ে তুলেছেন। চার হাজার বছর ধরে মহা কবির মহাকাব্য অমর হয়ে আছে; আরও কত হাজার বছর ধরে এই মহাকাব্য শ্রদ্ধাবান মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হবে আমরা জানি না। মহাকাব্যের সাথে সাথেই , মহামতি বিদুর -এর কথা অমৃত সুধার মত ধরায় প্রবাহিত হবে, এ আমার গভীর প্রত্যয়।

মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প

মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প , কথাটা বেশ প্রচলিত। ব্যাপারটা আমরা বুঝিও। কিন্তু যদি আপনার কাছে আপনারই গল্প করা হয়? কি বলবেন ব্যাপারটাকে? এরকমই একটি ঘটনার কথা আছে মহাভারতে। মহাভারতের সবকটি ছোট বড় ঘটনারই একটা তাৎপর্য আছে। একে ভাদুড়ী মশাই বলেন," মহাকাব্যিক অভিসন্ধি।" আমি যে কাহিনীর কথা আজ বলব, সেটা ঘটেছিল, অর্জুন এর লক্ষ্যেভেদের কদিন আগে। ওনারা তখন জতুগৃহ থেকে বেঁচে পালিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মহর্ষি বেদব্যাস এর পরামর্শে ওনারা তখন একচক্রা গ্রামে থাকছেন। এখানেই ভীম বকরাক্ষসকে মেরেছিলেন। ওনারা যে ব্রাহ্মণ এর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে একদিন এক পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ এসে একরাত ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ চলেছেন, দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। দূর দূর থেকেই বহু লোক যাচ্ছিলেন পাঞ্চাল দেশে। এই ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন কিছু দান ভিক্ষার আশায়। @দয়াল বন্ধু
তখনকার দিনে এই পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ , মুনি ঋষিরা ছিলেন এক দেশ থেকে আর এক দেশে নানান খবর ছড়ানোর মাধ্যম। মনে আছে নিশ্চয়ই, এমনই কোন ব্রাহ্মণের কাছেই মহামতি ভীষ্ম খবর পেয়েছিলেন, সুদূর কাবুলের ওদিককার গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর। এই ব্রাহ্মণও অচেনা পাঁচ ভাই এর কাছে পাঞ্চাল দেশের নানান গল্প করছেন। পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের সাথে দ্রোণ এর ঝামেলা। সেই প্রতিশোধ নিতে দ্রোণাচার্যের কুরু রাজবাড়ীতে চাকরী নেওয়া। দ্রোণাচার্য এর শিষ্য বিখ্যাত বীর অর্জুন এর গল্প; কেমন করে বীর অর্জুন গুরু দক্ষিণা দেওয়ার জন্য, দ্রুপদ রাজাকে বন্দি করে গুরুর কাছে এনেছিলেন, এসব গল্প করছেন। সেই গল্প শুনছেন অর্জুন নিজে, আর চার ভাই এর সাথে। সে সময় অর্জুনের মুখের ভাব কেমন হয়েছিল? মহাভারতের মহাকবি সে কথা বলেননি। অর্জুন সবদিনই ধীর স্থির মানুষ। কিন্তু ভীম। তিনি তো বেশ হৈ হৈ করা মানুষ। তিনি তো বলতেই পারতেন, আরে রাখুন মশাই। কার কাছে শোনাচ্ছেন এসব গল্প? এই দেখুন মহাবীর অর্জুন! না। মহাভারত আমাদের এই মাত্রাজ্ঞান শেখায়। স্থান কাল পাত্র বিবেচনার যে পরিমিতি বোধ মহাভারত আমাদের শেখায়, পণ্ডিত মানুষেরা একেই বলেন, " মহাভারতের ধর্ম!" ধর্ম শব্দটা আজকাল যেমন একটি প্রায় " নিষিদ্ধ" শব্দে পরিণত হয়েছে, মহাভারতের মহামতি বিদুর বা যুধিষ্ঠির এর ধর্ম সেটা নয়। এর সাথে ফুল বেলপাতা অজান এর কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন, কথা বার্তা, স্নেহ ভালবাসা, শ্রদ্ধা, লোভ লালসা, বীরত্ব, শঠতা এই সবই আমাদের শেখায় মহাভারত। এই মানুষের মূল্যবোধের শিক্ষা, এটাই মহাভারতের "ধর্ম!" ৮.৮.২০২৪.

মিত্রা মাসি

মহালয়া এলে বাঙালির কিছু স্মৃতিমেদুরতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। আমার মত বরিষ্ঠ নাগরিকদের তো আচ্ছন্ন করে রাখে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মশাই এর সেই অলৌকিক স্তোত্র পাঠ। আমাদের তো জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই আকাশবাণীর প্রভাতী এই অনুষ্ঠান আমাদের স্মৃতির মর্ম মূলে ঢুকে গেছে। গত ৬০-৬৫ বছরে গোটা পৃথিবীর সব কিছুই প্রায় ওলট পালট হয়ে গেল; কিন্তু আমাদের মন থেকে মহালয়া একটি বছরের জন্যও সরে গেলো না। এই মহালয়ার ভোরের কত মধুর মায়াময় স্মৃতি। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে থাকার সময় অন্তত দু বার এই মহালয়ার ভোরে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা যেন এই সেদিন ঘটেছিল।

তখন আমরা প্রথম বর্ষের ছাত্র। আগের রাত্রে মেসে খেতে গিয়ে কানাঘুষো শুনলাম, কাল মহালয়ার ভোরে কোথায় যেন যাচ্ছে কয়েকজন। মনজিৎদাকে ধরে জানলাম, বি ডি আর ট্রেনে চেপে কোথাও যাওয়া হবে। আমিও যাব। বেশী লোককে জানানো হয়নি; তবুও ভোর রাত্রে উঠে স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল চোদ্দ জন। কি এই বি ডি আর? বাঁকুড়ার আজকের প্রজন্মের প্রায় কেউ জানেই না। বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে নামে একটা ন্যারো গেজের, কয়লার ইঞ্জিন এর রেল গাড়ি চলত তখন। পরে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় ওটা। আবার নতুন করে ব্রড গেজ লাইন হয়েছে কয়েক বছর হল। দিন দুই আগে ঐ লাইনে সরাসরি বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম হয়ে হাওড়া ট্রেন চালু হয়েছে। আমরা শুধু ঐ প্রায় খেলনা গাড়ীতে চাপার আনন্দে রাত থাকতে ছুটেছি। দুটি স্টেশন গিয়ে বেলিয়াতোড়ে নামলাম। ওখান থেকে বাস ধরে দু তিন কিমি দূরে ধবনীতে নামলাম। ধবনীতে আমাদের ক্লাসের কেশবের গ্রামের বাড়ি। সকলে হৈ হৈ করে ওদের বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই। চোদ্দ জন কেন, চারজনও না জানিয়ে কারো বাড়ীতে ঢুকতে পারব না। বাড়ীতে কেশব ছিল না, ছিলেন ওর কাকা। কেশব বোধহয় সেদিন ধানবাদে ছিল। ওর কাকু আমাদের সাদরে ডেকে নিলেন। আমরা ভেবেছিলাম চা খেয়ে চলে আসব; কাকু কিন্তু আমাদের দুপুরে না খেয়ে আসতে দিলেন না। উনি বাস ধরে বাঁকুড়া চলে গেলেন। বাঁকুড়া থেকে মাছ কিনে ফিরলেন। আমরা চা মুড়ি খেয়ে মাঠের দিকে ঘুরতে গেলাম। মাঠের পাশে পলাশ গাছের ছায়ায় বসে গল্পগুজব করলাম। দুপুরে খেয়ে হোস্টেল এ ফিরলাম।

আর একবার মহালয়ার ভোরে দল বেঁধে চললাম নদী দেখতে। হাসপাতাল এর পশ্চিমে তখন শুধুই ধানের ক্ষেত। এক মাইল মত দূরে দ্বারকেশ্বর নদী। আমরা রাত থাকতে চললাম মাঠের আল ধরে। আমাদের পরের ব্যাচের ঘোষাল এর হাতে ঝোলানো একটা প্রমাণ সাইজের রেডিও। রেডিওতে বাজছে মহালয়া। আমরা মিছিল করে যখন নদীর পাড়ে পৌঁছলাম তখন অন্ধকার। বর্ষার পর বলে নদীতে একটু জল ছিল। অন্ধকার ছিল বলেই আমি জামা প্যান্ট খুলে নদীতে নেমে একটা ডুব দিয়ে এলাম। ঘোষাল এর সেই ঢাউস সাইজের রেডিও কিন্তু তার আগের প্রজন্মের রেডিওগুলির প্রায় অর্ধেক ছিল। সেই রকম বিরাট একটা রেডিও ছিল, আমাদের মিত্রা মাসীর।

মিত্রা মাসি ছিলেন আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন স্বাস্থ্যকর্মি। মিত্রা মাসি, বেলাদি, নিতাইদা, টিকাদাদু, কম্পাউন্ডার বাবু , সুধার মা সবাই আমাদের গ্রামের প্রতিবেশী। ওনারা সবাই কোয়ার্টারে থাকতেন। বন্যা হলে আমরা বাক্স প্যাটরা নিয়ে ওদের কোয়ার্টারে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। অবশ্য ডাক্তারবাবু ছাড়া সবারই একটি করে ঘরের ছোট ছোট কোয়ার্টার। এই মিত্রা মাসি আমার মাকে দিদি আর বাবাকে জামাইবাবু বলতেন সবদিন। পরে জেনেছি , আমাদের বোধ হওয়ার আগেই কোন এক কালী ডাক্তার মাসিকে বিয়ে করার নামে প্রতারণা করেছিলেন। সেই সময় বাবা মাসির পাশে দাঁড়িয়ে প্রচুর লড়াই করেছিলেন, বিচারের আশায়। আমরা কোনদিন মাসিকে শাঁখা সিঁদুর পরতে দেখিনি। চাকরী করতে করতেই পঞ্চাশের উপর বয়সে মাসি একদিন হঠাৎ মারা গেছেন। এই মাসির কোয়ার্টারে আমার আর ছোট ভাইয়ের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ থাকত। আমরা সকাল থেকে গিয়ে মাসির কোয়ার্টারে বসে থাকতাম। মাসি কেরোসিন স্টোভ জ্বালিয়ে ডিমের ঝোল ভাত রান্না করতেন। সেই রান্নার লোভনীয় গন্ধ এখনও চোখ বন্ধ করে মনে করতে পারি। এখন অবশ্য “ ডিম্ভাত” বলে একটা রাজনৈতিক পরিভাষা খুব বিখ্যাত হয়েছে। সেই তিন চার বছর বয়সে মাসির কোয়ার্টারে নিমন্ত্রণ আমাদের কাছে একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। সেই প্রায় প্রাচীন যুগে, দুই একবার মিত্রা মাসীর সেই ঢাউস রেডিও, মহালয়ার ভোরে আমাদের বাড়িতে বেজেছিল। আগের রাত্রে বড়দা ওটা ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছিল। সবাই ভোরে উঠে মহালয়া শোনা শুরু করতাম। কিন্তু অনেক বছর পর্যন্ত মাঝপথে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, সবটা শোনা হয়নি। আমার উনি শৈশবের সামান্য যে কয়েকটা স্মৃতি এখনও আছে তার অন্যতম সেই মিত্রা মাসীর বড় রেডিওতে মহালয়া শোনা। পরে আমাদের বাড়ীতে রেডিও এসেছে। আমি ডাক্তার হয়ে নিজে একটা রেডিও কিনেছি। বছর দশেক হল রেডিও খারাপ হয়ে বিদায় নিয়েছে। তার জায়গায় কম্পিউটার এ মহালয়া বেজেছে। এবার তো মোবাইলে , অনলাইনে সরাসরি আকাশবাণীর মহালয়া শোনা গেল। কিন্তু মহালয়া এলেই আমার মনে আসে মিত্রা মাসির সেই বিরাট কাঠের বাক্সের মত রেডিওটা।

৩.১০.২৪.

সিংহাবলোকন

একটি নতুন কথা শিখলাম। শিখলাম এক প্রাক্তন আমলার ভাষণ থেকে। স্বনামধন্য এই আমলা সুন্দর বাংলা বলেন। শুধু এই সুন্দর বাংলা বক্তৃতা শোনার জন্যই ওনার কথা মন দিয়ে শুনতে হয়। উনি বললেন, ইংরেজী Retreat কথাটির বাংলা হল এই সিংহাবলোকন। যদিও গুগলে লেখা হয়েছে, পশ্চাদপসরণ। এই শব্দটি আমার যথাযথ মনে হয় না। সিংহ যখন ধীর পায়ে এগিয়ে চলে, মাঝে মাঝে ঘাড় কাত করে পিছন দিকে দেখে। কেন দেখে, বা কী দেখে আমার জানা নেই। কিন্তু জীবনের প্রধান দুটি ধাপ পেরিয়ে এসে, এখন আমারও এ ভাবে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখার সময় হয়েছে।

প্রথম দুটি বড় ধাপ হল , ছাত্র জীবন আর কর্ম জীবন। এখন এসে পৌঁছেছি অবসর জীবন এ। ঘাড় কাত করে পিছন দিকে তাকালে এখন তো দেখছি, সদ্য পেরিয়ে আসা চাকরী জীবনটা।

প্রায় তিরিশ বছর এর অভিজ্ঞতা। যেটুকু মনে আছে তাই লিখতে গেলে, চারটে না হোক একটা ধর্ম গ্রন্থের সমান তো হবেই। আজ লিখতে শুরু করলে পরের লোকসভা নির্বাচনের আগে লেখা হয়ে যাবে। কিন্তু পড়বে কে। আমার মত একটা অকিঞ্চিৎকর সরকারী চাকুরের গল্প শোনার লোক নেই। প্রথম সরকারী চাকরীতে ঢোকার কথা তো মনে থাকেই। আমি যখন চাকরী করতে ঢুকি তখন বাম আমল একেবারে তুঙ্গে। আজ নাকি একজন নেত্রীর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না; সে সময় তেনাদের ইচ্ছা ছাড়া সরকারী কর্মচারী বাতকর্মও করতে পারত না। মেদিনীপুরে আমার বন্ধু, অধুনা প্রয়াত ডা ভোলা রায় আমাকে এক জেলা স্তরের নেতার কাছে নিয়ে গেলেন। উনি খুব আন্তরিকতার সাথে আমাকে মেদিনীপুরের কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেখে দেবেন , বললেন। আমার নিজের স্বার্থের থেকেও আমার কিছু কিছু জনসেবার কাজেই আমাকে দরকার ছিল। তার বছর দুই আগে থেকেই আমি আর ঐ বন্ধু ভোলাদা মেদিনীপুরের কুষ্ঠ আশ্রম আর লায়ন্স ক্লাব নিয়ে মেতে ছিলাম। সে সময় দু বারে একশ এর বেশী কুষ্ঠ রোগীর চোখের অপারেশন করে আমরা বেশ হৈ হৈ ফেলে দিয়েছিলাম। তখনও যেহেতু সরকারী চাকরীর চক্করে ঢুকিনি, জানতাম না ঐ রকম জনসেবার থেকে নেতাদের পায়ে তেল দেওয়ার দাম অনেক বেশি। স্বাভাবিক ভাবেই আমার প্রথম চাকরী হল, মেদিনীপুরে থেকে পাঁচশ মাইল দূরে। ভোলাদা তো ভাবতেই পারেননি আমি মেদিনীপুর ছেড়ে চলে যাব। চাকরীতে ঢুকেই প্রথম দিন সন্ধ্যায়ই বুঝে গেলাম, ওখানকার বামপন্থী ডাক্তার সংগঠনের নেতার ইচ্ছা ছাড়া ওখানে কিচ্ছু হয় না। যে প্রশাসনিক পদে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাজ করার কথা, সেখানে চাকরীতে যোগ দিয়ে দ্বিতীয় দিনে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হল। আর যাদের ঐ দ্বায়িত্ব নেওয়ার কথা তারা শুধুই নেতার পদলেহন করে বছরের পর বছর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াল। প্রতিটা নিয়মই সাধারণ বুদ্ধিতে যা ঠিক মনে হয় সেই ভাবেই তৈরী। কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে ভেবে , পদে পদে সে সব স্বাভাবিক নিয়ম কানুন লঙ্ঘন করা হয়। আর তাতে নেতাদের কিছু সুবিধা হলেও, আসল কাজের জায়গায় বেশ ক্ষতি হয়ে যায়। নিজের সুস্থ চিন্তা ভাবনা কাজে লাগিয়ে যতটা পারা যায় কাজ সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেও রাজনৈতিক প্রশ্রয় পাওয়া ধান্দাবাজ সহকর্মীদের সামলানো কঠিন। নানান অসুবিধা, অন্যায় সামলে একটা একটা দিন পের করেছি। তাতে আর যাই হোক , দিনগত পাপক্ষয় ছাড়া আর কিছু হয়নি। গোটা পাঁচেক কর্মচারী ইউনিয়নের ঝক্কি পোহাতে পোহাতে একদিন , চুলোয় যাক এ চাকরী বলে , সব ছেড়ে দিয়ে বসে ছিলাম মাস দুই। নেতারা কিন্তু , তোমার ম্যাও তুমি সামলাও বলে মিটি মিটি হেসেছিল। এবং অবশ্যই নিজের ম্যাও নিজেই সামলেছিলাম। ঐ সময়, আমার পুরোনো অভ্যাস মত, বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আবার শুরু করছিলাম। একটি নাটকের দলের লোকেদের রাজি করিয়ে, তাদের একটা ঘরে, সপ্তাহে একদিন করে, দু টাকায় চোখ দেখা শুরু করলাম। ওদের দিয়ে , স্কুল বাড়ীতে চোখের অপারেশন করা শুরু করলাম। ওরা কিন্তু আমার এই মোষ তাড়ানোর কাজ দেখে বেশ উৎসাহ পেয়ে গেল। সেখান থেকে এক অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে গেল। ওদের পরিচিত এক ছোট মন্ত্রীর মাধ্যমে, রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালের চোখের ডাক্তার হয়ে চলে এলাম। সে এক মজার ব্যাপার হয়েছিল। ডাক্তার সংগঠনের নেতা থেকে শুরু করে, চামচা সকল, কোন ভাবেই অংক মেলাতে পারল না। ইউনিয়নের নেতার পদলেহন না করেও কি করে এ লোকটা এত তাড়াতাড়ি জেলা হাসপাতালে এসে গেল, এ একটা ধাঁধা হয়ে গেল। আজও আমি ঐ মন্ত্রীকে চোখে দেখিনি। আবার এটাও ঠিক যে, রাজনৈতিক প্রশ্রয় পাওয়ার জন্যই, আমিও হয়তো অনেক যোগ্য লোককে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছলাম। একটা বদলির দরখাস্ত জমা করে তার একটি প্রতিলিপি বন্ধুদের হাতে দিয়েছিলাম; আমার কাজ ছিল ঐ পর্যন্ত। একটা কথা ততোদিনে বুঝে গেছি, পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

তারপর তো ছেলের অসুখের জন্য চলে আসতে বাধ্য হলাম। কলকাতার কাছের হাসপাতালে এসেও দেখলাম, নেতাদের সু নজরে না থাকলে বিপদ আছে। তাই সব মিছিলে না গেলেও সময় মত চাঁদা দিয়ে দিতাম। কত কম বয়সী সহকর্মীর নির্লজ্জ পদলেহন দেখলাম। নিজের কাজটা করে যাওয়া ছাড়াও বনের মোষ তাড়ানোর বদ অভ্যাস থেকে গেল। এবার অবশ্য সে জন্য কোন সুযোগ নিতে হয়নি। একেবারে এক সহকর্মী দাদার ব্যক্তিগত একটা চিঠির দৌলতে, কলকাতার এক মেডিক্যাল

কলেজে চলে এলাম। এখানেও চাঁদাটা সময়মত দিতে হয়েছে। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, এরকম এক নেতার চোখে পড়ার জন্যই, আমার মোষ তাড়ানোর কাজটা আসল জায়গায় এসে পৌঁছেছে। ঠিক যখন আমার সেই কাজটা একটা রাস্তা পেয়েছে, তখনই রাজ্যে পট পরিবর্তনের সূচনা হল। পুরনো স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে। নতুন জমানার নেতা মন্ত্রীর সাথে দেখা করার কথা মনেও আসেনি। কিন্তু আমার এই সাপের কামড় এর কাজটা এতোটাই ব্যতিক্রমী ছিল যে, নেতারা এটার কথা ভাবেইনি। সত্যিই কি তাই? না কি এই কাজটা করে লাখ লাখ টাকা রোজগারের সুযোগ নেই বলেই এটা নিয়ে কেউ ভাবেনি।
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিতে গিয়ে শুধুই নেতাদের সাথে আমার কি সম্পর্ক ছিল তাই মনে পড়ছে কেন? আসলে সময়টা তো রাজনীতির সুনামীর সময়। আমার একটা রাজ্য স্তরের স্বীকৃতিও আমার বন্ধুরা ঐ “চামচে বাজী করে পাওয়া” মনে করে। এটাই বোধহয় ফিরে ফিরে দেখি। কাকে কবে তেল দিয়েছি, খোঁজার চেষ্টা করি বোধহয়। চাকরী থেকে অবসরের পরও ঐ একটা কাজের জন্য লোকে ডাকছে। এটাই আসলে ফিরে ফিরে দেখি। এ দেখার মধ্যে কোন গ্লানি নেই। আছে শুধুই কিছু কাজ করে যাওয়ার আনন্দ।